

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৩৬৭

প্রকাশক :
মণীশচন্দ্র চক্রবর্তী
অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী
অজিত গুপ্ত

সাড়ে ছয় টাকা

নিবেদন

এই বইএর রচনাগুলির বেশীর ভাগই তাগিদের চাপে লেখা। সমাজে-সংসারে বাস করতে গেলে এ তাগিদ অগ্রাহ্য করা সব সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু এগুলো যে কোনওদিন গ্রন্থাকারে গ্রথিত হবে, তা লেখবার সময় কল্পনা করিনি। তাই এর প্রায় সবগুলিই হারিয়ে গিয়েছিল। প্রীতিভাজন নকুল চট্টোপাধ্যায় এগুলিকে অনেক আয়াসে সংগ্রহ করেছেন। এর সুনাম দুর্নাম সবই তাঁর কৃতিত্ব। আসলে তিনিই কর্তা, আমি শুধু কারক।

ইতি—

বিমল মিত্র

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি অনেকগুলি উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নাম যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অপরের প্রশংসাও যেমন আমার প্রাপ্য হওয়া উচিত নয়, অপরের নিন্দা সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। অথচ প্রায় প্রত্যহই আমাকে সেই দায় বহন করতে হচ্ছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথমপৃষ্ঠায় আমারস্বাক্ষরমুদ্রিত আছে।

বিমল মিত্র

লেখকের এ-যাবৎ লিখিত বইএর সম্পূর্ণ তালিকা

সাহেব বিবি গোলাম		কেউ নায়ক কেউ নায়িকা
কড়ি দিয়ে কিনলাম		মনে রইলো
একক দশক শতক		তোমরা দুজন মিলে
মিথুনলগ্ন		গুলমোহর
মন কেমন করে		শ্রেষ্ঠ গল্প
অন্যরূপ		বেনারসী
রানীসাহেবা		রাজপুতানী
বাহার		সাহিত্য বিচিত্রা
দিনের পর দিন		একক দশক শতক (নাটক)
সরস্বতীয়া		সাহেব বিবি গোলাম (নাটক)
শনি রাজা রাহু মন্ত্রী		বিনিদ্র
স্ত্রী		পুতুল দিদি
গল্পসম্ভার		টক ঝাল মিষ্টি
চার চোখের খেলা		নিবেদন ইতি
এর নাম সংসার		মৃত্যুহীন প্রাণ
কাহিনী সপ্তক		প্রথম পুরুষ
রং বদলায়		এক রাজার ছয় রানী
নবাবী আমল		সুয়োরানী
নিশিপালন		কন্যাপক্ষ
বেগম মেরী বিশ্বাস	সখী সমাচার	নফর সংকীর্তন
চলো কলকাতা	ইয়ার্লিং (অনুবাদ]	বরনারী (জাবালি)

ভূমিকা

রচনাকে রম্য না করে বা তথ্যে কণ্টকাকীর্ণ না করেও যে রসোত্তীর্ণ প্রবন্ধ লেখা যায় তার প্রমাণ এই সংকলনস্থ প্রবন্ধগুলি। লেখক কোথাও প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য তথ্য বা যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে ব্যস্ততা দেখাননি। এখানে তথ্য গৌণ কিন্তু লেখকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যক্তিগত মনোভাবই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। ইংরেজী-সাহিত্যে এ ধরনের রচনা সমৃদ্ধিলাভ করেছে কিন্তু বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এর সূচনা আধুনিক। স্যামুয়েল জনসন, চার্লস ল্যাম্, হ্যাজলিট ও অস্কার ওয়াইল্ড-এর রচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেমন ব্যক্তিগত অনুভূতিসম্পন্ন তেমনি এ গ্রন্থের প্রতিটি রচনাই বিমল মিত্রের সাহিত্যিক-সত্তার অভিপ্রকাশ।

মূলতঃ ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র ও প্রবন্ধকার বিমল মিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিমল মিত্র তাঁর উপন্যাসে যে স্বচ্ছ, সহজ, সরল ভাষা ব্যবহার করেন, প্রবন্ধের বেলাও তাই। পাঠককে পীড়িত করতে তিনি নারাজ।

স্যামুয়েল জনসন লেখকের কর্তব্য সম্পর্কে বলেছেন—"The task of an author is either to teach what is not known or to recommend known truths by his manner of adorning them ; either to lit new light in upon the mind and open new scenes to the prospect, or to vary the dress and situation of common objects so as to give them fresh grace and more powerful attractions ; spread such flowers over the regions through which the intellect has already made its progress, as may tempt it to return and take a second view of things hastily passed over or negligently regarded."

সাহিত্যিক বিমল মিত্র যে সে কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছেন তার প্রমাণ এই সংকলিত প্রবন্ধাবলী।

সংকলনস্থ প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলিকে সংকলনস্থ করবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। ইতি—

নকুল চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র ও আমি

"শরৎচন্দ্র ও আমি" প্রবন্ধটি ১৩৫৩ সালের ২৫শে মাঘ "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি বিমল মিত্রের প্রথম সাহিত্য-সাহিত্যিক বিষয়ক প্রবন্ধ। ইতিপূর্বে তিনি অবশ্য বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন তবে যেহেতু ঔপন্যাসিক বিমল মিত্রের এটি একটি বিশেষ ধরনের রচনা—সেহিসেবে সাহিত্যের ইতিহাসে এর মূল্য অপরিসীম। নিজে ঔপন্যাসিক তাই মানবদরদী শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে তাঁর লেখনীপ্রসূত এই রচনাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনার প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম এখানে লক্ষণীয়। বোঝা যায় শরৎ-সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়নের ব্যাপারে কিছু সংখ্যক সমালোচকের অনীহা লক্ষ্য করেই এই প্রবন্ধটি রচিত। পাতার পর পাতা ভরা সমালোচনার যুক্তিজাল বিস্তারে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, এই নাতিদীর্ঘ রচনাটুকুর দ্বারা সেই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। জর্জ বার্নার্ড শ চার্লস ডিকেন্সের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে লিখেছেন:

"Europe has had to learn from hard experience what it would not learn from Dickens. The Facist and Communist revolutions which swept the great parliamentary sham into the dustbin after it had produced a colossal anarchist war, made no mention of Dickens; but on the Parliamentary point he was as much their prophet as Marx was the economic prophet of the Soviets. Yet a recent reactionist against Dickens' worship declares that he 'never went ahead of his public'."···বিমল মিত্রও ঠিক একই ভাবে শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়েছেন।

* * * *

শরৎ-সাহিত্য উপভোগ করবার দু'টো উপযুক্ত বয়েস আছে। এক প্রথম যৌবনে আর পরিণত-বুদ্ধি প্রৌঢ় বয়সে। প্রথম যৌবনের কথাই এখানে বলি। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর প্রথম অনুমতি পেলাম উপন্যাস পড়বার। বন্ধু-বান্ধবের কাছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের

সুখ্যাতি শুনেছিলাম। কিন্তু বাড়িতে পড়বার অনুমতি ছিল না। আলমারীর চাবি হস্তগত হবার পর প্রথমেই ধরলাম বঙ্কিমচন্দ্র। আর তারপরেই শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। কোথা দিয়ে যে দিনরাতগুলো কাটলো মনে নেই। চোখের সামনে এক নতুন জগৎ দেখতে পেলাম। পৃথিবীতে যে এত মানুষ আছে, তাদের যে এত রকম-ফের তা তার আগে জানতাম না। অভিভূত হলাম, মুগ্ধ হলাম। এবং ক্রমেই শরৎচন্দ্রকে দেখবার ইচ্ছে মনের মধ্যে জাগ্রত হলো।

কিন্তু তখন কাকেই বা চিনি, আর কে-ই বা চিনিয়ে দেবে। শুনলাম তিনি কলকাতায় থাকেন না। আমার দিনরাত্রের স্বপ্নের মানুষ তখন স্বপ্নেই রয়ে গেলেন।

কী উপলক্ষ্যে কলেজ স্ট্রীটে গিয়েছিলাম জানি না। ফুটপাথের ওপর পুরোনো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ নজরে পড়লো একখানা 'ভারতী'র ওপর। খুলে দেখি প্রথমেই শরৎচন্দ্রের লেখা নাটক "ষোড়শী" রয়েছে। কাছে তখন ছ'আনা পয়সা সম্বল। ছ'আনা আমার বাড়ি ফেরবার বাস ভাড়া রাখতেই হবে। কিন্তু 'ভারতী' খানার দাম চাইলে ছ'আনা। ছ'আনা দিলে বাড়িতে হেঁটে আসতে হয়। শেষ পর্যন্ত দোকানদার পাঁচ আনার কমে কিছুতেই রাজী হলো না। অগত্যা পাঁচ আনা দিয়ে বইটা কিনে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত এলাম। সেখান থেকে ট্রামে চার পয়সার টিকিটে বাড়ি আসবো।

ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে এক কোণে বসে। "ষোড়শী"খানা খুলে বসলুম। আর আজ বলতে লজ্জা নেই বাড়তি এক পয়সায় একটা সিগ্রেট কিনে ধরিয়েও নিয়েছি। সে যে কোথা দিয়ে চলেছি কিছুই জ্ঞান নেই। জীবানন্দ তখন আমার কল্পনায় ভর করেছেন। কলকাতার গোলমাল, হকারের চীৎকার, ট্রামের চাকার শব্দ সমস্ত অতিক্রম করে আমি জীবানন্দের কাছারী বাড়িতে হাজির হয়েছি। গায়ের শালখানা বিছিয়ে দিয়েছেন জীবানন্দ বিছানায়। সামনের টেবলে মদের পাত্র, একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সোনার রিস্টওয়াচের

ওপর জীবানন্দ ছাই ঝাড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো আমার শরৎচন্দ্রের কথা। কোন্ দেশের মানুষ তিনি। তাঁর কলমে এ কোন্ মানুষ সশরীরে আমার সামনে আত্মপ্রকাশ করলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো এককড়ির বিনীত ধূর্ত মূর্তিটা। আর তারপরেই এল ভৈরবী ষোড়শী।

ট্রাম চলছে। কিন্তু কোথায় এলুম তা দেখবার ফুরসুত নেই তখন। ষোড়শীর সে কী আবির্ভাব! আমার জীবনে আমি সেই দুপুরবেলা সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের কামরায় যে জগৎ দেখলুম তা আর কখনও দেখিনি। সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ! মনে হলো বুঝি এখনি সর্বনাশ হয়! মনে হলো, ট্রাম থেমে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চক্রমণ স্তম্ভিত হয়ে প্রতীক্ষা করছে কী ঘটবে দেখবার জন্যে। বাতাস বন্ধ, সূর্যের আকর্ষণ ঢিলে হয়ে গেছে, এখনি প্রলয় ঘটবে! অনন্ত কালের সমুদ্রের অভ্যন্তরে যে আগ্নেয়গিরি এতদিন সুপ্ত ছিল আজ বুঝি তা আবার নিজের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে। কাছারী বাড়ির দরজার আড়ালে তখন আড়ি পেতে যেন সব দেখছি, সব শুনছি!

এক সময় জীবানন্দ ষোড়শীকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বয়েস কত?

আর সঙ্গে সঙ্গে "আগুন" "আগুন" চীৎকার উঠলো। আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। চেয়ে দেখি সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের কামরার মধ্যে হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছি। আর ট্রামসুদ্ধ লোক সবাই ভিড় করে এসেছে আমার সামনে! একজন লোক আমাকে মারতে উদ্যত!

—একি মশাই, এমন ক'রে সিগ্রেট খেতে হয়—এখনি যে কাপড়ে আগুন ধরে যেত!

সবাই আমার হাত ধরে ফেলেছে। আমার গলা টিপে ধরবে নাকি। দেখি আমার সিগ্রেটের আগুন লেগে আমার পাশের ভদ্রলোকের কাপড়ের এতখানি অংশ পুড়ে গেছে!

অপরাধীর মত চুপ করে রইলাম। কীই বা আমার বলবার ছিল। আমি কি সজ্ঞানে করেছি। ওরা তো জানে না যে আমি তখন অক্ষম। সমস্ত উত্তেজিত জনতা এসে আমাকে শেষ ক'রে ফেলবার মতলব করছে।

পাশের ভদ্রলোক শেষে কাপড়ের শোকে সত্যই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে বোধহয় আমার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করবার উত্যোগ করলেন।

হঠাৎ আমার সামনের এক ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বাধা দিলেন। এতক্ষণ তাঁকে দেখিনি। মাথায় বড় বড় পাকা চুল, পরনে আধময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবি আর থান ধুতি। কোলের ওপর একটা ক্যানভাসের পেটফোলা ব্যাগ। তিনি যেন আর সকলের দলে নয়। বললেন—ওকে মারবেন না, ওর কোনও দোষ নেই, দোষ আমারই—

সবাই অবাক হলো। আমিও কম হলাম না। কে এ মানুষটি!

কিন্তু তাঁর বোধহয় নামবার সময় হয়েছিল। উত্তেজনা থামিয়ে দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ট্রাম থেকে হাজরা রোডের মোড়ে নেমে পড়লেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো না কেন তিনি অকাতরে আমার সমস্ত অপরাধ নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হলো না। শুধু হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। ট্রামসুদ্ধ লোক তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

আমি অব্যাহতি পেলাম সে যাত্রা।

তারপর বহুদিন পরে যতীন দাস রোড দিয়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে বেড়াতে বেরিয়েছি। কোনও কাজ নেই। কথা হচ্ছিল শরৎচন্দ্রকে নিয়ে। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে সবাই দেখেছে। তিনি নাকি বাড়ি করেছেন বালীগঞ্জে। হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে এসে আমার এক বন্ধু বললেন—ওই যে শরৎচন্দ্র—

চমকে উঠলাম। শিল্পী সতীশ সিংহের বাড়ির একতলার ঘরের

মেঝেতে একটা তাসের আড্ডা বসেছে। চার-পাঁচজন তাস খেলায় মত্ত। আর তক্তপোশের ওপর একা এক ভদ্রলোক বসে গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে একমনে সেই খেলা দেখছেন।

আমার বন্ধু বললে—ওই যে শরৎচন্দ্র—

আমি যেন ভূত দেখছি। সেই পাকা পাকা চুল মাথায়, লংক্লথের পাঞ্জাবি। চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি। সেদিনকার সেই ট্রামের ভদ্রলোকটি। যিনি আমায় চরম অপমান থেকে সেদিন অব্যাহতি দিয়েছিলেন। বুঝতে পারলাম কেন সেদিন তিনি আমার সমস্ত অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

সেই অন্ধকার যতীন দাস রোডের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সেই মানুষটির উদ্দেশ্যেই বললাম—তোমায় প্রণাম করি হে শিল্পী। মানুষকে তুমি এমনি করে দরদ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে দেখেছ বলেই তোমার সৃষ্টি এত মহৎ! তুমি আমার অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ করো।

রোল নাম্বার সিক্স

"রোল নাম্বার সিক্স" —বিমল মিত্রের ছাত্রজীবনের কথা। ১৯৫৬ সালে প্রবন্ধটি "আশুতোষ কলেজ ম্যাগাজিন"-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩ সালে আশুতোষ কলেজে ছাত্রকালীন অবস্থায় ৺অধ্যাপক শ্রীঅমলচন্দ্র রায়চৌধুরীর কাছ থেকে তিনি সাহিত্যিক জীবনের আদিপর্বে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়েছিলেন তার কথা লেখক "কন্যাপক্ষ" ও "কড়ি দিয়ে কিনলাম" উপন্যাসে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে আবার কোথাও বা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করেছেন। ৺অধ্যাপক অমলচন্দ্র রায়চৌধুরী লেখক-মনে এমন গভীরভাবে সেদিন দাগ কেটেছিলেন যে তার ফলে আমরা পেলাম "কড়ি দিয়ে কিনলাম"-এ প্রাণমথবাবুকে ও "একক দশক শতক"-এ কেদারবাবুকে। এ ধরনের দুই Positive Character-এর সন্ধান বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিরল। যৌবনের দেখা সেই অধ্যাপক অমল রায়চৌধুরীই বিমল মিত্রের পরবর্তী জীবনের বহু চরিত্রের উৎস।

* * * *

—রোল নাম্বার সিক্স, রোল নাম্বার সিক্স—

তখন আমাদের ব্রিটিশ হিস্ট্রি পড়াতেন অমলচন্দ্র রায়চৌধুরী। দীর্ঘদেহ সুদর্শন চেহারার মানুষ। কোন দিকে চেয়ে দেখেন না। ঘড়ির কাঁটার মত নিয়ম করে ক্লাসে আসেন। অন্য ক্লাসে যাই হোক, এখানে গোলমাল করা চলবে না। ইতিহাস নয় তো, যেন উপন্যাস। ভারি উপাদেয় তাঁর লেক্‌চার। অন্য কলেজের ছাত্ররা তাঁর লেকচার শুনতে আসে লুকিয়ে লুকিয়ে। তিনি এসেই রোল কল্‌ করতে শুরু করেন—ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ, সিক্স—

ছ'নম্বরে এসেই একবার থামলেন। সামনের দিকে চেয়ে আবার ডাকলেন—রোল নাম্বার সিক্স—

প্রথমবার কে যেন বলেছিল—ইয়েস্‌ স্যার। কিন্তু দ্বিতীয়-বারের ডাকে আর কারো সাড়া শব্দ নেই।

প্রক্সি-দাতা তখন সভয়ে আত্মগোপন করেছে।

অমলবাবু আবার একবার ডাকলেন—রোল নাম্বার সিক্স—বিমল মিত্র ?

চোখ দুটো সারা ক্লাসের চৌহদ্দি ঘুরে এল। কোথাও নেই অপরাধী।

অমলবাবু বললেন—বিমলকে একবার দেখা করতে বোলো তো আমার সঙ্গে। আমার বিশেষ দরকার আছে। ভয় নেই, বক্‌ব না তাকে।

অপরাধী এ-সবের কোনো খবরই রাখে না। কলেজের উল্টোদিকে হাজরা পার্কের একটি নির্জনতম কোণে তখন ভীম-পলশ্রীর ঠুংরি চলেছে। গায়ক অনুপম ঘটক আর শ্রোতা আমি। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার আর্টস্-এর ছাত্র হলে কী হবে, রসের কারবারে দুজনেই আমরা তখন প্রায় মহাজন। প্রাক্-যুদ্ধের কলকাতা শহর। রেশন, কণ্ট্রোল, কিউ-এর নাম-গন্ধ পর্যন্ত তখন কেউ শোনে নি। অনুপম গান গায় আর আমি রসের যোগান দিই! অর্থাৎ বাহবা দিই। অনুপম ঘটকের ভবিষ্যৎ তখন প্রায় সুনির্দিষ্ট। একদিন গানের ওস্তাদ হবে সে, এই তার অভিলাষ। আর আমি? আমার কামনা বড় গোপনীয়। সে কামনার কথা কেউ জানে না। আমি নিজেও তখন মতিস্থির করতে পারছি না। জীবনের সঙ্গে শিল্প-বোধের বিরোধ-নিষ্পত্তি তখনও হয় নি পুরোপুরি। এমন সময় এই কাণ্ড।

এ আমার সাহিত্যজীবনের একেবারে আদিপর্বের কথা। দু-চারটে পদ্য-জাতীয় রচনা যে কয়েকটা কাগজে তখন না বেরিয়েছিল তা নয়। তবে যাঁরা জানতেন তাঁরা তেমন উৎসাহ দেন নি। গুরুজনস্থানীয় লোকেরা বিশেষ কেউই জানতেন না। কেউ কেউ জানলেও বালখিল্য বলে হেসেই উড়িয়ে দিতেন। কেবল আমার এক প্রাইভেট টিউটর, কালীপদ চক্রবর্তী মশাই—যিনি আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়ে প্রায় প্রতিদিনই আমার অভিভাবকের কাছে নালিশ করতেন—সেই তিনিই কী জানি কেমন

করে আমার একটা কবিতা হঠাৎ দেখে ফেলেছিলেন। তখন বোধ হয় ক্লাস টেনে পড়ি। কী দয়া হল তাঁর কে জানে, একখণ্ড 'গীতাঞ্জলি' নগদ মূল্যে কিনে আমায় উপহার দিয়ে ফেললেন। বললেন—না, তোমার দেখছি ভাব আছে।

কিন্তু এমন উদাহরণ খুঁজলে আমার সারা জীবনে বড়জোর একটা কি দুটো মিলবে। সৌভাগ্যক্রমে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বা মানুষের সংসারে সারা জীবন নিরুৎসাহ করবার লোকের কখনো অভাব হয় নি আমার। সেই বয়েসেই নিন্দে, অবজ্ঞা আর অবহেলা পেতে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আস্তে আস্তে নিজেকে জনতা, সভা-সমিতি, ভিড় থেকে সরিয়ে অন্তরালে বাস করার স্বভাব প্রায় মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। প্রশংসা করলে সন্দেহ হত, ভয় হত। তাই ক্লাসের ছেলেদের মুখে যখন খবরটা শুনলাম যে অমলবাবু ডেকেছেন মনে ভয়ই হল—হয়তো বকুনি খেতে হবে, শাস্তি পেতে হবে প্রক্সির ব্যবস্থা করবার জন্যে।

ঠিক করলাম, দেখা করব না। না হয় হিস্ট্রির ক্লাসে বরাবরই গর-হাজির থাকব। নিন্দে, অপবাদ, অবহেলা, শাস্তির বোঝা সাধ করে আর বাড়াব না। আমার তো আর মুখ চিনে তিনি বসে নেই। ক্লাসে হাজির না হলেই হল।

এরই দু-চার দিন পরের কথা। পুরোনো আশুতোষ কলেজের সামনে তখন বেশ খানিকটা জায়গায় বাগান ছিল। সেই বাগানের পাশে কলেজে যাওয়ার রাস্তার ওপর সেদিন দু-তিন জন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি। ক্লাস তখনো বসে নি আর কি।

হঠাৎ কানে এল—বিমল, আমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে একবার দেখা কোরো তো।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি অমলবাবু। নিঃশব্দে পাশ দিয়ে যেতে যেতে কথাগুলো বললেন। সর্বাঙ্গ ভয়ে থর্থর্ করে কাঁপতে লাগল। এতদিন পরেও এখনো মনে রেখেছেন নাকি। চিনতেই বা পারলেন কী করে?

অনিচ্ছে সত্ত্বেও পেছন পেছন গেলাম। তিনি সোজা রাস্তা দিয়ে ততক্ষণে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসেছেন। আমি অপরাধীর মত দাঁড়ালাম সামনে গিয়ে। বললাম—আমায় ডেকেছিলেন স্যার আপনি?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, 'ভারতবর্ষে' তুমি একটা গল্প লিখেছ?

'ভারতবর্ষ'! লিখেছি আর কোথায়, পাঠিয়েছি বটে! কিন্তু সে তো কারো জানবার কথা নয়। যদি কেউ জেনে থাকে তো জেনেছে একমাত্র পোস্টাপিসের পিওন। আর, সে তো ছাপাই হয় নি। হবে কি না তাই বা কী করে জানব!

সবিনয়ে বললাম—একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম স্যার ওখানে।

অমলবাবু বললেন—সেটা ছাপা হবে। এ মাসেই বেরোবে।

এসেছিলাম শাস্তির আশঙ্কা করে, কিন্তু এ যে সেই নরুনের বদলে নাক। তবু মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরল না। জিজ্ঞেস করতে পারলাম না অমলবাবু 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কে! সম্পাদক তো জলধর সেন। অমলবাবু তো সাহিত্যিকও নন যে সে খবর জানতে পারবেন। ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা করতে পারলাম না।

অমলবাবু আবার বললেন—কাগজ বেরলে তুমি সম্পাদকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসো।

টাকা! শুধু সোনা নয়, আবার সোহাগা! রাজকন্যাই নয়, আবার অর্ধেক রাজত্বও!

বললেন—হ্যাঁ, প্রথম লেখার জন্যে ওঁরা টাকা দেন না বটে, কিন্তু তুমি পাবে। তবে···

বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর বললেন—কিন্তু তুমি ও রকম অশ্লীল গল্প লিখতে গেলে কেন? লেখাটা আমি পড়েছি, তুমি লিখতে পারবে একদিন, কিন্তু তুমি তো এখনো দেখতে শেখনি—বস্তুকেই দেখেছ কেবল, বাস্তবকে তো দেখনি; শুধু fact-ই দেখেছ, truth তো দেখ নি—ও দুটোতে যে অনেক তফাৎ।—কিছু মনে কোরো না, তুমি আমার ছাত্র বলেই তোমাকে এসব বলছি—

আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার তিনি বলতে লাগলেন—পৃথিবীটা তো ধুলো মাটি রক্ত মাংস ক্ষুধা দিয়ে তৈরী, কিন্তু এ পৃথিবীতে যা-কিছু দেখি সবটাই কি পার্থিব? ভুলে যেয়ো না, শিল্পীর কারবার পৃথিবীকে নিয়ে নয়, পার্থিবকে নিয়ে। পৃথিবীর সঙ্গে পশুর যোগ শুধু খাওয়া-শোওয়ার সম্বন্ধ নিয়ে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তো তা নয়। মানুষ যেমন পৃথিবীর কাছ থেকে নানা ভাবে নেয়, তেমনি পৃথিবীকে নানাভাবে মানুষের যে দিতেও হয়। দিতে হয় মানুষের সৌন্দর্য-বোধ, কল্যাণকামনা, শিল্পসৃষ্টি।···নইলে শুধু খাওয়া-পরার সম্বন্ধটুকু নিয়ে থাকলে মানুষ হিসেবে তো তুমি পঙ্গু হয়ে যাবে একেবারে—সত্যিকারের মানুষ আর হতে পারবে না···

এমনি অনেক কথা বলে গেলেন তিনি। কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না।

আসবার সময় বললেন—এত কথা বললাম বলে কিছু মনে কোরো না। তুমি আমার ছাত্র বলেই বললাম। অচিন্ত্য, প্রেমেন, মনোজকেও আমি এমনি কথাই বলেছি। তারাও আমার ছাত্র ছিল একদিন—তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আচ্ছা এখন যাও।

ফিরে এলাম। কিন্তু মনে আছে, তার পর দিন-সাতেক যেন একেবারে মগ্নচৈতন্য হয়ে রইলাম। যতদূর মনে পড়ে এ বোধ হয় ১৩৪০ সালের কথা। 'ভারতবর্ষে'র সে গল্পটাও আমার আজ হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে বলে অবশ্য আমার কোন দুঃখও নেই। অনেক কিছুই তো হারিয়েছি। অনেক বন্ধু যেমন হারিয়েছি, অনেক শত্রুও তো হারিয়েছি। অত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী আমার আশুতোষ কলেজে আর কে-ই বা তখন ছিল। আমি অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবহেলিত একজন ছাত্র মাত্র। আমি অনেকবার ভেবেছি, আমার ওপর এ স্নেহ তাঁর কেন হয়েছিল? গেজেটে আমার পাস করার খবর পেয়ে অযাচিত অভিনন্দন-পত্র পাঠিয়ে-

ছিলেন তিনি। হয়ত আমার ওপর তিনি অনেকখানি আশা করেছিলেন। তাঁর কোনও আশা আমি পূর্ণ করতে পারি নি জানি। একদিন তিনি দেখে গেছেন আমি লেখাই ছেড়ে দিয়েছি, আমাকে পাঠক-সম্পাদক সবাই ভুলে গেছে। তাঁর জীবদ্দশায় আমি 'রোল নাম্বার সিক্স্' হয়েই ছিলাম কেবল।

তারপর কবে আশুতোষ কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, পোস্ট গ্রাজুয়েট পেরিয়ে এসে একদিন হঠাৎ শুনলাম, তিনি আর নেই। শুনে স্বার্থপরের মত নিজের অভাবটাই বড় করে বাজল। আজ মনে হয়, সমস্ত লোকালোকের উর্ধ্বে যেখানেই তিনি থাকুন—তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি যেন আজও আমার ওপর বর্ষিত হচ্ছে। আমি তাঁর রোল নাম্বার সিক্স্। তাঁর অচিন্ত্য, প্রেমেন, মনোজের মত আমি হই নি, হতে পারি নি, কিম্বা হয়তো হতে চাইও নি! কিন্তু তা বলে তাঁর আশা কি সত্যিই বিফল হয়েছে?

আজ তিনি জীবিত নেই। থাকলে এই প্রশ্নটাই করতাম।

পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ

"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ"—প্রবন্ধটি ১৩৬৩ সালের পৌষ সংখ্যার "পরিচয়" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সেটি "পরিচয়"-এর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা। প্রবন্ধটি স্বর্গীয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের অতি সামান্য একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে লিখিত। ঘটনা সামান্য হলেও তাকে অসামান্য করে তুলেছেন লেখক। এ প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি তার অপূর্ব চিত্ররূপটি ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান বাঙলা সাহিত্যের যে কত বড় ক্ষতি, এ প্রবন্ধ তারই ইঙ্গিত বহন করছে। "পরিচয়" পত্রিকার তৎকালীন কর্তৃস্থানীয়দের সঙ্গে যুক্ত শ্রীননী ভৌমিকের বিশেষ অনুরোধে এটি রচিত। এই প্রবন্ধ ও পরবর্তী প্রবন্ধটি একই সময়ে লেখা। বিষয়বস্তু এক হলেও পাঠকরা লক্ষ্য করবেন দুটি প্রবন্ধের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পৃথক। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন এই অনাচার-ময় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে শান্তি পেয়েছিলেন। Goldsmith-এর ভাষায় বলতে হয়: "...happy in leaving a world that was unworthy of him...".

* * * *

ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারপর এলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য ছিল না। বেশ সহজ সরল গতিতে আমরা ক্রমপরিণতির দিকেই এগিয়ে আসছিলাম। চেনা শোনা রাস্তা। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সমাজ মনের যে গঠন-ধারা যেমন ভাবে এগিয়েছে, সাহিত্যেও আমরা তেমনি ভাবেই এগিয়েছি। কখনও হাইজাম্পও দিই নি লংজাম্পও দিই নি। তারপর একদিন কয়েকজন বুড়োবুড়িকে নিয়ে সাগর-সঙ্গমের তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলাম। ভাঁটার টানে নৌকোও বেশ ভেসে চলছিল। জোয়ারের আশায় একবার নৌকো বেঁধেছিলাম। রান্নার জন্যে কাঠ আনতে নবকুমার বুঝি দেরিও করেছিল একটু। আমরা নবকুমারের দেরি দেখে নৌকো ছেড়ে দিয়েছিলাম জোয়ারের

টানে। ভেবেছিলাম নবকুমারের যা হয় হোক, আমরা তো বাঁচি। কিন্তু নবকুমার সেদিন মরে নি। বাঙলা সাহিত্যের সৌভাগ্য যে নবকুমার সেদিন অপঘাত-মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল।

কে যেন পেছন থেকে এসে তাকে প্রশ্ন করেছিল—পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?

আর তার ফলেই আমরা পেলাম কুপালকুণ্ডলাকে !

একটা গল্প বলি।

তিন বছর আগের কথা। কিছু সরকারী লোক, আর আমরা জন কুড়ি সাহিত্যিক জমা হয়েছি হাওড়া স্টেশনের বারো নম্বর প্লাটফরমে। রাত দশটার সময় স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে হাওড়া থেকে আমাদের নিয়ে। চারদিন ধরে আমরা ঘুরবো দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার কাজকর্ম দেখতে। সবাই জমজমাট হয়ে প্লাটফরমে বিরাজ করছি। শীতকাল। সঙ্গে লেপ তোশক সোয়েটার ওভার-কোট। কিন্তু ট্রেন আর ছাড়ে না। শোনা গেল রাত বারোটার আগে স্পেশাল ছাড়বে না, কোথায় নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে লাইন আটক হয়ে আছে।

আবার প্লাটফরমে গল্পগুজব জমে উঠলো। সিগারেট, ওভার-কোট, শাল, জহরকোট, সবাই দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেলাম। বহুদিন পরে সকলের সঙ্গে দেখা। চারদিন চাররাত এক গাড়িতে একসঙ্গে ওঠাবসা খাওয়া ঘুমোনো সমস্ত ! কথা বলে আড্ডা দিয়ে যেন আর আশ মিটছে না আমাদের।

হঠাৎ দেখি গেট পেরিয়ে আসছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এ যেন আসা নয়, উদয় হওয়া। আগমন নয়, আবির্ভাব ! দুর্গেশনন্দিনী, গোরা, গৃহদাহ, পথের পাঁচালীর পর একেবারে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। প্রথম ব্যতিক্রম। পড়তে ভালো লাগে, কিন্তু এ যেন ভীতিপ্রদ ভালো লাগা। গোবিন্দলাল, গোরা, শ্রীকান্ত কিম্বা অপু, ওদের কেউ নয়, ওদের কিছু নয়। এ যেন

কপালকুণ্ডলা। চারদিকে অরণ্য, জনহীন উপত্যকা আর বালিয়াড়ি, সেই পরিবেশে নিষ্ঠুর সহৃদয়তা, কঠোর মমতা, আলুলায়িত কেশ-দাম, দুটি চোখে নিষ্প্রাণ সহানুভূতি আর স্নেহ-মমতাহীন কৌতূহল —পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?

সে প্রশ্নে বাঙলা সাহিত্যের নবকুমার প্রাণ পেয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু বিস্ময়, ভীতি, কৌতূহল, ভালবাসা, সব মিলিয়ে সে এক নতুন রস। খানিকটা কাপালিক, খানিকটা কপালকুণ্ডলা, খানিকটা নবকুমার সব মিলিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালা সাহিত্যের এক অপূর্ব প্রকাশ।

বললাম—এত দেরি যে আপনার ?

দেখি, ওভারকোট নয়, শাল নয়, জহরকোটও নয়—একটা ময়লা এণ্ডির চাদর গলায়, একটা আকাচা আধময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবি, খাটো ধুতি। আর দুহাতে দুটো ভারি বোঝা। এক হাতে একটা রঙ্‌চটা টিনের সুটকেস আর এক হাতে লেপ তোশক বিছানার বাণ্ডিল, বেশ জুত্‌ করে নারকোল দড়ি দিয়ে জম্পেশ করে বাঁধা। সেই দুটোর ভারে বেশ টলতে টলতে আসছেন। মুখে চোখে বিরক্তি।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন—এ কী রকম অব্যবস্থা, কারো কোথাও সাক্ষাৎ নেই—চারদিকে ঘুরে ঘুরে হয়রান—

বুঝলাম বাঙলা সাহিত্যে আসার আগে অনেক হয়রানি সহ্য করতে হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ও প্লাটফরম থেকে সে প্লাটফরম। কোথাও কারো সাক্ষাৎ পান নি। পান নি ঠিক মনের মতন উত্তরটি। দুহাতে অনেক প্রশ্নের বোঝা। সে বোঝা কুলির মাথায় তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। হাতড়ে ফিরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। সব দরজায় গিয়ে ঘা দিয়েছেন। সবাই বলেছেন—এখানে নয়, এখানে নয়, অন্য প্লাটফরমে দেখো— এখানে সব নিয়ম বাঁধা, স্পেশাল ট্রেন এখান থেকে ছাড়বে না—

কিন্তু এখানে এসেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন সন্তুষ্ট হতে

পারেন নি। এই বারো নম্বর প্লাটফরমে। এখানেও অব্যবস্থা, এখানেও অনাচার। এ সমাজেও সেই অনিয়ম, সেই অপব্যয়। এখানেও গৃহ গৃহ নয়, স্বামী স্বামী নয়, স্ত্রী স্ত্রী নয়। সন্তান এখানে স্বার্থ, স্নেহ এখানে পণ্য, ভালবাসা এখানে ছল। অনেক দেখে শুনে অনেক বিবেচনা করেও কোনও সমাধান খুঁজে পেলেন না। বললেন—এর প্রতিকার চাই, এর সমাধান চাই, এর সংস্কার চাই। মানুষকে সুখী করতে হবে। সমাজকে সুস্থ করতে হবে। সব অব্যবস্থা দূর করতে হবে।

বললেন—চারদিকে এত অব্যবস্থা কেন? একী রকম আয়োজন এদের?

বললাম—প্লাটফরম-এর শেষের দিকে চলে যান, চার্ট টাঙানো আছে। কোন্ গাড়িতে আপনার বার্থ পড়েছে। সব লেখা আছে ওখানে।

টলতে টলতে আবার চলতে লাগলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। যেন ভ্রূকুটি ফুটে উঠেছে সেখানে। সত্যিই কোনও ব্যবস্থা নেই কোথাও। সরকারী কর্মচারী অনেক রয়েছেন। অভ্যর্থনা করা দূরে থাক নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করারও কেউ নেই। এতে অন্য দশজন সাহিত্যিকের বিশেষ কিছু আঘাত লাগে নি। তাঁরা ট্যাক্সি চেপে কিম্বা নিজের-নিজের গাড়িতে স্টেশনে এসেছেন, তারপর কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে সোজা বারো নম্বরে এসে আস্তানা নিয়েছেন। ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে অনুযোগ অভিযোগের প্রশ্ন ওঠে নি তাঁদের মনে। আর অভিযোগ উঠলেও মনে মনে একটা আপোস করে নিয়েছেন। সমাজে চলতে গেলে সব অব্যবস্থায় অত অধৈর্য হলে চলে! অন্যায় তো আছেই, অনাচার অত্যাচার তো আছেই। স্টেশনে এসে পৌঁছলেই যে অভ্যর্থনা করার জন্যে সবাই হাজির থাকবে সামনে—এমন হলেই ভালো হতো অবশ্য, কিন্তু যদি তা না-ই হয় তো মাথা গরম করবো নাকি! অপমান পকেটে করে নিয়ে হাসিমুখে মিষ্টি কথা বল্যাই

তো ভদ্রতা। আমরা তো এই ভদ্রতারই প্রশংসা করি। এই ভদ্রতারই বড়াই করি। যিনি এই ভদ্রতার কথা ভদ্রভাবে লেখেন আমরা তো তাঁর লেখা পড়েই বলি—বাঃ চমৎকার মিষ্টি লেখা। তাই সত্যকথাও অপ্রিয় হবে বলে সব সময় আমরা চেপে যাই। অব্যবস্থা যদি থাকে কোথাও তো থাক না, আমরা কেন তা প্রকাশ করে অপ্রিয়ভাজন হই। সমাজে যদি কোথাও ঘা থাকে তো থাকুক, তুলো দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও—আর মাছি বসবে না। আমাদের দৃষ্টিকেও পীড়া দেবে না তা।

সাহিত্যের এমনি এক অব্যবস্থার সময়ই একদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসে হাজির হয়েছিলেন। সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা করার কেউ ছিল না। ছিল না প্লাটফরমের ঠিকানা, ছিল না কোনও নির্দেশসূত্র। নিজের মালপত্র বাক্স বিছানা, নিজের প্রশ্ন নিজের সমস্যা নিজেই ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন সেই বারোনম্বর প্লাটফরমে। ট্রেন ছাড়বে রাত দশটার সময়। একেবারে জীবনের সন্ধিলগ্নে পৌঁছে চারিদিকের অব্যবস্থা অনিয়ম অনাচার দেখে ভ্রূকুটি করলেন তিনি। সেই ভ্রূকুটিতে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল হারু। মাঠের মধ্যে পথ চলতে চলতে বজ্রাঘাতে অচল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হারাধন। তাকে স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে বাঁচিয়ে তুললেন না মানিক। তিনি বললেন—পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?

নবকুমার সে-প্রশ্নে চমকে উঠেছিল বহুদিন আগে।

কিন্তু হারু চমকালো না। একটা টিক্‌টিকি শুধু গাছের ডাল বেয়ে নেমে হারুর পায়ের কাছ দিয়ে নির্ভয়ে চলে গেল। ওরাও বুঝি টের পায়। তারপর এক সময় দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল হারুর শক্ত কাঠ দেহখানা। আর তার ফলেই আমরা পেলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

দূর থেকে দেখলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনি ভাবে

চলেছেন। প্লাটফরমের কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলেন মনোজ বসু এবং আরো কয়েকজন। সামনে একটা খুঁটির গায়ে ছাপানো চার্ট ঝুলছিল। কার কত নম্বর ঠাঁই—তারই নির্দেশ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থাননির্দেশ সেদিন সরকার কোন্ শ্রেণীতে করেছিলেন তা দেখি নি। দেখলেও আজ তা আর মনে থাকবার কথা নয়। ওপরে না নিচে, পাশে না সামনে তারও আজ হিসেব নেই। কার নামটা এক ইঞ্চি ওপরে আর কারই বা এক ইঞ্চি নিচে, কিম্বা কার নাম গ্রেট বোল্ডে আর কার নাম পাইকাতে—এ-সব দিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজর ছিল না। তিনি বলতে গিয়েছিলেন এই অব্যবস্থার কথা।

মনোজ বসু বললেন—আপনার কোন্ গাড়িতে সিট্ পড়েছে দেখুন—চার্টে সব লেখা রয়েছে—

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—এ কী রকম আয়োজন এদের—কোনও ব্যবস্থা নেই কোথাও—

মনোজবাবু বললেন—বৃহৎ ব্যাপারে অমন একটু অব্যবস্থা হয়েই থাকে।

—তা বলে সরকারী ব্যাপারেও ব্যবস্থা থাকবে না ?

আশেপাশের ভদ্রলোক কয়েকজন হাসলেন। বললেন—ট্রেন ছাড়ে কি না আগে তাই দেখুন—

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আরো তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করলেন। বললেন—তার মানে ?

—তার মানে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে সামনের লাইন আটকে আছে, লাইন পরিষ্কার না হলে এ ট্রেন ছাড়বে না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—কখন লাইন পরিষ্কার হবে ?

—তা রাত বারোটাও হতে পারে, একটাও হতে পারে—কাল ভোরেও হতে পারে—

হঠাৎ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন মানিক! এত অব্যবস্থা! এত অনাচার, এত অনিয়ম, এত বেহিসেব! দেশের কোথাও কি সুস্থতা,

কোথাও কি শৃঙ্খলা থাকতে নেই! সারাজীবন ধরে এক সুস্থ, সুশৃঙ্খল, সুখী সমাজের বাস্তবরূপ দেখতে চেয়েছেন। সে সমাজ প্রতিষ্ঠার আশায় আপোসহীন সংগ্রাম করে এসেছেন—পুতুলের সমাজ ভেঙে মানুষের সমাজ গড়তে চেয়েছেন। সব চেষ্টা কি তবে ব্যর্থ!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গট্ গট্ করে আবার ফিরলেন। আবার সেই লম্বা প্লাটফরম পার হয়ে চলতে লাগলেন উল্টোদিকে, যে দিক দিয়ে এসেছিলেন।

আমরা দেখলাম—হাতে দুটো ভারি বোঝা। একহাতে রঙচটা ভারি টিনের সুটকেস, আর এক হাতে লেপ তোশক, নারকোল দড়ি দিয়ে জম্পেশ করে বাণ্ডিল বাঁধা। বোঝার ভারে নড়তে পারছেন না। তবু আপ্রাণ শক্তিতে আবার ফিরে চলেছেন। তাঁর চেহারার দিকে চেয়ে দেখলাম অব্যবস্থার চাপে তিনি যেন হাঁপিয়ে উঠেছেন। বার বার মানুষকে সুখী দেখতে চেয়েছেন, সব অনাচারের প্রতিকার করতে চেয়েছেন, সমাজের আমূল সংস্কার কামনা করেছেন—আজ যেন ঘৃণায় অসাফল্যে একেবারে ম্রিয়মাণ হয়ে গেছেন তিনি। মানুষ আর মানুষ হলো না—পুতুলই রয়ে গেল, এ ক্ষোভ, এ লজ্জা যেন তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। তাই অসহ্য হওয়াতে তিনি আমাদের পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ করে প্লাটফরমের গেট পেরিয়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

আমরা অবাক হয়ে যে যার মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিলাম সেদিন। সেদিন বুঝতে পারি নি। আমরা নিশ্চিন্তে সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়েছি। আপোস রফা করে বেঁচে আছি। পথে চলবার সময় ফুটপাতের ওপর দিয়ে চলেছি যাতে গাড়ি চাপা না পড়ি।

আর কপালকুণ্ডলা?

নবকুমার একদিন কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের হাত থেকে

উদ্ধার করে ঘরে নিয়ে এল। তার সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে দিলে। তাকে অলঙ্কার দিলে, বেনারসী শাড়ী দিলে। নিজের অঙ্কলক্ষ্মী করে নিলে তাকে।

কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে ঘরে বেঁধে রাখবে এমন নবকুমার কোথায়?

সাত রাজার ধন এক মানিক

"What is nearest us, touches us most" স্যামুয়েল জনসনের এ উক্তিটি বিমল মিত্রের "সাত-রাজার-ধন এক মানিক" নিবন্ধটি সম্পর্কে একান্ত-ভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিমল মিত্রকে নিজের সাহিত্য-কীর্তির প্রতি আকৃষ্ট করতে সমর্থ না হলে এই নিবন্ধে আমরা লেখক-মনের যে আন্তরিকতার পরিচয় পাই, তা পাওয়া সম্ভব হতো না। নিবন্ধটি ১৯৫৬ সালে "উল্টোরথে"র "মানিক-স্মৃতি" সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি ৺প্রসাদ সিংহের অনুরোধে লেখা। সাহিত্যের ইতিহাস অনেক লেখা হয়েছে—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর অনেক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকই বিভিন্ন ভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন। কিন্তু বিমল মিত্র এ নিবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে ভাবে পাঠকের সামনে এনে উপস্থিত করেছেন তেমনটি অন্য কেউ করতে পারেন নি। সাহিত্যের ইতিহাসও যে গল্পের মত করে বলা যায় তারই নিদর্শন এ নিবন্ধটি। রূপকথার রূপক এখানে ব্যবহৃত হয়েছে—কারণ, এ বাঙালীর সর্বশ্রেণীর বোধগম্য জিনিস। বিষয়বস্তুকে সর্বশ্রেণীর পাঠকের বোধগম্য করার যে স্টাইল—সেটি বিমলবাবুর নিজস্ব। প্রসঙ্গতঃ সমরসেট মম "স্টাইল" সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছেন তার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম। "The dictum that the style is the man is well-known.... I can read every word that Dr. Johnson wrote with delight, for he had good sense, charm and wit. No one could have written better if he had not wilfully set himself to write in the grand style." বিমল মিত্রের রচনার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে "সহজের সাধনা", তবে "সহজের সাধনা অত্যন্ত কঠিন সাধনা"।

*　　*　　*　　*

এক যে রাজা। রাজার সাত রাণী। বড়রাণী,···ন-রাণী, ক'নেরাণী, ছুয়োরাণী আর ছোট রাণী। রাজার মস্ত বড় রাজ্য। প্রকাণ্ড রাজবাড়ি। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাঁড়ারে মণি-মাণিক্য, কুঠুরী ভরা মোহর, রাজার সব ছিল। এ-ছাড়া মন্ত্রী,

কোটাল সেপাই লস্করে রাজপুরী গম্ গম্ করতো। কিন্তু রাজার মনে সুখ ছিল না। সাত রাণী, এক রাণীরও ছেলে হলো না। রাজা, রাজ্যের সকলে মনের দুঃখে দিন কাটান। একদিন রাণীরা নদীর ঘাটে স্নান করতে গেছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী বড় রাণীর হাতে একটি শিকড় দিয়ে বললেন—এইটে বেটে সাত রাণীতে খেও মা, সোনার চাঁদ ছেলে হবে—

ছোট বেলায় ঘুম পাড়াতে পাড়াতে পিসীমা গল্প বলতো। বাইরে বাঁশ ঝাড়ের মট্ মট্ শব্দ, ঘরের মধ্যে অন্ধকার। গল্প শুনতে শুনতে কোথায় কোন্ দূরে কোন্ রাজ্যে মন চলে যেত। রাজার দুঃখ, রাজপুত্রের দুঃখের সঙ্গে নিজের দুঃখ কখন একাকার হয়ে যেত, জ্ঞান থাকতো না।

খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে। কলেজের নতুন বন্ধু অনুপম ঘটক। সবে দু'একদিন ক্লাস করছি। একদিন মোটা মতন একটি ছেলে এসে একেবারে সরাসরি জিজ্ঞেস করলে—আপনার নাম বিমল মিত্তির ?

বললাম—হ্যাঁ।

—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে বলেছে আনন্দ রায়।

নমস্কার করলাম। বললাম—আপনার নাম ?

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা। শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলেজ প্রাঙ্গণে সভা। সভায় উদ্বোধন সঙ্গীত করলে অনুপম ঘটক। সেই অনুপম ঘটকের গান প্রথম শুনলাম। নতুন ধরনের গলা নতুন ধরনের সুর। তখনকার জ্ঞান দত্তর কাছে শেখা।

অনুপম বললে—চলো আমাদের বাড়ি, আরো গান শোনাবো—

বললে—হর্ষদেব রায়কে চেনো ? তার কাছে গান শিখতে যাই—

বললাম—হর্ষদেব রায় আমার মাস্টার।

অনুপমের বাড়িতে গিয়ে সেদিন অনেক গান শোনা হলো। কসবায় রাস্তার ধারের একখানা ঘর। বেশ তানপুরা, তবলা, হারমোনিঅম সব আছে।

বাড়ি ফেরবার সময় বললে—প্রবোধের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ?

—কোন্ প্রবোধ ?

অনুপম বললে—প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে-ও লেখে—

প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়! চিনতে পারলাম না। কত লোকই তো লেখে। অবশ্য তখন যার নামই একবার ছাপার অক্ষরে বেরোত, তার নামই আমার জানা। চুপি চুপি গিয়ে দু'মাইল হেঁটে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে অবিনাশের দোকানে গিয়ে শুধু মাসিক পত্রিকাগুলো ওলটানোই ছিল আমার কাজ। কার নতুন কী লেখা বেরোল। লেখার ভালো মন্দ আমার দরকার নেই। শুধু নাম ছাপা হলেই তিনি বিখ্যাত লেখক। তা সে দু'লাইনের কবিতাই হোক আর দশ পাতার ছোট গল্পই হোক। আর উপন্যাস ? সে তো মহারথীরাই আছেন সে জন্যে! শরৎ চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল—ওঁরা তো সব নমস্য! আমার কাছে ছোট গল্পের শ্রেষ্ঠ লেখক তখন জগদীশ গুপ্ত। কোথাও যদি তাঁর লেখা বেরিয়েছে তা সেই কাগজখানা নিয়ে দেখ, বিনা পয়সায় যতটা পড়ে নেওয়া যায়। স্টলের মালিক অবিনাশ মাঝে মাঝে ধমক দেয়—খোকা, কাগজ কিনবে তুমি ?

সঙ্গে সঙ্গে আমি মুখ নিচু করে সরে পড়েছি। এক-একখানা কাগজের আট আনা ছ-আনা, চার আনা করে দাম। অত দাম দিয়ে যদি কাগজই কিনতে পারবো তো আমাকেই কিনে নাও না! জগদীশ গুপ্তের লেখা না পড়ে কি বেঁচে থাকা যায়! স্বপ্নে জগদীশ গুপ্তের চেহারাটা চোখের সামনে ভাসে। জগদীশ গুপ্তের মত যদি লিখতে পারতুম! কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম একদিন। আমাদেরই ক্লাসের সুখেন। সে বললে—আমারই মামা জগদীশ গুপ্ত! কী করেন ? না, বিশেষ কিছু করেন না, দেশে থাকেন। চাঁদ একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেলাম। তবু দুঃখ হতো, কাগজে কাগজে সবাই

অন্য লেখকদের নাম করে। প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেবের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। কিন্তু আমার স্বপ্নের মানুষ জগদীশ গুপ্তের কোথাও তেমন প্রশংসা বেরোয় না। এখন বুঝি হয়ত তাঁর সে-সময়ে মুরুব্বী কেউ ছিল না।

তারপরে এলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এমনটি আর পড়িনি। জগদীশ গুপ্তের ওপরে আরও এককাঠি সরেশ। লেখা পড়তে পড়তে মনে হতো যেন আমারই নিজের কথা, আমার বিধবা বুড়ী পিসীমার কথা, আমাদেরই ফতেপুরের কথা শুনছি। যেন পিদিম জ্বলছে কুলুঙ্গীতে। দেয়ালে রাজা রাণীর মস্ত ছবিটা টাঙানো। কড়িকাঠ থেকে লেপের বাণ্ডিলটা। কাঠের মস্ত সিন্দুকের ওপর কাঁসার ঘটিতে ঢাকা দেওয়া খাবার জল। আর পিসীমা আমার পায়ে সরষের তেল মাখাতে মাখাতে গল্প বলছে সুয়োরাণীর, দুয়োরাণীর, রাজপুত্রের, কোটালপুত্রের, মন্ত্রীপুত্রের আর···আর সাত রাজার ধন এক মানিকের।

বলতাম—তারপর ?

পিসীমা বলতো—রাণীরা মনের আনন্দে স্নান করে এসে কাপড় ছেড়ে পাকশালে গেলেন। আজ বড় রাণী ভাত রাঁধবেন, মেজরাণী তরকারী কুটবেন, সেজরাণী ব্যঞ্জন রাঁধবেন, ন-রাণী জল তুলবেন, ক'নেরাণী যোগান দেবেন, দুয়োরাণী বাটনা বাটবেন, আর ছোট রাণী মাছ কুটবেন। বড়রাণী দুয়োরাণীকে বললেন--বোন, তুই বাটনা বাটবি, শেকড়টা আগে বেটে দে তো, সকলে একটু খাই। দুয়োরাণী বাটতে বাটতে একটুখানি টপ করে লুকিয়ে খেয়ে নিলেন। তারপর রূপোর থালায় সোনার বাটি দিয়ে ঢেকে বড় রাণীকে দিলেন। বড় রাণী খেলেন। মেজরাণী খেলেন। সেজরাণী খেলেন। ন-রাণী খেলেন······

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়তাম। পাঁচ রাজপুত্রের পাঁচটি পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে সাত রাজার ধন এক মানিকের সন্ধানে বেরোবার

আগেই পিসীমার কণ্ঠ অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলিয়ে যেত। আমি নিজেই তখন সাত রাজার ধন এক মানিকের খোঁজে সাত সমুদ্রে তেরো নদী পাড়ি দিয়েছি!

এমনি করে যখন চেতনার জগতে স্বপ্নের আলো-ছায়া কল্পনার লুকোচুরি খেলায় সাতরঙা রামধনুর রঙ লেগেছে, তখন প্রথম স্টীম-জাহাজের সার্চ লাইটের আলো লেগে চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে দিলে। হুইশ্‌লের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে চৌচির হয়ে গেল এক নিমেষে। সমুদ্রের মত বিশাল এক নদী। সেই নদীতে পাল তোলা ময়ূরপঙ্খী নৌকোর ছই-এর ভেতর ঘুমোচ্ছিলাম যেন। আর কোত্থেকে এক জাহাজ এসে তোলপাড় লাগিয়ে দিল। ঢেউগুলো ফুলে ফুলে উঠলো। ময়ূরপঙ্খী নৌকো একবার এপাশ একবার ওপাশ করতে লাগলো। রাজপুত্র, কোটালপুত্র, মন্ত্রীপুত্র সব হাহাকার করে উঠলো। যায় যায়—সব যায় বুঝি। কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুল বুঝি দেখা হলো না। সেই কন্যার চুলে মোতির ফুল আঁটা। সেই কন্যা যখন ঘুমোয় মোতির ফুলটি খুলে রাখে হীরের কৌটোতে। সেই হীরের কৌটো থাকে পাতালপুরীর সাতমহলা প্রাসাদের গুপ্ত কুঠুরীতে। আর সেই কুঠুরী পাহারা দেয় এক ভয়ানক অজগর সাপ। সাপের মাথায় থাকে সাত রাজার ধন এক মানিক! সেই মানিক যে নেবে তার অসীম সাহস চাই।

কোটালপুত্রের ভয় হলো!

মন্ত্রীপুত্রও ভয় পেলেন।

পাঁচ রাজপুত্র। কিন্তু তাঁরা ভয় কাকে বলে জানেন না। এক এক ক'রে সবাই গেলেন। বড় রাজপুত্র পথ হারিয়ে ফেলে চলে গেলেন পূর্বদিকে। মেজ রাজপুত্রও পথ হারিয়ে ফেলে চলে গেলেন উত্তর দিকে। সেজ রাজপুত্রও পথ ভুল করে চলে গেলেন দক্ষিণ দিকে। ন-রাজপুত্রও পথের ঠিক না পেয়ে চলে গেলেন পশ্চিম দিকে। শেষে ছোট রাজপুত্রের পালা!

ছোট রাজপুত্র বললেন—এবার আমি যাবো।

ছোট রাজপুত্র একদিন দেশ ছেড়ে বিদেশে গেলেন। সেখান থেকে সাত নদী পেরিয়ে চলেছেন তো চলেইছেন। চলতে চলতে অন্ধকার হয়ে এল দিক্‌বিদিক। তারপর ময়ূরপঙ্খী নৌকো আর চলে না। পাল ভাঙলো, রূপোর বৈঠা ভাঙলো, হীরের হাল ভাঙলো। ঢেউ আথালি-পাথালি করছে। এই বুঝি ডোবেন। এমন সময় দূরে দেখা গেল টিম্ টিম্ করে আলো জ্বেলে কারা নৌকো করে আসছে। অন্ধকারের মধ্যে কালো কালো ছায়ার মত মূর্তি। কাছে এল নৌকো।

রাজপুত্র জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে?

সে বললে—পদ্মা নদীর মাঝি—

রাজপুত্র জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কী?

সে বললে—আমার নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

'প্রবাসী' তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ কাগজ। আর তারই জুড়ি তখন বেরিয়েছে 'বিচিত্রা'। দুটোতেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন। আর বিচিত্রাতে উপরি পাওনা হিসেবে আছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যের স্টক এক্সচেঞ্জে এ-দুটি তখন গিল্‌টি বাঁধানো শেয়ার। জগুবাবুর বাজারের অবিনাশের স্টলে ও-দুটি কাগজ উল্টে পাল্টে দেখবার সওদা নয়। নগদ আট আনা দিয়ে কেনবার জিনিস। আট আনা পয়সা দাও—আর একখণ্ড কিনে নিয়ে পড়োগে। আর দেখে বিচার করে যদি কিনতে হয় তো অন্য কাগজও আছে। স্বদেশী বাজার, ছোটগল্প, খেয়ালী, বিজলী, নবশক্তি —এই সব। এ-সব কাগজের সূচীপত্র দেখ, পছন্দ হয় কিনা বিচার করো তারপর কিনো।

এখন এমনি যখন অবস্থা তখন একখানা কাগজ উল্টে দেখতে গিয়ে একেবারে পড়তে শুরু করে দিয়েছি। ছাড়ানো যায় না। একেবারে জোঁকের মতন আটকে ধরেছে। ইলিশ মাছের নৌকো করে মাছ ধরতে যায় রাত্তিরে আর ভোরবেলা ঘরে ফিরে আসে

লোকগুলো। জল কাদা বস্তির মধ্যে মানুষগুলো শুধু বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করে, ছেলে মেয়ের জন্ম দেয়, টাকা ধার করে, মোটা সুদের জ্বালায় মাথার চুল বিক্রী করে আর সুদ শোধ করতে আরও ধার করে বসে মহাজনের কাছে আর রাত্তির হলে আবার জেলে-নৌকোগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেয়। বেশ তো! বড় আশ্চর্য মানুষ আর আশ্চর্য লেখা।

কাগজটার নাম কী?

উল্টে দেখি লেখা রয়েছে—পূর্বাশা—

উপন্যাসটার নাম কী?

পদ্মা নদীর মাঝি।

লেখক কে?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সব দেখে শুনে নিজের আদর্শকেও বদলাতে হলো শেষে আদর্শের স্বরূপও বদলে যাচ্ছে তখন। ম্যাট্রিক পাস করার পরই পেয়েছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র তারপর শরৎচন্দ্রকে। তারপর শৈলজানন্দ, তারপর জগদীশ গুপ্ত, তারপর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়। এ পর্যন্ত বেশ আসছিল সোজা সরল পথ ধরে। কিন্তু প্রথম ধাক্কা পেলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এ এসে। এমন এক কঠোর মমতা-ধর্ম। এমন এক নিষ্ঠুর সহৃদয়তা। এমন এক নির্ভীক সাধুবাদ। এর অনেকখানি আকর্ষণ যেমন আছে আবার কিছুটা বিকর্ষণও আছে তেমনি। একে যেন ভয় করে কিন্তু তবু ভালবাসতেও ইচ্ছে হয়। এ যেন সেই কর্কশ কঠোর এক পর্বত, কিন্তু তেমন দুর্গম নয়। সাধনার নাকি দুটি অঙ্গ। একটি ধরে রাখা আর একটি ছেড়ে দেওয়া। নৌকোর মতন এক হাতে আচ্ছা করে কষে হাল ধরতে হবে, কিন্তু পাল দিতে হবে ছড়িয়ে। হাওয়া আর স্রোতের হাতে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন তাই। অহঙ্কারের সঙ্গে সোঽহং এর লড়াই। নতুন এক মজা পাই। মাইকেল

মধুসূদন দত্তকে দেখেছিলাম। মদ খেয়ে যখন উন্মাদ,কোনো দিকে খেয়াল নেই, যখন মনে হয় অহং-এর সঙ্গে আত্মবোধটিকেও একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন, তখনও তাঁর মানসলোকে কিন্তু তিনি শুদ্ধাত্মা বিশেষ। তখন তিনি লিখেছেন—"রে প্রমত্ত মন, কবে পোহাইবে রাতি, জাগিবি রে কবে।"

কিন্তু মানিক। মাইকেল-এর সঙ্গে মানিকের তুলনা করে কেউ কেউ মানিককে তোলবার চেষ্টা করেছেন, কেউ নামাবারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মাইকেল মাইকেলই আর মানিক মানিক। মাইকেলও যেমন ব্যর্থ নন তেমনি মানিকও নন। দুজনেই সার্থক সাধক, কিন্তু তবু তফাৎ আছে অনেক। মাইকেল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেছিলেন—

"আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত রশ্মিসম,
লও, বিঁধে দাও বাসনা-সঘন এ কালো নয়ন মম।
এ-আঁখি আমার শরীরে তো নাই ফুটেছে মর্মতলে,
নির্বাণহীন অঙ্গার সম নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও জ্বালাময় দুটি চোখ,
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার সে আঁখি তোমারি হোক।"

আর মানিক বলেছে···

অনুপম বললে—ওকে আমরা প্রবোধ বলেই ডাকি—কিন্তু ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাম দিয়ে লেখে—

আমার মুখে তখন কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। অনুপমের দিকে হাঁ করে চেয়েছিলাম। অনুপম বললে—চমৎকার বাঁশি বাজায়, জানিস—

—বাঁশি!

—হ্যাঁ বাঁশের বাঁশি!

আরো অবাক হয়ে গেলাম। বাঁশি ছেড়ে অসি ধরবার উদাহরণ মাত্র একবার আছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইতিহাসে। এবার কি সে-ই এসেছে কলম নিয়ে।

অনুপম বললে—রীতিমত মালকোষ বাগেশ্রী রামকেলী বাজায় বাঁশিতে। এই আমাদের বাড়ির পাশেই থাকে।

বললাম—কী রকম দেখতে?

অনুপম বললে—তুই আলাপ করবি?

বরাবর সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে আমার বড় ভয়। কোনও সাহিত্যিকের সঙ্গে যেচে গিয়ে আলাপ করি নি কখনও। কোথায় যেন পড়েছিলাম ছোটবেলায় যে, কাব্য পড়ে যেমন বোঝো কবি তেমন নয় গো। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে ইংরেজ বাঙালী কোনও সাহিত্যিকের সঙ্গেই কখনও পরিচয় করি নি। পরিচয় করবার ইচ্ছেই হয় নি। একমাত্র চার্লস ল্যাম্ ছাড়া আর কাউকে আমি ভালও বাসি নি বলতে গেলে। হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথ, বাড়ির পাশে মনোহরপুকুরে শরৎচন্দ্র থাকতেও সে-দুর্মতি কখনও হয় নি আমার। আর তাছাড়া পরিচয় করবো কোন্ সুবাদে। আমার পরিচয় দেবার মত কী আছে। আমি তো কেউ না। পোস্টে পাঠাই গল্প নানান কাগজে। কিছু বা সাইকেল-এ চড়ে কাগজের অফিসের বাক্সে ফেলে দিয়ে আসি। প্রবাসীতে ছাপা হয়, বিচিত্রাতে ছাপা হয়, ভারতবর্ষে ছাপা হয়, বসুমতীতে ছাপা হয়। কোনও কাগজে ছাপা হতে আর বাকি থাকে না। কিন্তু তবু সাহিত্যিক নই আমি। আমি দল ছাড়া লোক। কারোর কাছে গিয়ে যে দাঁড়াবো, সেখানে গিয়ে কী বলবো? যদি নাম জিজ্ঞেস করে, নাম বললে তো চিনবে না কেউ। বড় জোর বলবে—তোমার লেখা দেখেছি কাগজে—। ওই পর্যন্ত! আমি মানিকের সঙ্গে আলাপ করবো কোন্ সাহসে!

কিন্তু এর পর কতবার দেখলাম মানিককে! ছাতা হাতে, কালো বুট পায়ে, সাবান কাচা লঙক্লথের পাঞ্জাবি। ওই এক পরিচ্ছদ বরাবর। পঁচিশ বছর ধরে। মনে আছে এক সাপ্তাহিক কাগজের অফিসের ভেতরে একদিন বসে আছি, মানিক এসে হাজির। হাতে ছাতা নেই। কী ব্যাপার? না মাইনে পেয়েই কোথায় সমস্ত রাত

কাটিয়ে এখন আসছে। মাইনের টাকাটাও সেখানে খুইয়েছে, হাতের চির সঙ্গী ছাতাটাও। আবার একদিন দল বেঁধে চন্দননগরে গেছি। দেখি ট্রেন থেকে মানিকও নামছে একলা। ফেরবার সময় সেই এক ট্রেনে ফেরা। তখন পা ভালো করে পড়ছে না। হাওড়া স্টেশনে নেমে এক বাসে উঠে বসেছি সবাই। হঠাৎ মানিক উঠে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধকে বললে—আপনি বসুন! সেই শিথিল শরীর নিয়ে মানিক নিজে উঠে দাঁড়িয়ে রইল। তখনও সে টলছে। কিন্তু বাসের ঝাঁকুনিতে নয়। আবার একদিন ট্রামের ভিড়ে ময়লা জামা কাপড় পরা মানিক চলেছে। ট্রামের লোকের ভ্রূক্ষেপও নেই। খেয়ালও নেই যে পাশেই চলেছে পদ্মা নদীর মাঝির অদ্ভুত লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার দুঃখ হয়েছে তার দুরবস্থা দেখে। কিন্তু মানিকের? ট্রামের লোকের দুরবস্থা দেখে মানিকেরই দুঃখ হয়েছিল কিনা কারো তা জানবার উপায় নেই আজ।

আবার একদিন এক প্রকাশকের দোকানে টাকা চেয়ে নিরাশ হয়ে ফেরবার আগে মানিকের শেষ কথাগুলো যেন আজো কানে বাজছে। মানিক বললে—আজ টাকা দিলেন না বটে, কিন্তু আমি মারা গেলে আপনারাই হাজার হাজার টাকা একদিন দেবেন, কিন্তু তাতে আমার লাভ? আমার চোখের সামনে মানিক কতবার এসেছে গেছে—কিন্তু কখনও কোনও কথা হয় নি। কারণ আলাপ নেই যে। আলাপ করি নি যে।

অনুপম আবার একদিন বললে—প্রবোধের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোর!

বললাম—না।

বললে—আলাপ করবি?

বললাম—না।

—কেন?

বললাম—ভয় করে।

অনুপমও যেন অবাক হয়ে গেল। আলাপের সঙ্গে ভয়ের কী

প্রশ্ন তা সে সেদিন বুঝতে পারে নি। আমিও কিছু বলি নি। ভয় হবে না?

অনুপম বললে—কেন, তোর ভয় করে, কেন?

বললাম—একদিন পিসীমার কাছে ছোটবেলায় এক গল্প শুনেছিলাম, সাত রাজার ধন এক মানিকের গল্প। গল্পের শেষে...

পিসীমা বলতো—একদিন, দুই দিন, তিন দিন গেল। চার দিনের দিন রাত পোহালে রাজপুত্র ঘুমে ঢুলু ঢুলু। শিয়রে সাপ ফণা তুলে গর্জে উঠলো, আশের সাপ, পাশের সাপ গা-মোড়া দিয়ে উঠে রাজপুত্রকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো। নাগপাশের বাঁধনে রাজপুত্র সাপের বিষের ঘোরে অচেতন। কোথায় রইল কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুল, আর তার খোপায় আঁটা মোতির ফুল। শুকপক্ষী তখন ছড়া কাটছেন—

রাজ-রাজিত্তি দুধের বাটি
রাজকন্যা পরিপাটি
সোনার দানা মোহর থান
সাত রাজার ধন মানিক খান—

রাজবদ্যি এলেন রাজকুমারকে দেখতে। বললেন—রাজপুত্রের এ কঠিন রোগ, এক কাজ করতে পারলে এ রোগ সারবে। কী কাজ? না...

বললাম—রাজপুত্র বাঁচলো পিসীমা?

গল্প বলতে বলতে পিসীমা আবার ঘুমিয়ে পড়তো। আমারও এক সময়ে চোখ বুজে আসতো। বাইরে বাঁশঝাড়ের মট্ মট্ শব্দ। রাজপুত্র, কোটালপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, আর পাতালকন্যার স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি তখন দিগ্বিজয় যাত্রা করেছি আবার—একদিন একজন শ্রদ্ধেয়কে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন—সাহিত্যের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা কখনও ফুটপাথ দিয়ে হাঁটে না বিমল, একেবারে রাস্তার মধ্যেখান দিয়ে ওরা চলে, তাই বরাবর ওরাই গাড়ি চাপা পড়ে সকলের আগে—

—কিন্তু মাইকেল ?

—মাইকেলও মানিকের মত খাঁটি ব্রহ্মচারী ছিলেন, কিন্তু গাড়ি চাপা যে পড়েন নি তার কারণ তিনি কাছা এঁটেছিলেন—

দৌড়ে গেলাম অনুপমের কাছে। ভাবলাম বলবো—এবার আমি আলাপ করতে রাজি আছি ভাই—আলাপ করিয়ে দাও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে !

কিন্তু শুনলাম অনুপমের ভারি অসুখ। অ্যানিমিয়া। ডাক্তারে কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে। বাইরের ঘর থেকে ভেতরের ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

ফিরে এলাম। সেরে উঠলে আবার একদিন না-হয় যাবো। দু'জনের একই বছরে জন্ম। ক'দিনের তফাত শুধু। কিন্তু আসতেও যা যেতেও তাই। অনুপম আর আলাপ করিয়ে দেবার সুযোগ পেলে না! একটুর জন্যে দিন পাঁচেকের হের-ফের হয়ে গেল মাত্র। তা হোক, আমার কোনও ক্ষোভ নেই আর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য আর তার জীবনের মধ্যে আমি এক গূঢ় সত্যসূত্র দেখতে পেয়েছি। মানিকের জীবন এক দুর্জয় সমন্বয়-সাধনার উদাহরণ। তার অহং-লোকের যে সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছি তাতে তার গৌরব বেড়েছে বই কমে নি।

আত্মাকে অপরাজেয় করবার জন্যে জীবনের কাছে মানিক হার মেনেছে। সাধনা আর শব-সাধনা, তার কাছে মৃত্যুও যে জীবনেরই নামান্তর। আর এ-কাজে যে একবার জীবন দিয়েছে—সে তো ত্রিগুণাতীত হয়ে গেছে। পিসীমা তাই বলতো—সাত রাজার ধন এক মানিক—ও কি সামান্য জিনিস—সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে পাতালপুরীর সাতমহল প্রাসাদের শেষ কুঠুরিতে দুধ-সাদা সিন্দুকের তলায় থাকে কুঁচবরণ কন্যার মাথার মোতির ফুল। সেই ফুল পাহারা দেয় মস্ত এক অজগর। তার মাথার মণি—ওকি সামান্য জিনিস—ও যে সাত রাজার ধন! রামায়ণের মেঘনাদ যদি শেষ পর্যন্ত বধই হয়ে থাকে তো রামের চেয়ে সে কি কম বীর!

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় "দেশ" পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায়। অনুজ কথাশিল্পী বিমল মিত্র অগ্রজ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়েছেন এ প্রবন্ধের মাধ্যমে। এই শ্রদ্ধা নিবেদনের রীতি ভঙ্গী বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ মৌলিক, এবং বিমল মিত্রের একান্ত নিজস্ব। বিভূতিভূষণের আগমনে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তার কথাই শুধু লেখক এখানে বলেন নি, অত্যন্ত সহজ সরল ও আন্তরিকভাবে বাঙলা-উপন্যাস-সাহিত্যের একটি অধ্যায় এঁকেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসকেও যে উপাদেয় করে পরিবেশন করা চলে তারই নজীর আছে এ প্রবন্ধে। হাজার হাজার প্রবন্ধ লিখে যে কাজ হয় না, একটা গল্পের মাধ্যমে তা পূর্ণ হয়। এই জন্যেই পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত অবতার পুরুষদের বাণী গল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। Bible শুধু "Word of God" নয় বলেই "...it is true that the English people have been the people of one book, the Bible...", আমাদের দেশের "জাতকের গল্প", "হিতোপদেশ" ও "রামকৃষ্ণ কথামৃত" সম্পর্কে ঐ একই কথা প্রযোজ্য।—বিভূতিভূষণের সাহিত্যের যে মূল তত্ত্ব তা সহজ এবং সর্বজনবোধ্য করবার জন্যেই এই গল্পের অবতারণার প্রয়োজন হয়েছে।

*　　*　　*　　*

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়লে কিন্তু আমার 'পথের পাঁচালী'র কথা মনে পড়ে না, মনে পড়ে কেবল রাণাঘাট হিন্দু হোটেলের কথা।

কিন্তু রাণাঘাট হিন্দু হোটেলের কথা পরে বলব। তার আগে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিসভার কথা বলে নিই।

কোন সভা-সমিতিতে যাওয়া জীবনে সেই বোধ হয় আমার প্রথম। অর্থাৎ সভা-সমিতির সভাপতি বা প্রধান অতিথি কিছুই নই—শুধু একজন নিমন্ত্রিত দর্শক। তখন দর্শক কি শ্রোতা হিসেবেই বা কে আমায় নেমন্তন্ন করবে! কার এত দায় পড়েছে! আমার

তখন পরিচয়ই বা কী। তা-ও সে নেমন্তন্ন বলতে গেলে একরকম যেচেই পাওয়া। বন্ধুত্বের একটা ক্ষীণ সূত্র ছিল বিশু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেই সুপারিশের জোরেই দেবানন্দপুরে গিয়ে বক্তৃতা শুনে ধন্য হব। কৃতার্থ হব। এর বেশি আর কিছু নয়।

কিন্তু আমার কাছে সভার আকর্ষণটা ছিল আসলে বক্তৃতা শোনবার জন্যে নয়। আসল আকর্ষণ ছিল সভার সভাপতি বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশুকে বললাম—বিভূতিবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে খুব—

বিশু প্রথমে বিশ্বাস করতেই চায় নি। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ থাকাটা তার কাছে একটা অসম্ভব ব্যাপার।

বিশু বললে—কোথায় আলাপ হয়েছে?

বললাম—রাণাঘাটের ট্রেনে একদিন আলাপ হয়েছিল পাঁচ ছ'বছর আগে।—

বিশু তবু ছাড়বার পাত্র নয়।

বললে—কী রকম আলাপ?

বললাম—একসঙ্গে কয়েক ঘণ্টা খুব আড্ডা দিয়েছি তাঁর সঙ্গে —আমাকে দেখলেই চিনতে পারবেন তিনি, খুব আলাপী লোক—

বৌবাজারে শ্রীযুক্ত অবিনাশ ঘোষালের ছাপাখানায় তখন বিশু, আমি আর অবিনাশবাবু রোজ সন্ধ্যেবেলা আড্ডা দিই। সেইখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ মুন্সী নামে একজন বৃদ্ধলোক একদিন এসে খুব সমাদরে ওদের দুজনকে নেমন্তন্ন করলেন। আমি পাশে বসে-ছিলাম।

বিশু বললে—একেও একটা কার্ড দাও দ্বিজুদা—এ-ও লেখে টেখে—

কার্ড পেয়েই আমি ধন্য। তার ওপর কার্ডে লেখা রয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। আরো ধন্য হলাম। অনেক-দিন পরে বিভূতিবাবুর সঙ্গে দেখা হবে—এ-ও কি কম কথা!

যথাদিনে হাওড়া স্টেশনে আমরা তিনজন গিয়ে ট্রেনে উঠেছি। শরৎচন্দ্রের স্মৃতিসভায় নিমন্ত্রিত শ্রোতা—আমিও প্রায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

বিশুকে বললাম—আর কেউ যাচ্ছেন না ?

বিশু বললে—আর সবাই অন্য কামরায় উঠেছে—ব্যাণ্ডেলে নামলেই দেখা হবে—

ট্রেন প্রত্যেক স্টেশনে থামতে থামতে চলেছে। আমি ভাবছিলাম এতদিন পরে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হবে, কী করে প্রথম কথা বলব কী জানি! নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নেব তাঁর। কিন্তু এতদিন পরেও তো নিজের পরিচয় দেবার মত কিছুই নেই! কী বই আমি লিখেছি? কটা বই-ই বা আমার বেরিয়েছে? আমি তো এতদিন লেখাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমাকে দেখে কি চিনতে পারবেন তিনি। তিনি তো সুবিখ্যাত লোক, আর আমি অখ্যাত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত! তাঁর কাছে আমি নিজেকে কী বলে চেনাব!

মনে আছে এ-ঘটনারও প্রায় ছ'বছর আগেকার কথা। অর্থাৎ তখন সবে লেখাটেখার দিকে নজর গেছে। মাসিকপত্রিকা খুলে তখন আমার লেখার চেয়ে লেখকদের দিকেই ঝোঁক বেশি। লেখা পড়ি আর না-পড়ি লেখকদের নামটা ভালো করে মুখস্থ করি। যুদ্ধ তখন সবে একবছর হল বেধেছে। আমার ভাগ্নে কাবুলের সঙ্গে দেশে চলেছি।

কাবুল মানে আমার ভাগ্নেও বটে আবার আমার সাহিত্য-গুরুও বটে।

যে-বয়সে প্রাণের কথা খুলে বলতে না পারলে প্রাণ হাঁক-পাঁক করে, কাবুল আর আমি তখন সেই বয়সের ছেলে।

কাবুল হঠাৎ একদিন হয়ত বললে—এই 'সতীর পতি' পড়েছিস ?

সতীর পতি!

বললাম—'সতীর পতি' কী রে ?

কাবুল বললে—'সতীর পতি' প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখছে মাসিক বসুমতীতে—'নীলবসনা সুন্দরী'র চেয়েও ভালো—

কাবুলের দেখাদেখিই বলতে গেলে আমি প্রথম পদ্য লিখতে শিখি।

কাবুল একবার শরৎ নিয়ে কবিতা লিখেছিল। কবিতাটার দুটো লাইন আমার এখনও মনে আছে—

শরতের সোনালী রোদ শিশির-সবুজ—
আমার এ হিয়া হায় করেছে অবুঝ—

কাবুলকে দেখে তখন থেকেই আমার হিংসে হত। ও একদিন মস্ত কবি হয়ে উঠবে। আমি কিছুই হতে পারব না। আমাদের বাড়িতে নভেল পড়াই ছিল নিষিদ্ধ। লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে পড়তে হত। আলমারীর ভেতর সোনার জল দিয়ে বাঁধানো কয়েকখানা বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের গ্রন্থাবলী থাকত। বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র এঁদের সব বই। অনেকদিন বইগুলো পড়তে চেয়েছি মা'র কাছে।

মা বলত—আগে নিজের লেখা-পড়া করো, নইলে মুখ্যু হয়ে বসে থাকবে, কেউ ফিরেও চাইবে না তোমার দিকে—

বাবা বলতেন—ও-সব বই পড়ার ঢের সময় পাবে বাবা, নভেল-নাটক পড়বার সময় জীবনে ঢের আসবে—এখন আখেরের কথা ভাবো—

কিন্তু কাবুলের বাড়ির কথা ছিল আলাদা। তাদের বাড়িতে মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী আসত। তার ওপর পাড়ার লাইব্রেরী থেকে উপন্যাস আনাত দিদি। কাবুল নিজেও একটা উপন্যাস ফেঁদেছিল 'বিধিলিপি' নাম দিয়ে। নায়ক অল্পবয়সে বাপ মারা যাওয়ার পর কী-রকম করে একটা বাড়িতে টিউশ্যানি করতে গিয়ে তার ছাত্রীকে বিয়ে করে প্রচুর টাকা পেয়ে গেল। উপন্যাসের শেষটাও কী-রকম হবে তা-ও কাবুল আমাকে বলেছিল। এখন আর সে-সব মনে নেই আমার। কিন্তু সত্যিই কাবুলের ক্ষমতা

দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তার নায়কের 'বিধিলিপি' কী হয়েছিল তা আর আমার জানবার অবকাশ হয় নি। কারণ সে-বই লেখাও হয় নি এবং ছাপাও হয় নি শেষ পর্যন্ত! আর কাবুলের নিজের 'বিধিলিপি' তাকে সাহিত্য-জগৎ থেকে মিলিটারি-জগতে নিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বড়লোক না করুক, হাবিলদার করেছিল সে-কথাও শুনেছি।

কিন্তু যখনকার কথা বলছি তখন আমার লেখা কিছু কিছু ছাপা হয়, আর কাবুল পত্রিকা-অফিসে লেখা পাঠানো ছেড়ে দিয়েছে।

রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠে আমি আর কাবুল শেয়ালদ' স্টেশনে গিয়ে ভোরের ট্রেন ধরেছি। যুদ্ধের সময়। ট্রেনের ভেতরে তিলধারণ দূরের কথা বাইরে ট্রেনের ছাদে পর্যন্ত লোক উঠে বসেছে। সেই যে শেয়ালদ' স্টেশনে উঠেছি, তারপর টাইট্ হয়ে বসে আছি ছুপাশের চাপাচাপিতে। গরমে মাথার তালু ফেটে যাবার যোগাড়।

কাবুল হঠাৎ বললে—ওই দেখ, 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'—

এতক্ষণ নজরে পড়ে নি। চেয়ে দেখি পাশেই কোণ ঘেঁষে এক ভদ্রলোক একমনে একটা বই পড়ছেন।

কাবুল বললে—বইটা ভালো লিখেছে—আমি পড়েছি—

বললাম—কার লেখা রে?

কাবুল বললে—'পথের পাঁচালী' পড়িস নি? তাঁরই লেখা! বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—তোর দ্বারা কিস্সু হবে না, তুই 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' কার লেখা জানিস না, অথচ গল্প লিখতে চাস্—

কাবুল আমার মতই সব কাগজের আপিসে লেখা পাঠিয়েছিল, কিন্তু সব আপিস থেকেই তার লেখা ফেরত এসেছে। তাতে কিন্তু সে দমে নি, আমার ওপর গুরুগিরি সে তখনও সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক তখন বইটা পাশে রেখে একটু চোখ বুজে রয়েছেন।

কাবুল বইটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে লাগল। বইটা বেশ মোটা। প্রায় শ'তিনেক পাতা।

কাবুল বললে—আমার 'বিধিলিপি'টা ছাপলে এর চেয়েও মোটা হবে, বুঝলি—এইরকম ওপরে একটা ছবি দিতে হবে।

বলে কাবুল মলাটের ওপর লেখাটা পড়তে লাগল :

" 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' বিভূতিভূষণের সম্পূর্ণ নূতন ধারার উপন্যাস, পল্লীগ্রামের বাজারে একটি ভাতের হোটেলকে কেন্দ্র করে তিনি হোটেলওয়ালা, নরনারীদের দৈনন্দিন জীবন ও চিন্তাধারা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে পল্লীগ্রামের পরিবেশের মধ্যে অতি সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। পাঠক অল্পক্ষণের জন্য রাণাঘাট টাউনের এই ক্ষুদ্র ভাতের হোটেলের দরিদ্র, অশিক্ষিত, অথচ সহজ নরনারীদের অপরিচিত জগতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলবেন…"

কাবুল বললে—'বিধিলিপি'র মলাটেও এই রকম একটা লেখা দিতে হবে, বুঝলি…'বিধিলিপি' পাঠ করিলে পাঠক-পাঠিকাগণ অল্পক্ষণের জন্য শিক্ষিত অথচ সহজ নরনারীদের অপরিচিত জগতে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিবেন।…

বইটা নিয়ে আমিও নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। নতুন বই। আশ্বিন ১৩৪৭ সনে ছাপা।

বইটা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম।

চুপি চুপি কাবুলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম—ওরে, এই ভদ্রলোকের নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

কাবুলও চমকে উঠেছে। বললে—কীসে বুঝলি ?

—এই ত্যাখ্।

কাবুলকে দেখালাম—বইএর প্রথম পাতায় ভদ্রলোক কালি দিয়ে নিজের নাম লিখে রেখেছেন : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০শে আশ্বিন ১৩৪৭।

কাবুলের চোখ তখন চড়ক গাছ।

সশরীরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই গাড়ির ভিতর।

আমি আর কাবুল দুজনেই মুখের দিকে চেয়ে হতবাক হয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক তখনও চোখ বুজে আছেন। খদ্দরের একটা পাঞ্জাবি পরে। গলার বোতামটা একটু খোলা। মাথায় চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। এক মুখ পান। পায়ে য়্যালবার্ট জুতো। আপাদমস্তক দেখতে লাগলাম নজর দিয়ে। কে ভাবতে পেরেছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমনি চেহারা।

কাবুল বললে—মুখখানা লক্ষ্য করেছিস—ঠিক লেখকের মত—

আমিও দেখলাম—ঠিক লেখকের মতই চেহারা বটে; শরৎ চাটুজ্জ্যের ছবি দেখেছি—তাঁরই মতন অনেকটা দেখতে। তাহলে লেখকরা এই রকমই দেখতে হয়? ঠিক আমরা যেমন চুল ছাঁটি, তেমনি। কোনও তফাৎ নেই। গায়ের রঙটাও কালো। আমাদের মতন। হাতের আঙুলগুলোও দেখলাম। ওই আঙুলগুলো দিয়েই তো কলম ধরে লিখেছেন। ঠিক আমাদের মতই আঙুল। আমি আর কাবুল দু'জনেই নিজের নিজের হাতের আঙুলগুলো দেখতে লাগলাম। কোনও তফাৎ নেই।

কাবুল বললে—দ্যাখ্ ওঁর আঙুলগুলো অনেকটা আমার সঙ্গে মিলেছে।

আমি বললাম—আমার সঙ্গেও মিলেছে রে, এই দ্যাখ্—

ভদ্রলোক এতক্ষণে চোখ খুললেন। ট্রেনটা কোন্ স্টেশনে এসে থামল যেন তাই দেখে নিলেন একবার। আমাদের তখন অন্য কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরা দুজনেই একদৃষ্টে তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছি। ভদ্রলোক পাশে রাখা বইখানা তুলে নিয়ে আবার পড়তে লাগলেন।

কাবুলের সত্যিই সাহস আছে বলতে হবে।

সোজা জিজ্ঞেস করলে—এটা কি আপনার বই?

ভদ্রলোক হঠাৎ কাবুলের এই প্রশ্নে যেন একটু ফিরে চাইলেন। বললেন—আমাকে বলছ?

কাবুল আবার বললে—হ্যাঁ, বলছি বইটা কি আপনার?

ভদ্রলোক বললেন—না, ওঁর—ওই যে ও-দিকে বসে আছেন—ওঁর কাছ থেকে পড়তে নিয়েছি—

গাড়ির একেবারে উল্টোদিকে আর একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। সেই দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

কাবুল আবার জিজ্ঞেস করলে—ওই যে ফরসা মতন যিনি বাইরের দিকে চেয়ে আছেন?

ভদ্রলোক বললেন—না ওঁর পাশে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন—উনিই—

আমি আর কাবুল তুজনেই চেয়ে দেখলাম। খবরের কাগজের আড়ালে মুখটা আধঢাকা ছিল। ভালো দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা তুজনেই লজ্জায় আধমরা হয়ে গেলাম। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবে এতক্ষণ বাজে একজন লোককে নিয়ে কত কী ভেবেছি।

কাবুল চুপি চুপি বললে—আমি চোখ তুটো দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম এ কখনও বিভূতি বাঁড়ুজ্জে হতে পারে না—

বললাম—কেন? চোখ তুটা কী রকম?

কাবুল বললে—দূর, লেখকের চোখ কখনও ও-রকম হয়? শরৎ চাটুজ্জের ছবি দেখিস নি?

তারপর একটু হেসে বললে—চল্, ওঁর কাছে গিয়ে বসি গে—

বললাম—কেন?

কাবুল বললে—ওঁর সঙ্গে আলাপ করব—

বললাম—ওখানে যে বসবার জায়গা নেই—

কাবুল ততক্ষণে উঠে পড়েছে জায়গা ছেড়ে।

বললে—উঠে আয়, কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, পরের ইস্টিশানে যদি কেউ নামে তো বসে পড়ব ওখানে।

ভিড় ঠেলে উঠে কাবুলের পেছন-পেছন গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি দেখতে লাগলাম বিভূতিবাবুর দিকে। তখনও খবরের কাগজে মুখখানা ঢাকা। সাদা পপলিনের পাঞ্জাবি গায়ে। পায়ে শু।

চোখে মোটা শেলের চশমা। গায়ের রঙ কালো। দোহারা চেহারার মানুষ। না-রোগা না-মোটা।

আমি কাবুলকে বললাম—দেখেছিস, কোনও দিকে নজর নেই বিভূতিবাবুর।

কাবুল শুধু বললে—লেখক কিনা—

বললাম—আমার একটু একটু ভয় করছে ভাই—

কাবুল বললে—কেন? ভয় কিসের! আমি তো আছি—

বললাম—আমাদের সঙ্গে যদি কথা না বলেন?

কাবুল বললে—তোকে কিছু বলতে হবে না, আমি কথা বলব। আদর্শ হিন্দু হোটেলটা তো সব আমার মুখস্থ আছে, আমিই জিজ্ঞেস করব বইটা থেকে—

—কী জিজ্ঞেস করবি?

কাবুল বলল—আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করবো: আপনার কি ভাতের হোটেল আছে? ভাতের হোটেল না থাকলে অমন বই কেউ লিখতে পারে না, জানিস। অভিজ্ঞতা না থাকলে লেখকরা লিখবে কী করে! ধর না আমার 'বিধিলিপি'র কথা! অভিজ্ঞতা আছে বলেই তো লিখতে পেরেছি—ও সব আমার চোখে দেখা কিনা! লিখতে হলে সব চোখে দেখা চাই, জানিস, তবেই তো real হয়—

আমি চুপ করে ছিলাম। কাবুল আমার চেয়ে অনেক পড়েছে, অনেক জানে। লেখা অবশ্য ছাপা হয় না কাবুলের। কিন্তু 'বিধিলিপি' ছাপা হলে তখন কাবুলের নাম হবে খুব। আমার যাকিছু লেখা ছাপা হত 'প্রবাসী' পত্রিকায়, কাবুল পড়ত সেগুলো। বলত, অনেক ডিফেক্ট আছে এখনো তোর লেখায়—

কাবুলের লেখা ফিরে আসত আর আমার লেখা ছাপা হত বলে কাবুলের কিন্তু দুঃখ ছিল না কোনও দিন।

বলত—এরকম হয় রে—বিভূতি বাঁড়ুজ্জের নাম কি আগে কেউ জানত। 'পথের পাঁচালী' বেরোবার আগে কেউ নাম জানত কি?

আমারও 'বিধিলিপি' বেরোলে দেখবি তখন সব সম্পাদকরা কীরকম আপসোস করে—তখন দেখবি যেসব লেখাগুলো ফেরত দিয়েছে, বলব সেইগুলো আগে ছাপো তবে লেখা দেবো তোমাদের—

চারিদিকে ভিড়। রোদ্দুরে গরমে ভিড়ে গাড়ির সমস্ত প্যাসেঞ্জার আই-ঢাই করছে। বাইরে থেকে গরম হাওয়া আসছে—আর সমস্ত শরীর যেন ঝল্‌সে যাচ্ছে। থার্ড ক্লাস কামরা—দশগুণ লোক ঢুকেছে একটা গাড়ির মধ্যে।

কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও খেয়ালই নেই কোনদিকে। তিনি তখনও একমনে খবরের কাগজ পড়ে চলেছেন। যুদ্ধের সময়—খবরের কাগজ নানারকম খবরে ভর্তি। গাড়ির মধ্যে আরো অনেকগুলো প্যাসেঞ্জার খবরের কাগজ মুখে দিয়ে আছে। গল্প করে, পাশের লোকের সঙ্গে আলাপ করে তখন সবাই ক্লান্ত। সেই রাত থাকতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আমরা দুজন—দেশে পৌঁছাতে যার নাম সেই রাত ন'টা বাজবে। প্রতি বছর আমের সময় কাবুল আর আমি আম খেতে দেশে যাই। ট্রেন গিয়ে রাণা-ঘাটে পৌঁছবে বেলা বারোটার সময়। ওখানেই কিছু খেয়ে নিয়ে আবার বেলা তিনটে বেয়াল্লিশের গাড়ি ধরতে হবে।

বললাম—বিভূতিবাবু খুব পান খায় দেখছি—

সত্যিই দেখলাম, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় পকেট থেকে ডিবে বার করে পান মুখে পুরে দিলেন।

কাবুল বললে—পানটা খাওয়া ভালো, জানিস, আমিও পান খাবো এবার থেকে—

এতক্ষণে কোন্ একটা স্টেশন এসে গেল। কয়েকজন ওঠানামা করল। আমাদের দিকে একটা জায়গা খালি হতেই আমি আর কাবুল গাদাগাদি করে সেখানে গিয়ে বসেছি। একেবারে বিভূতি-বাবুর মুখোমুখি। খবরের কাগজটা সরালেই একেবারে সামনা-সামনি দেখতে পাব তাঁকে। কিন্তু খবরের কাগজও তিনি নামাচ্ছেন না আর আমরাও তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না স্পষ্ট। কী যে অস্বস্তি

হতে লাগল। মনে হল, খবরের কাগজের মধ্যে কী এমন বস্তু আছে যে, এমন মনোনিবিষ্ট হয়ে পড়ছেন।

কাবুল চুপি চুপি আমাকে বললে—তুই যেন কিছু বলিসনি, যা বলবার আমি সব বলব—

খানিকক্ষণ বাদে বিভূতিবাবু কাগজখানা চোখ থেকে নামালেন। একবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে আছেন তো তাকিয়েই আছেন। এদিকে চোখ ফেরাবার নাম নেই। বিভূতিবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চোখ দেখলেই বোঝা যায় যেন বড় স্বপ্ননিবিড় চোখ। দেখছেন না, যেন দৃষ্টিপাত করছেন। লেখকের দেখা তো ওই রকমই। ঠিক যে জিনিসগুলো দেখবার সেই জিনিসগুলোই দেখেন—আর সব দেখেও দেখেন না তাঁরা। এ-সব কথা আমার কাবুলের কাছেই শেখা! কাবুল আরো অনেক কথাই শিখিয়েছিল আমাকে।

কাবুল বলত—যদি লেখক হিসেবে নাম করতে চাস তো শুধু চোখ নয়, কানও খোলা রাখতে হবে—চোখ কান খোলা না থাকলে কচু অভিজ্ঞতা হবে। আমার 'বিধিলিপি' পড়লে বুঝতে পারবি সব আমার নিজের চোখ দিয়ে দেখা, নিজের কান দিয়ে শোনা—

হঠাৎ বিভূতিবাবুর কী হল কে জানে। আমাদের দিকে এতক্ষণে নজর পড়ল।

বললেন—তোমরা কোথায় যাবে খোকা?

কাবুল মুখিয়ে ছিল।

উত্তর দিলে—আমরা ফতেপুর যাবো, আমাদের দেশে—আম হয়েছে কিনা, আম খেতে যাচ্ছি আমরা—

বিভূতিবাবু বললেন—তা হলে তো রাণাঘাটে নামতে হবে তোমাদের, ভাত খাবে কোথায়? তোমাদের গাড়ি তো তিনটে বেয়াল্লিশে—

কাবুল বললে—আপনার বুঝি হোটেল আছে রাণাঘাটে—?

বিভূতিবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তোমরা জানলে কী করে? আমি নতুন হোটেল খুলেছি—

কাবুল বললে—আমরা জানি! আমরা দু'জনে আপনার হোটেলে খাবো আজ!

বিভূতিবাবু হাসলেন একটু!

কাবুল আরো সাহস পেয়ে গেল। বললে—ফার্স্ট ক্লাস পাঁচ আনা আর সেকেণ্ড ক্লাস তিন আনা—ফার্স্ট ক্লাসে মুড়িঘণ্ট আর সেকেণ্ড ক্লাসে মুসুরি-খেসারি মিশেল ডাল……

বিভূতিবাবু খুব মজা পেলেন। বললেন—তোমরা তো সব জানো দেখছি—

কাবুল বললে—আমরা 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' বইটা পড়েছি—

বিভূতিবাবু আরো হাসলেন—তোমরা পড়েছ? ঠিক-ঠিক মিলে যায়, না?

কাবুল বললে—বইটা আমার খুব ভালো লেগেছে, বইটা পড়লে মনে হয় হোটেলে গিয়ে দু' তিন দিন কাটিয়ে আসি, এত ভালো লেগেছে কী বলব!

বিভূতিবাবু হাসতে লাগলেন তেমনি করে।

বললেন—ওই যে ওই ধারের ভদ্রলোককে দিয়েছি, উনি পড়তে চাইলেন, অনেকেই পড়ে ভালো বলেছে বইটা—

কাবুল বললে—হাজারী ঠাকুর এখনও আছে ওখানে? গেলে দেখা যাবে!

বিভূতিবাবু আরো হাসলেন। হাসি থামিয়ে বললেন—হাজারী নয়, আমার ঠাকুরের নাম বিশ্বম্ভর, সেই নামটাকেই হাজারী করে দেওয়া হয়েছে—

কাবুল বললে—আপনি 'সতীর পতি' পড়েছেন?

বিভূতিবাবু বললেন—'সতীর পতি' কার লেখা?

কাবুল বললে—পড়েন নি? প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের লেখা? ছোটবেলায় পড়েছিলাম 'মাসিক বসুমতী'তে। সেটাও যেমন

ভাল লেগেছিল, 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'টাও তেমনি ভাল লেগেছে—

বিভূতিবাবু বললেন—তোমরা কোথায় থাকো?

কাবুল বললে—এ থাকে চেতলায়, আর আমি বালিগঞ্জে, এ আমার মামা হয়—

বিভূতিবাবু বললেন—বেশ—বেশ ছ'জনেরই দেখছি এক বয়েস—

কাবুল হঠাৎ বললে—এও লেখে—

বিভূতিবাবু আমার দিকে চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী লেখে?

কাবুল বললে—এই গল্প-টল্প—ছাপা হয় কাগজে—এর নাম বিমল মিত্তির—

—কোন্ কাগজে?

কাবুল বললে—এই প্রবাসী-ট্রবাসীতে মাঝে মাঝে লেখে……

বিভূতিবাবু আমার দিকে এতক্ষণে যেন ভালো করে নজর দিলেন একটু। আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললাম। ভাবলাম যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন তো কী উত্তর দেব! আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠেছি তখন নিজের মধ্যেই।

কাবুল আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনি প্রবাসী পড়েন না?

বিভূতিবাবু বললেন—পড়ি, তবে সব সময় পড়া হয় না—

কাবুল বললে—আমিও একটা উপন্যাস লিখছি, প্রায় তিনশো পাতা লেখা হয়ে গিয়েছে, নাম দিয়েছি 'বিধিলিপি'—

বিভূতিবাবু বললেন—বাঃ বেশ নাম দিয়েছ তো—

কাবুল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল—আপনার পছন্দ হয়েছে?

বিভূতিবাবু পকেট থেকে ডিবে বার করে আবার একটা পান মুখে পুরে দিলেন। তারপর খবরের কাগজটা নিয়ে আবার পড়তে লাগলেন মন দিয়ে।

কাবুল বললে—'উপন্যাস'টা নিয়ে এলে ভালো হত, একটু পড়িয়ে শোনাতাম রে—

বললাম—আমার কাছে আমার দুটো ছাপা লেখা রয়েছে স্যুট-কেসের মধ্যে—দেব পড়তে ভাই ?

কাবুল বললে—দূর, ছোটগল্প পড়িয়ে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই, উপন্যাস হলে আলাদা কথা। গল্প তো সবাই লিখতে পারে, ওতে আর বাহাদুরি কী ?

তারপর একটু থেমে চুপি চুপি বললে—আজকে বরং চল্ ওঁর হোটেলে গিয়ে দুপুরবেলার ভাতটা খাই—সেকেণ্ড ক্লাস না ফার্স্ট ক্লাসে খাবি ? তোর কাছে কত টাকা আছে ?

আমি পয়সা গুণে দেখলাম—আমার কাছে এক টাকা সাড়ে চার আনা আছে।

কাবুল বললে—কুছ পরোয়া নেই, আমার কাছেও একটা টাকা আছে—ওদিকটা না-হয় তিন কোশ রাস্তা হেঁটে মেরে দেব—

স্টেশন থেকে নেমে তিন ক্রোশ পথ। হেঁটে, নয় তো গরুর গাড়িতে যাওয়া যায়। মাঝখানে ইছামতী পার হতে হয়। তার জন্যে দুজনের মাত্র দুটো পয়সা লাগবে। হেঁটেই যাব। বিভূতি-বাবুর হোটেলে ফার্স্ট ক্লাসেই খাব। সেকেণ্ড ক্লাসে খেলে মান থাকবে না আমাদের। আলাপ তো হয়ে রইল। হোটেলে উঠে আলাপটা আরো জমবে।

বেলা যখন প্রায় বারোটা, তখন ট্রেন এসে পৌছুল রাণাঘাটে। আগে আগে রাণাঘাটে এসে পাঁউরুটি আর গরম গরম পান্তুয়া খেয়ে খিদে মিটিয়েছি। এবার আর তা নয়। এবার গরম গরম ভাত, মাছের ঝোল, ডাল, ভাজা, তরকারী···

সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে।

—এই নিন মশাই আপনার বইখানা নিন্।

আগেকার ভদ্রলোকটি বইটা দিয়ে দিলেন বিভূতিবাবুর হাতে।

বিভূতিবাবু বললেন—তোমরাও যাবে তো? চলো—

কুলি মালপত্র নিতে ঢুকে পড়ল কামরার ভেতর। গরমে এতক্ষণ সব সেদ্ধ হয়েছে। এবার ঢাকা প্ল্যাটফরমে নেমে চা সিঙ্গাড়া খাবে। পাঁউরুটি পান্তুয়া খাবে। খাবার আয়োজন এখানে অনেক।

আমাদের কুলি মালপত্র নিতে দেরি করছে।

বিভূতিবাবুর সঙ্গে মালপত্র কিছু নেই।

বললেন—তোমরা বরং এস, আমি চলি—রাণাঘাট হিন্দু হোটেল বললেই তোমাদের পৌঁছে দেবে—

কাবুল বললে—কী চমৎকার লোক, দেখছিস, এত বড় লোক, অথচ মোটে অহঙ্কার নেই একটুও—

বললাম—আচ্ছা, লেখক মানুষ, তা হোটেল করেছে কেন ভাই?

কাবুল বললে—ঘরে দরজায় খিল বন্ধ করে থাকলে লেখক হওয়া যায় নাকি?—হোটেল করলে কতরকম লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়, কত অভিজ্ঞতা হয়, অভিজ্ঞতাই তো সব—সেইটেই তো লাভ—

বিভূতিবাবু চলে গেলেন।

কুলি মাথায় মাল তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবেন বাবুরা?

বললাম—রেল-বাজারে চল্—রাণাঘাট হিন্দু হোটেল-এ—

আর বলতে হল না। কুলি মাল নিয়ে আগে আগে চলল। আশে-পাশে লোকের ভিড়। ভিড় কাটিয়ে আমরা চলেছি। লোক-জনের কথা-বার্তা কানে আসছে। মনে হতে লাগল সত্যিই যেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশে এসে পড়েছি। যতবার ওদিকে গিয়েছি ততবারই মনে হয়েছে, রাণাঘাটের ওপার থেকে এই বনগাঁ, শান্তিপুর, কেষ্টনগর সব এলাকাটাই যেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একলার। আজও ভাবলে অবাক লাগে, একদিন এই অঞ্চলটাই সমস্ত বাঙলা দেশকে জয় করেছে কেমন করে, হয়তো বা পৃথিবীকেই

জয় করেছে আজ। একদিন এই অঞ্চলের একটি শিশুই বাঙলা দেশে এসে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিয়েছিল। সে-ও তো বেশি দিনের কথা নয়। 'কালিকলম' আর 'কল্লোল' তখন খুব হৈ চৈ বাধিয়ে তুলেছে। হাট বড় নয়, কিন্তু হট্টগোলের ঠেলায় টেঁকা দায়। এ একেবারে নতুন আমদানী। একদল বলছে—এমন জিনিস আগে কখনও লেখা হয় নি। এ মহৎ সৃষ্টি! আর একদল বলছে—এসব কুৎসিত। এটা অসাহিত্য; তখনকার দিনের 'বঙ্গবাণী', 'স্বদেশী বাজার', 'সোনার বাঙলা', 'বসুমতী', 'শনিবারের চিঠি'তে তাই নিয়ে মহা সোরগোল উঠেছে। সে এক দিন গেছে বটে। আমরা তখন একেবারে ছোট। কার কথা বিশ্বাস করি! যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন ওটা অসাহিত্য, তখন বুঝি ওটা অসাহিত্য! আবার যখন শরৎচন্দ্র বলেন, ওটাই আসল সাহিত্য, তখন বুঝি ওটা সাহিত্যই! কয়েক বছর কাটল এমনি করে। প্রথম মহাযুদ্ধ থেমে গেল। তারপরেও কয়েক বছর। অর্থাৎ প্রায় ১৯৩০।৩২ সাল পর্যন্ত বাঙলা দৈনিক মাসিকের পাতায় তার সাক্ষী আছে। কিছুতেই আর সে-তর্ক থামে না। তর্কের ঝড়ে আকাশ যখন প্রায় কালো হয়ে উঠেছে তখন দৈবাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল।

কাবুল আমার তখনকার সঙ্গী। একদিন সন্ধ্যেবেলা দৌড়তে দৌড়তে আমাদের বাড়ি এসে হাজির।

হাঁফাচ্ছে তখনও।

বললাম—কী রে, হঠাৎ কী মনে করে?

একজামিন সামনে। নওয়া-খাওয়ার সময় নেই আমাদের। কেতাব নিয়ে হিম-সিম খেয়ে যাচ্ছি। একটা পাতা পড়ি তো আর একটা পাতা ভুলে যাই। কোন্‌দিক রাখতে কোন্‌দিক সামলাবো তাল ঠিক রাখতে পারছি না। এমন সময় কাবুলের মুখের ভাব-ভঙ্গি দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

বললাম—কী রে, সব পড়া তৈরি হয়ে গেল?

কাবুল বললে—না, কী করব বুঝতে পারছি না তাই তোর কাছে এলাম—

বললাম—কেন, কী হল তোর ?

কাবুল যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠবে।

বললে—একটা যা বই পড়েছি না,…

বললাম—'সতীর পতি ?'

কাবুল বললে—দূর, সতীর পতি-টতি নয়, এ বানানো গল্প নয়, এ একেবারে সত্যিকারের গল্প, আমাদের ফতেপুরের গল্প একেবারে, ঠিক সেইরকম আম কুড়োন আর আম-আঁটির ভেঁপু বাজান—ঠিক যেন আমাদের দেখে লেখা…

বললাম—নাম কী বইটার ?

কাবুল বললে—পথের পাঁচালী !

বললাম—কে লিখেছে ?

কাবুল বললে—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমিও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নয়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নয়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় নয়—এ একেবারে নতুন নাম। এ আনকোরা লেখক !

কাবুল বললে—অনেক বই পড়েছি ভাই, অনেক লেখা দেখেছি, কিন্তু এ একেবারে অন্যরকম।

সত্যিই অন্যরকম ! একেবারে অন্যরকম ! অত যে তর্ক উঠল, অত যে ঝড় বইল, সব নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল এক মিনিটে ! কোন্‌টা সাহিত্য আর কোন্‌টা অসাহিত্য তা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না, তা নিয়ে আর বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে না। একেবারে মূর্তিমান সাহিত্য এসে হাজির হয়েছে এবার।

সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সশরীরে পাওয়া গেছে ! সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একেবারে এক ছাদের তলায়, চার দেয়ালের মধ্যে পাওয়া গেছে, এ কি কম কথা !

কুলি মালপত্র নিয়ে হাজির হল রেল-বাজারে ! একটা টিনের

চালের হলদে রঙএর বাড়ি। মাথার ওপর সাইনবোর্ডে লেখা—'রাণাঘাট হিন্দু হোটেল।' আর দেয়ালের গায়ে আলকাৎরা দিয়ে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে ঃ

এই যে বড়দা আসুন
ভদ্রলোকদের সস্তায় আহার ও বাসস্থান
আসুন! দেখুন!! পরীক্ষা করুন!!!

মনে হল যেন অনেক দুর্গম স্থান অতিক্রম করে একেবারে এক দেবমন্দিরে এসে হাজির হলাম আমরা। কোথায় সেই মোগল যুগের দুর্গেশনন্দিনী! কোথায় রাজস্থানের পার্বত্য প্রদেশ রূপনগর। একটা বুড়ী কতকগুলি ছবি বেচতে এসেছে রূপনগরের রাজা বিক্রম-সিংএর অন্দরমহলে—

একজন জিজ্ঞেস করলে—এ কার তসবীর আয়ি?

বুড়ী বললে—এ শাহ্‌জাহান বাদশাহর তসবীর!

মেয়েটি বললে—দূর মাগী, এ দাড়ি যে আমি চিনি, এ আমার ঠাকুরদাদার দাড়ি—

আর একজন বললে—সেকি লো, ঠাকুরদাদার নাম দিয়ে ঢাকিস কেন, ও যে তোর বরের দাড়ি—

এ-সব রাজা-রাজড়া জমিদার-জোত্‌দারদের সদর-দেউড়ি মাড়িয়ে আমরা কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলুম অনেক কষ্টে। কলকাতায় এসে দেখি একটা বাড়ির মধ্যে বেশ তখন তর্ক বেধে গেছে—

হরমোহিনী বলছেন—একটা কথা বলি বাছা, যা কর তা কর, তোমাদের ওই বেয়ারাটার হাতে জল খেও না—

পাশেই আর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারনাম সুচরিতা। সে বললে—কেন মাসি, ওই রামদীন বেয়ারাই তো তার নিজের গোরু দুইয়ে তোমাকে দুধ দিয়ে যায়—

হরমোহিনীর দু' চোখ কপালে উঠল। বললেন,—অবাক করলি মা তুই, দুধ আর জল এক হল?

আমরা অবাকে হয়ে গিয়েছিলাম সেদিনকার ইংরেজ-শাসিত নারী-

বর্জিত সমাজে ললিতাকে দেখে। ঘুমের মধ্যেও সুচরিতার বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে একলা দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পেতাম।

আমাদের সাহস বেড়ে গেল খুব। সাহস পেয়ে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে গেলাম, আরো অনেক পথ পার হলাম। গৃহস্থবাড়ি ছেড়ে একটা মেস-বাড়ির দোতলার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি যে একেবারে অন্য আবহাওয়া। একটা ঘরে সব বাবুরা তখন আপিসে চলে গেছে। একা সতীশ বসে আছে।

এমন সময় সাবিত্রী ঝি এসে ঢুকল। বললে—এ কি, আজ যে ইস্কুল গেলে না বড় ?

তারপর জাহাজে চড়ে বর্মামুলুকে গেছি, বিলেতে গেছি, কোথায় যাই নি আমরা ? যেন আমাদের আফিম খাইয়ে দিয়েছে কেউ। শ্রীকান্তের সঙ্গে কেঁদেছি, ভালোবেসেছি, কখনও আবার আমরাও কাঁদিয়েছি, ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে। কখনও-কখনও 'ষোল আনা' গ্রাম পরিক্রমা করেছি শৈলজানন্দের সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কুকুর বেড়াল, এমন কি গাছপালাটা পর্যন্ত আমাদের আপনার হয়ে গিয়েছে। চোখ জুড়িয়ে গিয়েছে আমাদের, মন ভরে গিয়েছে আমাদের। আর কিছু শুনতে চাই নি আমরা। আর কিছু ভালো লাগে নি আমাদের। কেউ পটলডাঙার বস্তির গল্প বলতে এসেছে—আমরা বলেছি : ওসব শুনতে চাইনে। কেউ বালিগঞ্জের লুসি-লতিকার গল্প বলতে এসেছে—আমরা বলেছি : ওসব শুনতে চাইনে। এহ বাহ্য— আগে কহো আর। অন্য কিছু বলো শুনি।

সত্যিই কেউ অন্য গল্প সেদিন শোনাতে পারে নি আমাদের। কেউ অন্য গল্প বলতেও পারে নি। আমরা তখন ইংরিজী গল্প পড়তে গেছি। টলস্টয় পড়েছি, ডিকেন্স্ পড়েছি, ব্যালজাক পড়েছি, ডস্টয়ভস্কি পড়েছি। বাঙলাতে আর গল্প নেই। আমাদের প্রায় হতাশ হবার অবস্থা।

এমন সময় একি !

কোথা থেকে কে একজন এসে কী গল্প শোনাল—আর আমরা একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। এ তো আর কারো গল্প নয়, আমাদেরই গল্প যে এ! দুর্গাই তো আমার বোনের নাম, সর্বজয়া তো আমারই মা, ইন্দির ঠাকরুণই আমার তো পিসিমা, আমার বাবার নামই তো শ্রীহরিহর চক্রবর্তী! আর আমার নামই তো…

মনে হল এ যেন তীর্থস্থান। এই 'রাণাঘাট হিন্দু হোটেল'—এ যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পীঠস্থান।

কুলি মালপত্র নিয়ে ভিতরে যেতেই দেখি বিভূতিবাবু তক্তপোশের ওপর একটা ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে আছেন।

আমাদের দেখেই বললেন—তোমরা এসে গেছ—ভালোই হয়েছে—ওরে যদু—

—যাই বাবু—

যদু আসতেই বিভূতিবাবু বললেন—বিশ্বম্ভরকে বল্—এদের দুটো ফার্স্ট ক্লাস মিল দিতে—দুরকম ভাজা, মুড়িঘণ্ট আর পোনা মাছের কালিয়া—তোমরা কলাপাতায় খাবে না কাঁসার থালায় খাবে?

উঠোনের চৌবাচ্চায় হাত-পা ধুয়ে নিলাম দুজনে।

যদু বললে—ওই ঘরে গিয়ে বসুন বাবুরা, আমি ভাত বেড়ে ডাকবো—

কাবুল চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। বললে—দাঁড়া ভালো করে চারদিকটা দেখে নিই, ঠিক 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র সঙ্গে মেলে কিনা দেখি—

উঠোনের এককোণে এঁটো বাসনের ডাঁই। কয়েকটা কাক ওৎ পেতে বসে আছে পাঁচিলের ওপর। তার ওপাশে একটা সজনে গাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছে ভেতর দিকে। রান্নাঘর থেকে রান্নার মসলার গন্ধ আসছে।

বললাম—চল্ রে, ঘরে গিয়ে বসি—

তবু কাবুল নড়ে না।

বললাম—কী দেখছিস্?

কাবুল বললে—একটু দাঁড়া না, পদ্ম-ঝি আর হাজারী ঠাকুরকে দেখা যাবে এখুনি—

আমাদের কথা বোধ হয় কেউ শুনতে পাচ্ছিল।

ভেতর থেকে কার যেন গলা পেলাম—ওখানে কে গা ?

আওয়াজটা পাশের ঘরের ভেতর থেকে এসেছিল। মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখি একটা কালো মতন লোক খালি গায়ে বোধ হয় লিখছিল আর বিড়ি খাচ্ছিল। লোকটা আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

আবার বললে—বনগাঁ না শান্তিপুর—কোন্‌টা ?

কাবুল আর আমি তুজনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। তক্তপোশের ওপর একটা খাতায় কী সব লিখছে লোকটা। হাতে তখনও কলম ধরা রয়েছে। আর এক হাতে আধপোড়া বিড়ি একটা। সামনে একটা কাঁসার বাটিতে অনেকগুলো পোড়া বিড়ির টুকরো। একেবারে ঘুন্‌সি পর্যন্ত পুড়িয়ে খাওয়া।

লোকটা বললে—বোস—

আমরা তু'জনেই বসলাম।

লোকটা আবার বললে—কোত্থেকে আছো তোমরা ? বাড়ি কোথায় ?

কাবুল বললে—এ থাকে চেতলায় আর আমি বালিগঞ্জে—আমি এর ভাগ্নে—

লোকটা বিড়িতে শেষ টান দিয়ে বললে—তোমরা কাকে খুঁজছিলে ? পদ্ম-ঝি না কি বলছিলে ?

বললাম—ও আমাকে পদ্ম-ঝি আর হাজারী ঠাকুরকে দেখাবে বলছিল—

পদ্ম-ঝি !

লোকটা বললে—পদ্ম-ঝি বলে তো এখানে কেউ নেই—আর হাজারী ঠাকুর কে ?

কাবুল রেগেই গিয়েছিল লোকটার কথায়।

বললে—পদ্ম-ঝি আর হাজারী ঠাকুর আছে কী না আছে তা

আপনার দেখবার দরকার কী?—আমি একে বলছি, আপনি আমাদের কথায় ফোড়ন দিতে আসেন কেন? আপনি বসে বসে খাতা লিখছেন, লিখুন না—

লোকটা কিছু বললে না প্রথমে। তারপর একটু থেমে বললে—কলকাতার ছেলে, মেজাজ তো দেখছি খুব গরম—

কাবুল বললে—মেজাজ গরম হবে না? আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, পয়সা দিয়ে খাব, খেয়ে চলে যাব, কারোর তো কথার ধার ধারি না—

লোকটা বললে—বাঃ, এ যে গায়ে পড়ে ঝগড়া—কী বলেছি তোমাদের শুনি?

কাবুল বললে—আপনি তো বললেন পদ্ম-ঝি এখানে নেই—হাজারী ঠাকুর কার নাম?

লোকটা বললে—তা কি এমন অপরাধ হয়েছে তাতে?

কাবুল বললে—অপরাধ হয়েছে কিনা যদি বুঝতেন তাহলে আর হোটেলে বসে খাতা লিখতেন না—বিভূতিবাবুর মত উপন্যাস লিখতেন আর এই হোটেলের মালিক হতেন—

লোকটা বললে—উপন্যাস?

কাবুল বললে—খাতা লিখছেন খাতাই লিখে যান। উপন্যাসের কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো না—

পেছন থেকে যদু ডাকলে—ভাত দেওয়া হয়েছে বাবুরা, খেতে আসুন—

খিদেও পেয়েছিল খুব।

কাবুলকে বললাম—চল্, খেয়ে উঠে বিভূতিবাবুকে বলবো, আপনার হোটেলের সব ভাল মশাই, কিন্তু মুহুরীটা তেমন সুবিধের নয়, আপনি যে উপন্যাস লেখেন তাই আপনার মুহুরী জানে না—

মুড়িঘণ্ট দিয়েছিল। দুরকম ভাজা। মাছ ভাজা আর পটল ভাজা। চালটা একটু মোটা। তা হোক, যুদ্ধের সময় এর চেয়ে ভাল চাল কোথায় পাবেন। সাহিত্যিক না হয়ে অন্য দোকানের মালিক

হলে ঠকিয়ে ছাড়ত! এর থেকে ভালো খাওয়া কি বাড়িতেও খাই আমরা! খেয়ে উঠতেই দু' খিলি পান।

যদু বললে—খেয়ে উঠে একটু গড়াবেন নাকি ও-ঘরে? আপনাদের ট্রেন তো সেই তিনটে বেয়াল্লিশে—

কাবুল বললে—মাফ করো বাবা, তোমাদের মুহুরীটির সামনে আর যাচ্ছিনে—নীরেট মুখ্যু লোক একটা—চলো বিভূতিবাবুকে গিয়ে বলতে হবে—

আমরা বিভূতিবাবুর ঘরে যাবো এমন সময় হৈ হৈ পড়ে গেল। স্টেশনের দিকে ইঞ্জিনের বাঁশির শব্দ পেলাম।

যদু বললে—ওই বনগাঁ লোকেল এসে গেছে—

বলেই দৌড়ল সদরে। আর দেখতে দেখতে পিল্ পিল্ করে লোক আসতে লাগল। বনগাঁ লোক্যাল নাকি লেট্ ছিল। হোটেলময় সাড়া পড়ে গেল। এতক্ষণ যে হোটেল খাঁ খাঁ করছিল, তাই আবার কলমুখর হয়ে উঠল এক নিমেষে।

বিভূতিবাবুর চীৎকার শোনা গেল—ও-ঘরে দু' নম্বরে দুটো ফাস্ ক্লাস, চোদ্দটা সেকেন্ ক্লাস,—আর পাঁচ নম্বরে তেরটা সেকেন ক্লাস্, শিগ্গীর—

বিভূতিবাবুর ঘরে গিয়ে দেখি, সেখানে তখন গিস্ গিস্ করছে লোক। পোঁটলা পুঁটলি তোরঙ্গ স্যুটকেস-এ ভর্তি হয়ে গেছে ঘর। বিভূতিবাবুও ব্যস্ত। প্যাসেঞ্জাররা গায়ের জামা খুলছে। হাতমুখ ধোবে, স্নান করবে। যদু একবার আসছে এ-ঘরে, আর একবার বেরিয়ে যাচ্ছে?

—কই গো, তোমাদের কলঘরটা দেখিয়ে দাও তো।

—ওহে, যদু না মধু, বলি ফাস্ ক্লাস কত করে তোমাদের হোটেলে?

—ওহে চৌবাচ্চায় জল নেই যে তোমাদের। জল দাও—বলি বিনা পয়সার জল বলে এঁটো হাতে থাকবো নাকি?

অনেক গোলমাল, অনেক ঝামেলা। তখন আর বিভূতিবাবুর সঙ্গে কথা বলবার ফুরসৎ নেই, কত কথা বলবো বলে এসেছিলাম,

সব নষ্ট হল। বনগাঁ লোক্যাল লেট্ হওয়াতে সময়ের সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেল।

তিনটে বেজে গেছে।

কুলির মাথায় মালপত্র নিয়ে স্টেশনে আসবার পথে বিভূতিবাবুর কথাই ভাবছিলাম, যে মানুষটি এমন গল্প লেখে, সে-মানুষটি আবার এমন করে হোটেল চালায় কেমন করে।

কাবুল বললে—দেখলি না, অত গোলমালের মধ্যেও কেমন নির্লিপ্ত-নির্লিপ্ত ভাব—কেমন যেন একটা নিঃসঙ্গ-নিঃসঙ্গ চোখের দৃষ্টি। কোনও দিকেই যেন খেয়াল নেই—টাকা পয়সার দিকেও তেমন নজর নেই, যা করে ওই মুহুরী বেটা—। বিভূতিবাবুকে ভালো মানুষ পেয়ে মুহুরী বেটা নিশ্চয়ই টাকাটা-সিকেটা সরায়—

এর পর আর কখনও রাণাঘাট হিন্দু হোটেলে ওঠা হয় নি। এর পর কলকাতায় বোমা পড়ল। কলকাতা থেকে লোক পালাতে শুরু করল। তখন রেলে চাকরি নিয়ে চক্রধরপুরে চলে গেলাম আমি। বিয়ে করলাম। দুর্ভিক্ষ হল পঞ্চাশ সালে। লেখার কথাই মন থেকে মুছে ফেললাম। আর আমিও রেলে ঢুকলাম, ওদিকে সেই সময় কাবুলও মিলিটারিতে চাকরি নিলে। তার 'বিধিলিপি'ও আর শেষ হল না। শেষ হয়ও নি। বই-এর জগৎ আর সাহিত্যের জগৎ থেকে চির-বিদায় নিয়ে আমি চাকরি করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে সবই ভুলে গেলাম। কারা লিখতো, কীরকম লিখতো, কা'র লেখার কীরকম চাহিদা ছিল, তাও ভুলে গেলাম! শেষে যখন বহুদিন পরে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম তখন দেখি আবহাওয়া বদলে গেছে। যার নাম ছিল না সে নাম করেছে, যার নাম ছিল তার নাম ডুবেছে। সাহিত্যের উত্থান-পতনের ইতিহাসে কত যোগ্য-অযোগ্যের পাকাপাকি স্থান-নির্ণয় হয়ে গেছে তারও আর ইয়ত্তা নেই বুঝি!

এতদিন পরে আবার সাহিত্য-জগতের সংস্পর্শে এসে পুরোন কথা সব মনে পড়তে লাগল।

বিশুকে বললাম—বিভূতিবাবু ট্রেনে আসবেন না মোটরে আসবেন ?

বিশু বললে—এই ট্রেনেই তো যাচ্ছেন—প্লাটফরমে নেমে দেখা হবে সকলের সঙ্গে—

জিজ্ঞেস করলাম—বিভূতিবাবুর সেই ভাতের হোটেলটা আছে এখনও—?

বিশু জানত না।

বললে—ভাতের হোটেল ? বিভূতিবাবুর ?

বললাম—বাঃ, সেই হোটেলে গিয়ে খেয়ে এসেছি আমি আর আমার ভাগ্নে—খুব অমায়িক লোক সত্যি—অত হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যেও কেমন করে যে লেখেন অমন, আশ্চর্য !

বিশু বললে—ওঁর লেখা যেমনি মিষ্টি, মানুষটাও তেমনি মিষ্টি—

খানিক পরেই ট্রেন এসে থামল ব্যাণ্ডেল জংশনে। বেলা তখন প্রায় তিনটে। পিল্ পিল্ করে লোক নামতে লাগল ট্রেন থেকে। চেহারা পোশাক-পরিচ্ছদ দেখেই বোঝা গেল কারা মীটিং-এর লোক, আর কারা নয়।

বিশু সকলকেই চেনে। তার আলাপ সকলের সঙ্গে। সব সাহিত্যিক তার হাতের মুঠোয়। এর সঙ্গে কথা বলে, ওর সঙ্গে রসিকতা করে।

কাউকে বলে—এই যে এসে গেছেন দেখছি—

আবার কাউকে বলে—কোন্ কামরায় ছিলেন ? হাওড়ায় আপনাকে খুঁজলুম···

প্ল্যাটফরমে নেমে অবিনাশ ঘোষাল, বিশু আর আমি পাশাপাশি চলেছি। আমি কেবল খুঁজছি কোথায় বিভূতিবাবু। সেই চেনা মুখখানা খুঁজছি সকলের চেহারার মধ্যে। কোথাও তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ বিশু কাকে দেখে বলে উঠলো—এই যে বিভূতিবাবু—

তারপর পায়ের দিকে চেয়ে বললে—এ কি, আপনি হলেন সভাপতি আজ, আর আপনার জুতোয় কিনা তালি···আপনি দেখছি···

বিভূতিবাবু! বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়! আমি যেন সামনে তখন ভূত দেখছি।

বিশু বললে—এই একে চেনেন—

বিভূতিবাবু আমার দিকে চাইলেন এবার।

বিশু বললে—চিনতে পারছেন না? এর নাম বিমল মিত্তির, আপনার ভাতের হোটেলে গিয়ে নাকি খেয়ে এসেছে—

—ভাতের হোটেল! আমার ভাতের হোটেল?

বিভূতিবাবু আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন যেন।

আমি হঠাৎ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

বললাম—আমাকে ক্ষমা করুন আপনি—

বিভূতিবাবু বললেন—কেন হে, ক্ষমা করতে যাবো কেন তোমাকে মিছিমিছি—কী করেছ তুমি?

তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম সব।

বিভূতিবাবু হো হো করে হাসতে লাগলেন।

বললেন—ও, তাই বলো, আমাদের অম্বিকা, অম্বিকা একটা হোটেল করেছিল বটে রাণাঘাটে, ওর হোটেলটা নিয়েই লিখেছিলুম আমার 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'—নিজের বইখানাই ওকে পড়তে দিয়েছিলাম মনে পড়ছে—তা আমায় তো সে কিছু বলে নি!

বলে বিভূতিবাবু আবার প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগলেন। আর সেই হাসির মধ্যেই আমি যেন দেখতে পেলাম অপুকে—দেখতে পেলাম হাজারী ঠাকুরকে, দেখতে পেলাম এ-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিককে!

গৌতম বুদ্ধ—রবীন্দ্রনাথ—মহাত্মা গান্ধী

১৯৬০ সালে রবীন্দ্রনাথ-জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে "গৌতম বুদ্ধ-রবীন্দ্রনাথ-মহাত্মা গান্ধী" প্রবন্ধটি লিখিত হয়। চেতলার "রাখী সংঘ" যে "রাখী উৎসব ও রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা" ১৩৬৩ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশ করেন তাতেই প্রথম "রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা"—এ শিরোনামায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর যে শুভক্ষণে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তখন পশ্চিমের নতুন যন্ত্রসভ্যতা ভারতবর্ষে তার আসন পেতে বসেছে। বিমল মিত্র এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের জন্মসময়ের বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের ধর্মনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক জীবন-যাত্রার ইতিহাস ও আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষে যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়, সেই ইতিহাসের পটভূমিকাই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়। উক্ত হয় যে "পৃথিবীর সমস্ত লোক যে এখনও অসৎ হয়ে যায় নি, তার সমস্ত কৃতিত্ব ভলতেয়ারের রচনাবলী।" রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আর তাছাড়া একথাও বলা যায় যে,···The life and principles of so great a man are a study. If history has any interest or value, it is to show the influence of such a man on his own age and the ages which have succeeded,—to point out his contribution to civilization." ইংরেজীতে যাকে আমরা Conventional essay বলি এ-প্রবন্ধটিও তাই। বিমলবাবু যে তথ্যবহুল প্রবন্ধ রচনায়ও নিপুণ তারই নমুনাস্বরূপ এ প্রবন্ধটিকে সংকলনভুক্ত করা হলো।

* * * *

"He stopped at the thresholds of the huts of the thousands of dispossessed, dressed like one of their own. He spoke to them in their own language. Here was living truth at last, and not only quotations from books. For this reason the Mahatma. the name given to him by the people of India. is his real

name. Who else has felt like him that all Indians are his own flesh and blood?...When his love came to the door of India, that door was opened wide. At Gandhi's call India blossomed forth to new greatness, just as once before in earlier times, when Buddha proclaimed the truth of fellow-feeling and compassion among all living creatures."—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজকের দিনে, যখন রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী দু'জনেই বিগত, তখন এই কথাগুলো স্মরন করা ভালো। ইতিহাসের দৃষ্টিতে দু'জনেই মহাত্মা। রবীন্দ্রনাথ নিজে মহাত্মা না হলে মহাত্মাজী সম্বন্ধেও ওপরের এই কথাগুলো তিনি বলতে পারতেন না। গৌতম বুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের তিনটি সত্তা। এই তিন সত্তার সমন্বয়ই ভারতবর্ষের আত্মিক গৌরবের মূল কথা।

গৌতম বুদ্ধ বা মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে বলার অবকাশ অন্যত্র হবে। আজ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে ভারতবর্ষের সেই সময়কার অবস্থাও জানা দরকার যখন তিনি প্রথম জন্মেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে-যুগে তাঁর আবির্ভাব তখন পশ্চিমের নূতন যন্ত্র-সভ্যতা ভারতবর্ষে তার পাকা আসন পেতে বসেছে। ভারতবর্ষের সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামে তখন পশ্চিমী সাদা-চামড়ার মানুষদের দেখা যাচ্ছে। কিপলিং সাহেব যতই বলুন যে পূবে আর পশ্চিমে কোন দিন মিলন হবে না, কিন্তু সেই মিলনকে আর ঠেকিয়ে রাখা কারও সাধ্য ছিল না তখন। যে-রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী ভাষার সঙ্গে ভাল পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও অত ভাল ইংরেজী আয়ত্ত করেছিলেন, সেই তিনিই প্রমাণ দিলেন যে পশ্চিমের সঙ্গে পূব-দেশের মিলন তখন কত সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। না-হবার কারণও বুঝি ছিল না। এর কারণ খুঁজতে গেলে ইতিহাসের দিকে নজর দিতে হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম যে আন্দোলনের শুরু হয়, ধর্ম-আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই তার সূত্রপাত। পশ্চিম যখন প্রথম ভারতবর্ষে এল তখন এখানে সাতশো বছর ধরে মুসলমান রাজত্ব চলছে। দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত এই সমস্তটুকু ইন্দো-গ্যাঞ্জেটিক ভূমিখণ্ডে হিন্দুত্বের তখন অধঃপতনের যুগ। মুসলমান শাসক-সম্প্রদায় হিন্দুদের পুতুল-উপাসক বলে অবজ্ঞা করে। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজ যখন উত্তর ভারতবর্ষে তার আধিপত্য বিস্তার করলো, তখন বিরাট এক বিপ্লবের সূচনা হলো এখানে। সাতশো বছর পরে সেই প্রথম হিন্দুধর্ম ইসলামধর্মের সমানাধিকারের গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সামর্থ্য অর্জন করতে পারলো।

কিন্তু ইংরেজ বণিক একা আসে নি। ইংরেজের ভাষা, ইংরেজের সাহিত্য-সংস্কৃতি আর সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছেছিল ইংরেজ মিশনারীরাও। তাদের প্রচার তাদের ধর্ম-আন্দোলন হিন্দু-ধর্মকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিয়ে গেল।

মিশনারিদের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আর এক নতুন প্রতি-আন্দোলনের নেতা আবির্ভূত হলেন। তিনি রামমোহন রায়।

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) আসলে ছিলেন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্রাহ্মণ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরি করতেন। চাকরিতে বেশ উন্নতিও করেছিলেন। ইংরেজদের সংশ্রবে এসে পশ্চিমের চিন্তার জগতে যে নবজাগরণের সাড়া পড়েছিল তিনি তারও খবর পেয়েছিলেন। তিনি দেখলেন ভারতবর্ষে মুসলমান শাসকের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয়ের করাল ছায়া নেমে এসেছে। বাংলা দেশে, যেখানে এককালে বৈষ্ণব-ধর্মের পীঠস্থান ছিল, তান্ত্রিক আর নেড়ানেড়িদের আবির্ভাবে অনাচার আর কুসংস্কার সমাজের মর্মমূলে গিয়ে অধিষ্ঠান করেছে। খৃষ্টধর্মের যে-বাণী মিশনারিরা প্রচার করতো, রামমোহন তার মধ্যেও সত্যের সন্ধান করতে লাগলেন। তিনি হিব্রু আর গ্রীক ভাষা পড়তে লাগলেন খৃষ্টধর্মকে আরো ভালো করে অধিগত

করবার জন্যে। কিন্তু সব পড়ার পর তিনি যীশুখ্রীষ্টকে ত্যাগ করলেন। ত্যাগ করলেন বটে, কিন্তু বুঝলেন যে পশ্চিমের চিন্তার মধ্যে মানুষকে জানবার যে নতুন পদ্ধতি রয়েছে, তার মধ্যে সত্য নিহিত আছে। তা তিনি গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না। তখন তিনি নতুন বই লিখলেন—"The precepts of Jesus", "The guide to Peace and Happiness."

এই সময়েই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা হলো।

হিন্দু-ধর্মকে নতুনভাবে সংস্কার করেই ব্রাহ্ম-সমাজের সৃষ্টি। অন্যভাবে বলতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর পশ্চিমের নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় করেই এই ব্রাহ্ম-সমাজের সূত্রপাত।

অর্থাৎ ১৮২০ সাল থেকেই বলতে গেলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের এই রাখী-বন্ধন শুরু হলো পাকাপাকিভাবে। এর পর থেকে মিশনারিদের কূট-প্রচারে আর কোনও ফল ফললো না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে ধর্মান্তর-গ্রহণের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। ব্রাহ্ম-সমাজ সকলের জন্যেই তার দরজা খুলে রাখলো। রামমোহন সম্বন্ধে তাই বলা হয়েছে যে—He embodies the new spirit, its freedom of enquiry, its thirst for science, its large human sympathy, its pure and sifted ethics along with its reverent but not uncritical regard for the past and prudent disinclination towards revolt."

এর পর আর এক দিক থেকে আন্দোলনে ইন্ধন যোগানো হলো। ১৮৩৫ সালে ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট ভারতবাসীদের ইংরেজী সাহিত্য আর ইংরেজী বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সাব্যস্ত করলেন। লর্ড মেকলে এবং অন্যান্য অনেকেরই মনোগত ইচ্ছে ছিল যে ইংরেজী শিক্ষা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম লোপ পাবে আর সবাই দলে দলে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করবে। মিশনারিদেরও সেই মত ছিল; তারাও সবাই স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে লাগলো। সেইসব

স্কুল কলেজে বাইবেল পড়া ছিল কম্‌পালসারি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, খৃষ্টধর্ম কেউ তো গ্রহণ করলোই না। উপরন্তু হিন্দুধর্মের ভিত আরো মজবুত হয়ে গেলো সেই ইংরেজী শিক্ষায়।

ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের অনেক শাখা-প্রশাখা থাকলেও, আসলে সকলেরই মূল ভিত্তি ছিল বেদান্ত। ব্রহ্ম-সূত্র, উপনিষদ আর গীতা, এই তিনের ওপর ভিত্তি করেই বেদান্তের শিক্ষা। আচার্য শঙ্কর এই বেদান্তকেই ব্যাখ্যা করে টীকা লিখেছিলেন অষ্টম শতাব্দীতে। রামমোহন রায় বেদান্ত-ভিত্তিক উপনিষদকেই তাঁর বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন নতুন ধর্মমত প্রচার করার সময়ে। আসলে ভারতবর্ষের পক্ষে তখন নতুন কোনও সম্প্রদায়ের প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল না। প্রয়োজন ছিল এমন একটা ধর্মমতের যা আপামর জনসাধারণ নির্ভয়ে গ্রহণ করতে পারবে। পাঞ্জাবের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সেই সমস্যার সমাধান করলেন। তিনি দেখলেন মুসলমানদের কোরাণ আছে, খ্রীষ্টানদের বাইবেল আছে। তাই হিন্দুদের জন্যে তিনি এক গ্রন্থ লিখলেন 'সত্যার্থপ্রকাশ'। তিনি এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। নাম দিলেন আর্য-সমাজ। কিন্তু যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টান আর ইসলাম-ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মকে আত্মরক্ষা করতে শেখানো—সেই হেতু পাঞ্জাবের বাইরে এই আন্দোলনের কোন অস্তিত্বই স্বীকৃত হলো না।

একদিকে রামমোহন রায়ের নতুন ধর্মমত আর একদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার—আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ধর্ম আন্দোলনের তরঙ্গ, এই সব কিছু মিলেই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করেছে। ঠিক এই সময়ে পৃথিবীতে থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রবর্তন হয়। আমেরিকা এবং রাশিয়ায় এর পত্তন হয় আগেই। ভারতবর্ষেও এর প্রবর্তন করেন মিসেস এ্যানি বেশান্ত। এ্যানি বেশান্তও তাঁর প্রচারের মূল ভিত্তি করেছিলেন বেদান্তকে।

তারপরে আসেন স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা আর ইংলণ্ডে থাকার সময় এই হিন্দুধর্মকেই নতুন করে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। তিনিও ছিলেন বেদান্তের প্রচারক। তিনি বলতেন—যে ধর্ম বিধবার চোখের জল মোছাতে পারে না, কিম্বা ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন যোগাতে পারে না, সে ধর্মকে আমি বিশ্বাস করি না।

একবার স্বামীজীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—"What do you consider to be the function of your movement as regards India ?"

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—To find the common basis of Hinduism and to awaken the national consciousness to them."

ভারতবর্ষের সমাজে জাতিভেদ, যৌথ-পরিবার আর উত্তরাধিকার—এই তিনটেই হলো মূল প্রসঙ্গ। এই তিনটি প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িত হয়েই অন্যান্য ছোটখাটো প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আসলে এর সঙ্গে ধর্মের কোন সংশ্রব নেই। আছে আইনের সংশ্রব। কিন্তু হিন্দু-আইন অনড় অটল। প্রয়োজনের তাগিদে যে আইনের সৃষ্টি হয়, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সে-আইন রদ্ হওয়াও দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয় নি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন—"Beginning from Buddha down to Ram Mohon Roy, everyboby made the mistake of holding caste as a religious institution. But in spite of all the ravings of the priests, caste is simply a crystallised social institution, which after doing its service is now filling the atmosphere of India with stench."

যুগে যুগে হিন্দু-সমাজের এই আইন বদলাবার অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মুসলমান রাজত্বে দেশে কোনও আইন-সভা না থাকাতে সে-চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। যা কিছু চেষ্টা তা সবই সাময়িক কিম্বা স্থানীয়। তাতে বৃহৎ হিন্দুসমাজে কোনও দাগই.

কাটে নি। এবং দাগ কাটে নি বলেই সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সমাজের একতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এবং তার ফলেই ইংরেজ বণিকের কাছে অতি সহজেই পরাধীনতা স্বীকার করেছে ভারতবর্ষ।

'বেগম মেরী বিশ্বাস' উপন্যাসে আমি এই তত্ত্বটিই আবিষ্কার করতে চেয়েছি।

আসলে রবীন্দ্রনাথ যখন ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন এই-ই ছিল তার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। এই ভূমিকার ওপরই রবীন্দ্র-সাহিত্য তার রস আহরণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুঝতে গেলে ভারতবর্ষের তৎকালীন এই সামাজিক, ধর্মনৈতিক আর রাজনীতিক অবস্থার কথাও বোঝা দরকার। তাঁর জন্মের মাত্র চার বছর আগে সিপাহী-বিপ্লব ঘটে গেছে। সে-ব্যর্থতা তখনও সজাগ। ভারতীয় সৈন্য আর ভারতীয় টাকা খরচ করে ইংরেজরা ১১১টি যুদ্ধে সমস্ত ভারতবর্ষকে করায়ত্ত করেছে। সমস্ত দেশময় রেল লাইন খুলেছে, কারখানা করেছে, স্কুল করেছে। সতীদাহ বন্ধ করেছে। আরো অনেক কিছু করেছে। সবই করেছে। কিন্তু তখনও যেন অনেক কিছু করার বাকি ছিল। যে-টুকু বাকি ছিল তা পূরণ হলো রবীন্দ্র-আবির্ভাবে। তাই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকে সেই যুগের সমস্ত কিছু উন্নয়নের সমন্বয় বলা চলে। একলা রবীন্দ্রনাথকে বুঝলে ভারতবর্ষের উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র যুগকেই বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের আট বছর পরে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম। আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধের জন্ম তারিখ থেকে শুরু করে ১৮৬৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম তারিখ পর্যন্ত যে পতন-অভ্যুদয়ের ইতিহাস, তার সমস্তটুকু, রবীন্দ্রসাহিত্যে বিধৃত হয়েছে। শুধু বিধৃত নয়, সমগ্র আগামী ইতিহাসকে সঞ্জীবিত করার পক্ষেও তা উপযুক্ত সাহিত্য। ভলতেয়ার সম্বন্ধে ফ্রান্সে যা লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কেও তাই

বলা যায়। ভারতবর্ষের এই সার্বিক দুর্দশার দিনে আমরা যে আজো সবাই মিথ্যাবাদী, চোর, অত্যাচারী স্বার্থসর্বস্ব হয়ে যাই নি, আজো যে আমাদের মধ্যে কদাচিৎ দু'একজন সৎ সত্যবাদী নিঃস্বার্থ মানুষের সাক্ষাৎ পাই তার জন্যে প্রধানতঃ দায়ী গৌতম বুদ্ধের সাধনা মহাত্মা গান্ধীর জীবন আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য।

রবীন্দ্রসাহিত্য অনুধাবনের পক্ষে এই ভূমিকা তাই অপরিহার্য।

শনি রাজা রাহু মন্ত্রী

"শনি রাজা রাহু মন্ত্রী" শীর্ষক গল্প সংকলনটির প্রকাশকাল ১৯৬০। এই সংকলনের ভূমিকা হিসাবেই আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই ভূমিকায় ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র গল্প লেখার কলাকৌশল, গঠনপ্রকৃতি ও পাঠকের কাছে গল্প বলার ভঙ্গিমা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আধুনিক-কালে কোনও লেখকই পাঠককে গল্প শোনাতে গিয়ে বিমলবাবুর মত কৃতকার্য হন নি। বিমল মিত্রের গল্প বলার ভঙ্গি নিজস্ব—বিদেশ থেকে ধার করা নয়। সেই ভঙ্গিকে অনুকরণ করে অনেকেই গল্প লেখার চেষ্টা করেছেন ও করছেন কিন্তু কেউ-ই সেই স্টাইলটিকে নিজের করে নিতে পারেন নি। পারলে ভালো হতো—বাঙলা সাহিত্য আরও সমৃদ্ধতর হতো। বিমল মিত্রের কাছে পাঠকদের চিঠিপত্র আসে প্রচুর। তাতে তিরস্কারও যেমন থাকে, তেমনি থাকে স্তুতিও। কিন্তু সেই তিরস্কার ও স্তুতি—সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে কেমন করে তিনি নিজেকে নির্বিকার রাখেন তারই নমুনা এটি। কত রকম ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করার চেষ্টা হয়, তারও নিদর্শন পাওয়া যাবে এতে। প্রসঙ্গত: চার্লস ল্যামের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। টমাস কার্লাইল চার্লস ল্যামের নাম শুনলেই চটে যেতেন আর অশালীন ভাষায় গালাগালি দিয়ে বলতেন—"A more pitiful, rickety, gasping, staggering stammering tomfool I do not know. He is witty by denying truisms and abjuring good manners," কিন্তু হ্যাজলিট প্রমুখ অন্যান্য লেখক ও চিন্তাবিদ্‌রা ল্যাম সম্পর্কে অন্যরূপ ধারণা পোষণ করতেন, বলতেন—"The most delightful, the most provoking, the most witty and sensible of men, No one ever stammered out such fine, piquant, deep, eloquent things in half a dozen half sentences as he does. His jests scald like tears; and he proves a question with a play upon words." বিমল মিত্র সম্পর্কেও তিরস্কার ও স্তুতি প্রায় একই রকমের।

* * * *

গল্প লেখার কলা-কৌশল সম্বন্ধে ভূমিকা লেখবার রীতি আজও দেখেছি প্রচলিত আছে, কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা যে ফুরিয়ে

গিয়েছে, আশা করি সে-সম্বন্ধে কারো দ্বিমত নেই। যেমন গান। এই দুই ক্ষেত্রেই আক্ষরিক জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানেরই বেশি প্রয়োজন। সব শিল্পেরই দু'টো দিক। একটা তার বাইরের দিক। সেখানে ব্যাকরণের কড়াকড়ির ভারি শাসন। তা নিয়ে বৈয়াকরণদের মধ্যে নানা বিরোধ। আর একটা দিক হলো অন্তরের। সেটা রসের দিকও বটে। এই রসের দিকটা নিয়েই যুগে যুগে যত তর্কের জঞ্জাল জমা হয়ে উঠেছে। যাঁরা প্রকৃত রসিক তাঁরা এই জঞ্জালকে এড়িয়ে রসের ঠিক কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পৌঁছোবার সহজাত বিদ্যেটি আয়ত্ত করে ফেলেছেন। তাঁদের নিয়ে বিশেষ অসুবিধে নেই। তাঁরা রস চান. এবং রস পেয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। বিরুদ্ধবাদীদের চিৎকারে তাঁদের রসিক-চিত্ত চঞ্চলও হয় না, লুব্ধও হয় না। কিন্তু সকলেই যে এই সহজাত বিদ্যেটিকে আয়ত্তে আনতে পারবে, এমন ঘটনা যদি ঘটতো তাহলে রসদাতা ও রসগ্রহীতা দু'জনের পক্ষেই জিনিসটি সহজ হয়ে যেত। কিন্তু তা হয় না। হয় না বলেই মাঝে মাঝে ভূমিকার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

রস সংজ্ঞাটি ব্যাপক। কীসে রসসৃষ্টি হয় আর কিসে হয় না, শাস্ত্রে তার সুনির্দিষ্ট বিধানও আছে। কিন্তু রসিক-চিত্ত তো বিধানের অধীন নয়। সে বলবে, তুমি বিধান মেনেছ হয়তো, কিংবা হয়তো বিধান মানো নি, কিন্তু আমি শাস্ত্রও জানি না, বিধানও জানি না, আমি জানি কেবল আমার রসনাকে। আমি তৃপ্তি পাই নি, এইটেই বড় কথা। তুমি রন্ধন-শাস্ত্রানুযায়ী কোন্ মশলা সহযোগে কোন্ ব্যঞ্জন তৈরি করেছ তাও আমি জানতে চাই না। আমি শুধু জানি যে আমার রসনার পরিতৃপ্তি হলো না। এমনি করেই তর্ক বাড়ে, জঞ্জাল জমে আর রসিক-চিত্ত তার এলাকা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এমনি করেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শিল্পীকে ধ্রুব রসিক-চিত্তের ভরসায় প্রতীক্ষা করতে হয়।

গানের কথাটাই ধরা যাক। রামপ্রসাদী গান একদা হালিশহর থেকে হাইলাকান্দি পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তেমনি ধ্রুপদ

গানও প্রসার লাভ করেছিল দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত। সংবাদ-পত্রহীন, টেলিফোনহীন, এবং বিজ্ঞানের সমস্ত আধুনিক উপকরণহীন সেই যুগের এ-ঘটনা যদি কারো বিস্ময়কর লাগে তো বোঝা যাবে যে তিনি রসিক পদবাচ্য নন। আসলে রসের গরজ বড় গরজ। সে দূরকে কাছের করে, পরকে আপন। সে দেশভেদ মানে না, সে জাতিভেদ মানে না। রসের গরজে মুসলমান বৈষ্ণব হয়, ব্রাহ্মণ ফকির। যে রস এত ব্যাপক, তা কি এত সুলভ হতে পারে? বিশ্বের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরনা দিয়েও এ-রসের ডিগ্রী পাওয়া যায় না।

যে খায়-দায় কাঁসি বাজায়, তাকে বলে অকর্মা। আবার যে খায়-দায় বাঁশি বাজায়, তাকেও লোকে বলে অকর্মা। সুতরাং কাঁসি হোক আর বাঁশিই হোক দুটোই অকাজের। অর্থাৎ তেল-নুন-মশলার সংসারে সে-মানুষের কোনও দামই নেই। কিন্তু রসের বিচার আলাদা। রসিক পাঠকরা সেই অকাজের লোকটাকেই আগে ভাগে কখন বেসরকারী ডিগ্রী দিয়ে বসে, আর সরকারী ডিগ্রীধারীরা তখন 'গেল' 'গেল' বলে হৈ-হৈ করে চিৎকার জুড়ে দেয়। আমার জীবনে এমন দুর্ঘটনা অনেকবারই ঘটলো। এখন তা পুরোনো হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি কখনও বিচলিত হই নি, এখনও হই না।

কিন্তু এবার অন্য ধরনের হৈ-হৈ।

আমি ধ্রুপদ গাইতাম। তাঁরা বাহবা দিয়েছেন। এবার হঠাৎ রামপ্রসাদী গেয়েছি। সরকারী ডিগ্রীধারীরা হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছেন। সচেতন হবার কারণ না-ঘটলেও হয়েছেন। ধ্রুপদ গাইছো গাও, আবার রামপ্রসাদী কেন?

ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলি।

গত বছরের 'দেশ' পত্রিকায় একটি বিশেষ সংখ্যায় আমার একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। নাম দিয়েছিলাম 'আমেরিকা'। গল্পের নাম দেওয়া একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু রামপ্রসাদী যে ধ্রুপদ নয়, এই সহজ সত্যটা চোখে আঙুল দিয়ে উল্লেখ করার জন্যেই এই

নামকরণ করেছিলাম। আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল সঙ্গে। সেটা একেবারে নিজস্ব ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য। প্রত্যেক লেখক তার রচনার মধ্যে দিয়ে যে-রসের পরিবেশন করে, বাহ্যতঃ তা অপরকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও, লক্ষ্য থাকে তার পরাৎপর। অর্থাৎ যে জগৎটা নিয়ে লেখক তার রচনায় নিবিষ্ট থাকে, সেটা তার পারিপার্শ্বিক জগৎ হলেও—সে জগতের মুখ্য নায়ক সে নিজেই। লেখকের সেই নিজস্ব জগতের একমাত্র নায়ক সেই লেখকই। নিজেকে নানার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেই লেখক আত্মপ্রকাশের পথটি খোঁজে। কখনও সে নারী, কখনও নর। কখনও সে দেশ, কখনও ইতিহাস। আবার কখনও সে ব্যক্তি, কখনও সে তত্ত্ব। লেখক একাধারে অনেক শক্তির বিরুদ্ধতার মধ্যে দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করে। নিজেকে পরীক্ষা করে, আবার নিজেকে আস্বাদও করে। নিজেকে আস্বাদ করেও নিজেকে প্রকাশ করা যায়। আত্ম-আস্বাদের এই বিভিন্ন প্রকাশে বিভিন্ন পাঠক বিভিন্ন আনন্দ পায়। রসিকচিত্তও সেই সঙ্গে নিজেকে নানাভাবে আস্বাদ করার বিচিত্র তৃপ্তি অনুভব করে। সেই প্রকাশের পথটি যদি একরকম হয় তাহলে আর তাতে বৈচিত্র্য থাকে না। তা যদি হতো তাহলে সেই এক আর বহু হবার বাসনায় এই জগতেরও সৃষ্টি করতেন না। সৃষ্টির প্রথম যুগেও যেমন, আজ এতদিন পরেও তেমনি। আজও সে-নিয়মের আর ব্যতিক্রম হয় নি। ভোরবেলায় পুব দিকের আকাশে যে-সূর্যের উদয় হলো, তাকে আবার পশ্চিম দিগন্তে ডুবিয়ে দিয়ে দেখি কেমন দেখায় তাকে। বৈচিত্র্য আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর। আবার ঐক্য আছে বলেই তো বৈচিত্র্যের মধ্যেও এত সৌন্দর্য। ধ্রুপদ ভালো বলেই তো রামপ্রসাদীর এত আদর। আবার রামপ্রসাদীর আদর আছে বলেই তো ধ্রুপদ আরো আদরণীয়। তাই আমারও একদিন পৃথিবীর কাছে নিজেকে আবার যাচাই করে নেবার দরকার হলো নতুন করে। এক দীর্ঘস্থায়ী এবং কঠিন অসুস্থতার অবসরে নিজের দিকে যখন ফিরলাম, যখন কাছের দিকে চোখ ফেরালাম,

দেখি আমার ধ্রুপদ গানের শ্রোতারা তখন একটু বিশ্রাম নিয়েছেন। মনে মনে ভাবলাম—এই আমার পালা বদলের অবসর।

মালা-বদলের রীতি হিন্দুর বিবাহ-অনুষ্ঠানে যেমন একটা অপরিহার্য অঙ্গ, শিল্পের অনুষ্ঠানে পালা-বদলও ঠিক তাই। নিজেকে নতুন করে পাবো বলেই তো প্রকৃতিতে ঋতু-বদলের রীতি আছে। এই ঋতু-বদলের সময়েই অত্যন্ত অনিবার্যভাবে জীব-জগতে ছোট-খাটো বিপর্যয় ঘটে থাকে। কিন্তু পালা-বদলে সে-বিপর্যয়টা ঘটে অন্তর্জগতে। যাঁরা সচেতন পাঠক তাঁরা সচেতনতর হন, আর যাঁরা নির্জীব তারা হন বিরক্ত। তাই দেখা যায় ঋতু-বদলের সময় নির্জীবরা দিনরাত গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে ঋতুবদলের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করে থাকেন। পালা-বদলের ব্যাপারেও এইটেই নিয়ম।

এই রকম এক সচেতন পাঠক একটি পত্র লেখেন 'দেশ' সম্পাদকের কাছে। পত্রটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করা ভাল।

তারিখ ১৯-১০-৬০

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা

আপনাদের দেশ পত্রিকার শারদীয়া সংকলনে বিমল মিত্র-এর লেখা 'আমেরিকা' শীর্ষক গল্পটির জন্য লেখককে আপনার মারফত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যখন বাংলাদেশের সাহিত্যিকেরা একশ্রেণীর সিনেমা-উপযোগী গল্পের প্লট তৈরীতে ব্যস্ত তখন তাঁর মনের কারখানায় এই গল্পটি এক নতুন আবিষ্কার। স্বাধীনতার দীর্ঘ তোরণগুলি যখন একে একে কোন আশা বহন না করে অপসৃয়মাণ তখন সমাজের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বিমলবাবুর এই অবদানটুকু অত্যুৎকৃষ্ট এবং মনে রাখবার মত। এত সুন্দর সাবলীল অথচ রচনাশৈলীর ভঙ্গিমাটুকু অন্যান্যবারের মতই লেখকের স্বকীয়। উৎসাহী পাঠক হিসেবে এ-সংকলন আমার কাছে আরও

দামী কারণ উপযুক্ত পরিবেশে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ এ রচনা প্রকাশে সাহায্য করে আমাদের মত এক পাঠক-সমাজের কাছে দৃষ্টান্তের অকুস্থল হিসেবে পরিচিত হলেন। হয়ত সবাই বিশেষ একটা অবস্থার চাপে পড়ে জানা কথাটুকু বলতে চায় না, তবুও কেউ আত্ম-প্রত্যয়ের উর্ধ্বে উঠে দেখিয়ে দিলে সবাই নতুন করে জানে। তাই অন্ততঃ আমার তরফ থেকে প্রবীণ লেখকের কাছে সশ্রদ্ধ প্রণাম পৌঁছে দেবার ভার আপনাকে দিলাম। ইতি—

জনৈক পাঠক

মালা-বদলের সঙ্গে সঙ্গেই নববধূ যদি হঠাৎ বেআব্রু হয়ে পড়ে তো লোকসমাজে তাকে বলে বেহায়া। আবার ঋতু-বদলের সঙ্গে সঙ্গেই যদি কেউ যথেচ্ছ হয়ে বিহার করে তো লোকে তাকে বলে বেপরোয়া। সেই রকম শিল্পের ক্ষেত্রে পালা-বদলের সঙ্গে সঙ্গেই যদি হাততালি পড়ে তো তখন যে পালাগায়কেরই সন্দিগ্ধ হবার পালা, তা হয়তো সকলেই স্বীকার করবেন। অতি-স্তুতি তো নিন্দারই নামান্তর। আর স্তুতি জিনিসটার আবার নিজস্ব একটা মাদকতাও আছে, যা সব সময়েই ক্ষতিকর। কারণ স্তুতিতে বিঘ্ন বিনাশ না ঘটিয়ে বিঘ্ন-উৎপাদনের বিড়ম্বনার নজির সাহিত্য-ক্ষেত্রে তো অপ্রচুর নয়। সাহিত্যে নির্জন-চিন্তার ফল। আমি আবার শুধু নির্জন নই, সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্গও বটে। এই পত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই নিঃসঙ্গতার সংসারে হঠাৎ যেন একটা বিপর্যয় বটে গেল। আর পত্রও তো একটা নয়। অসংখ্য। আমার মত আলস্যপ্রবণ লোকের পক্ষে পত্রপ্রাপ্তি শুধু বিপর্যয়-সূচক নয়, বিভ্রান্তিকরও বটে। সুদূর ও নিকটের বহু পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে পত্র-যোগ রক্ষা করতে যাঁরা পটু, তাঁদের পক্ষে যা সুখকর, আমার পক্ষে তা কষ্টদায়ক। প্রশংসা ও নিন্দা আমার লোক-জীবনে বহু পাওয়া গেছে। যতটুকু পাওয়ার যোগ্য নই, হয়তো তার অনেক বেশিই পাওয়া গেছে। আমার মত এত অযাচিত প্রশংসার সৌভাগ্য ও এত অকৃপণ নিন্দার দুর্ভোগ

বোধ করি বাঙলাদেশে আর কোনও লেখককেই বহন করতে হয় নি। কিন্তু এবার তো প্রশংসা নয়। মনে হলো এ যেন প্রীতি। আমি প্রীতির কাঙাল। হঠাৎ সেই প্রীতির স্পর্শ পেয়েই মনটা কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। মন বললে—এ বিশ্বাস কোর না। এতে ভেজাল আছে। খুব সাবধান!

এর পর যত পত্র আসে, সন্দিগ্ধতা তত তীব্র হয়। যখন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছি, তখন আর একটি পত্র এল। সন্দেহ দৃঢ়তর হলো। এ পত্রটিও সম্পূর্ণ উদ্ধার করা ভাল।

13-1 Palm Avenue.
Calcutta.19
22.10.60.

নমস্কার নিবেদন,

আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি কখনো। এবার শারদীয় সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় এই মাত্র আপনার লেখা 'আমেরিকা' গল্পটি পড়লাম। অনেকদিন থেকেই মাসিক পত্রিকার গল্প উপন্যাস পড়া হয়ে ওঠে না। নানা কারণেই ভালোও লাগে না। আজ বহুদিন পরে আপনার গল্পটি অল্পবয়সের মত চোখের জল ফেলিয়েছে। প্রতিদিনের দেখা ও জানা ঘটনার পুনঃস্মরণ মনের অসাড়তা কাটাবার ঔষধ। এই হতভাগ্য গলিত মুমূর্ষু দেশে লেখকের বড় দরকার। এই পরাজিত জীবননাট্যের দর্শক হিসাবেই শুধু নয়, যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিয়ে আপনারা আরো সামনে এগিয়ে আসুন। এই আমাদের প্রার্থনা, আকাঙ্ক্ষা ও আশীর্বাদ—বাংলাদেশের মেয়েদের পক্ষ থেকে তাই আজ বলি। ইতি—

মৈত্রেয়ী দেবী

ছোটবেলায় যখন সবে সা-রে-গা-মা শুরু করেছি, তখন বাহবা দেবার পালা ছিল বাড়ির লোকের, আর পাড়ার লোকের দেবার ছিল

ছুয়ো। বড় হয়ে হলো উল্টো। পরিচিত জনেরা নীরব রইলেন, অপরিচিত জনেরা দিতে লাগলেন হাততালি। বুঝলাম এইটেই রীতি। ঘরের লোকের ভালবাসা পেলে বাইরের লোকের অনাদর বাড়েই। ওতে দুঃখ করতে নেই। ঘরে-বাইরে আনুকূল্য যে ভয়াবহ তার ভূরি ভূরি উদাহরণও স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। পাঠকবর্গ যাকে প্রীতির আসন আগে ভাগে দিয়ে ফেলে, সরকারী ডিগ্রীধারীরা তাকে গ্রহণ করতেই কুণ্ঠাবোধ করে বেশি। কুণ্ঠা জিনিসটা ছোঁয়াচে রোগের মত। পাড়ায় একবার এক বাড়িতে শুরু হলে, সমস্ত পাড়াটারই আর তখন নিস্তার থাকে না। তারপর যা হয়, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় মহামারী রোগ-বীজাণু ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলে। তারা বলতে শুরু করে—ছোকরার সুরজ্ঞান আছে বটে, কিন্তু তালকানা। কিংবা বলে—ভদ্রলোকের তালজ্ঞানটা ভাল, কিন্তু গলার সুরের তেমন রেওয়াজ নেই। এমনি নানা টাল-বাহানা করে ক্ষমতাবানকে অক্ষম প্রমাণ করবার চেষ্টায় তাঁরা অমিতশক্তি। শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অনন্যোপায়ের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় তাকে ফেল করিয়ে তাঁদের নিজেদের মনের সাধ মেটান—যেটা তাঁদের হাতের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু জাতির বহু সৌভাগ্য যে সরকারী ভোটের জোরে মূল্যমানের বিচার হয় না, এমন বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এখনও দু-একটা আছে পৃথিবীতে। তারা ডিগ্রী দেয়, কিন্তু ডিগ্রীর ব্যবসা করে না। তারা শিল্পের বিচার করে, কিন্তু শিল্পীর বিড়ম্বনা ঘটায় না।

সমস্ত সাহিত্যিককেই দুটো দিক নিয়ে কাজ চালাতে হয়ঃ একটা তার সৃষ্টির দিক, আর একটা দিক বাজারের। সৃষ্টির কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ। সেটা তবু ঘরের অর্গল এঁটে নিরুপদ্রবে করা চলে। কিন্তু হাট? হাট জায়গাটা ভালোই, যদি না সেখানে হট্টগোল থাকতো। এই হাটে গেলেই যত ঝামেলা। সেখানে জীবিকা-জীবন-খ্যাতি-অখ্যাতির যে জটিল জটলা তা সকলের ধাতের পক্ষে আরামদায়কও নয়, অনুকূলও নয়। আমার পক্ষে তো নয়ই। কিন্তু

আমি হাটে উপস্থিত না হলেও, হট্টগোলটা তো কানে এসে পৌঁছোয় মাঝে মাঝে। আর তখনই রুচি-অরুচি নিন্দা-ধিক্কার আর কুৎসা-কটূক্তির একতরফা পালা শুরু হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"ঈর্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম। অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।"

এটা বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ নয়। এখনকার বঙ্গদেশ আর সেই বঙ্গদেশ নেই। তখন নিন্দা হতো, অপযশ হতো, অপ্রশংসার কঠোর শাসনব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। কিন্তু কুৎসা-কটূক্তি ছিল না—অন্ততঃ সাহিত্যের বিচারশালায় তো ছিলই না। কিন্তু সৎসাহিত্যিকের পক্ষে সে-সব গ্রাহ্যবস্তু নয়। ওতে বিচলিত হলে সাহিত্যকর্মে বিঘ্ন ঘটে। সাহিত্যিককে স্থিতধী হয়ে স্বীয় সৃষ্টির সাধনায় মগ্ন থাকতে হয়। সাহিত্যিকের সংসার নেই, আবার সংসার-বৈরাগ্যও নেই। সমস্ত থেকেও সাহিত্যিক সমস্ত কিছু থেকে সংস্রব-মুক্ত। সব কিছুতে যুক্ত থেকেও মুক্ত থাকার সাধনাতেই তার সিদ্ধি। জীবিত অবস্থায় তার খ্যাতি তো পেতেই নেই, পুরস্কারও পেতে নেই। পেলে খুব যে ক্ষতিকর তা নয়, কিন্তু না-পেলেও লোকসান নেই। কারণ জীবনের সমস্ত বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারী কাছারির আইন-কানুন প্রযোজ্য হলেও, সাহিত্যিক-যশ জিনিসটা এখনও তার এক্তিয়ারের বাইরে রয়ে গেছে। এবং আশার কথা চিরকালই তা থাকবে। সেখানে চৌকিদারদের লাঠির ভয় তো নেই-ই, দারোগাদের নিষ্ঠুর ভ্রূকুটিও বড় নিস্তেজ। চৌকিদার বা দারোগাকে একদিন একটা নির্দিষ্ট বয়সে অবসর গ্রহণ করতে হবেই, কিন্তু সাহিত্যিকের রিটায়ার করবার আইন এখনও চালু হয় নি। সরকারী পেন্‌সন্ ব্যবস্থায় কর্মচারীদের মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত সব প্রাপ্য সাব্যস্ত আছে—কিন্তু সাহিত্যিকের পেন্‌সন্ শুরু হয় মৃত্যুর পর থেকে। সাহিত্যিকের আর একটা সুবিধে এই যে তামাদির আইন আর সকলের বেলায় খাটলেও—তার বেলায় সেটা অচল।

কিন্তু হাটের কথা আর নয়। হাট জিনিসটাই অস্থায়ী। হাট প্রয়োজনের তাগিদে বসে আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই উঠে যায়। কিন্তু চিরকালের জিনিস যেটা, সেটা সত্য। সেই সত্যটা বড় অদ্ভুত পণ্য। লাল কুমড়ো এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর মত তার কিন্তু বিনাশ নেই। হাটের কেনা-বেচার চাহিদার টানা-পোড়েনের সঙ্গে সঙ্গে তার সত্য-মূল্য ওঠা-নামাও করে না। খদ্দেরের পছন্দ-অপছন্দের বালাই নিয়ে তার মাথাব্যথার দায় নেই। কেউ যদি কেনে তো ভালো, তাতে খদ্দেরেরই লাভ, না কিনলে সত্যবস্তুর নিজের কোন লোকসান নেই।

কিন্তু না, মনের এমনি যখন অবস্থা, তখন আর একটা চিঠি এল। মনটা আনন্দে ভরে গেল। এতগুলো প্রশংসা-পত্রের মধ্যে প্রথম নিন্দে। বড় শান্তি পেলাম। প্রশংসায় মনটা আবিল হয়ে উঠেছিল, নিন্দা পেয়ে সে-আবিলতা কেটে গেল। মন বললে—এতক্ষণে খাঁটি জিনিস পেলে, এতক্ষণে তোমার সোনা খাদ মিশিয়ে মজবুত হলো।

এ চিঠিটাও সম্পূর্ণ উদ্ধার করে দিলাম।

সবিনয় নিবেদন!

বাঙালী লেখকেরা পাঠকের মতামতের প্রতি কিরূপ অথবা আদৌ কোন গুরুত্ব আরোপ করেন কিনা জানি না। তাঁরা যাই করুন, তাঁদের রচনা সম্বন্ধে আমি আমার মতামতটা গায়ে পড়ে তাঁদের লিখে জানাতে সঙ্কোচের কোন কারণ দেখি না। অন্যপক্ষে সমালোচক হিসাবে যে আমার মতামতের বিশেষ কোনো মূল্য আছে এমনও মনে করি না।

আপনাকে পত্রাঘাতের অবসর এই প্রথম, তাই বলে উপলক্ষ্যটা আপনার রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় নয়। পরিচয় আছে কিন্তু সব রচনার সঙ্গে যে নয়—তা বলা বাহুল্য। যেটুকু পরিচয় আছে তারই উপর নির্ভর করে বলছি যে সম্প্রতি অর্থাৎ পূজাসংখ্যাগুলিতে

প্রকাশিত আপনার দুটি একটি রচনায় একটি নতুনতর লক্ষণ দেখে চকিত হয়েছি, তাই এই পত্রাঘাত।

লক্ষণটি সাংবাদিকতা। স্পষ্টতম প্রকাশ হয়েছে 'আমেরিকা' গল্পে (শারদীয় দেশ ; ১৩৬৭)। গুণীজনের হাতে সাংবাদিকতা সাহিত্য হয়ে ওঠে, সেটি সমর্থনীয়। কিন্তু সাহিত্য যদি সাংবাদিকতা হয়ে ওঠে তো শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ার কথা মনে আসে। সকলে এ মতে সায় দেবে না, কিন্তু আপনার ভক্ত পাঠক-পাঠিকারা অধিকাংশই দেবে, এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। দেবে, কারণ আপনার রচনার যে-সব গুণ অদ্যাবধি তাদের আকর্ষণ করেছে, সাংবাদিকতা তার অন্যতম ছিল না।

গল্পের নামেতেই প্রথমে হোঁচট খেলুম। আমেরিকা। কড়ি দিয়ে কিনলাম, শনি রাজা রাহু মন্ত্রী, সাহেব বিবি গোলাম—কি সব ইঙ্গিতময় নাম। তার পাশে 'আমেরিকা'। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসটির নাম 'ইষ্টার্ন রেলওয়ে' রাখলেই হত।

মূল গল্পটি বলা হয়েছে মিষ্টার রিচার্ডের জবানীতে। গল্পটির introduction-এর ভার 'আমি'র উপর। গল্প গল্পই। কাজেই 'আমি'র সঙ্গে বিমল মিত্রের কেউ সমীকরণ করবে না। কিন্তু একটা কথা। আপনার অনেক রচনাই উত্তম-পুরুষের জবানীতে লেখা। সেগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে 'আমি' বিশেষ একটি চেহারা নিয়েছে। সে শান্ত সচ্চরিত্র মধ্যবিত্ত বাঙালী-যুবক, পরোপকারী, পেশা কেরানীগিরি এবং বদলির চাকরি, নেশা গল্প-লেখা। যেখানে 'আমি' অনুপস্থিত সেখানেও অনেক সময়ে পাঠক 'আমি'র সঙ্গে নায়ককে অনেকখানি মিলিয়ে নিয়েছে। 'সাহেব বিবি গোলাম' ও 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' তার উদাহরণ। শারদীয় বেতার-জগৎ-এ প্রকাশিত 'স্ত্রী-জাতক' রচনাটিতে যে 'আমি' আছে তার সঙ্গে সব পাঠকই অন্তরঙ্গতা অনুভব করে, কিন্তু 'আমেরিকা'তে যে-'আমি' আছে তাকে আপনার পাঠকেরা চেনে না। সে এরোপ্লেনে চড়ে। পাঠক দ্বিতীয়বার হোঁচট খেল।

আপনি প্রধানত উত্তম পুরুষের জবানীতে (কোথাও কোথাও একটি বিশেষ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে) কাহিনী রচনা করেন। আধুনিক এই প্রকরণটির আপনি সার্থক প্রয়োগ করেছেন—বস্তুনিষ্ঠা পূর্বে কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে দেখি নি। 'শনি রাজা রাহু মন্ত্রী' (স্ত্রী)পড়তে পড়তে সন্দেহ হয় নি লেখকের উদ্দেশ্য জমিদারদের লাম্পট্যের নগ্ন প্রদর্শন, কিংবা 'স্ত্রী-জাতক' কাহিনীর কথক দরিদ্র কেরানী বলেই অভিজাত নায়িকার প্রসঙ্গে সুবিচার করতে পারে না, কিংবা দীপঙ্কর লক্ষ্মীকে অনুকূল আলোকে দেখাচ্ছে না। দুঃখের বিষয় 'আমেরিকা' গল্পে মিষ্টার রিচার্ড এমন সব উক্তি করেছেন যাতে objective reporter হিসেবে তিনি আমাদের আস্থা হারান। উদাহরণ—'বেঙ্গলীজ আর ফানি পিপল, ফরেনারদের তারা দেবতা মনে করে এখনও'। মেয়েমানুষের দালাল হোটেলে ধাওয়া করে, এমন ঘটনা বেইরুট পিকিং কোথাও ঘটতে পারে না—এই ইঙ্গিত। ম্যাকার্থির দেশ যে-দেশে কেউ কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী এই সন্দেহের জন্য অনেক দুর্ভোগ সহ্য করে, সে দেশের মানুষ যখন স্ট্রাইক করার জন্য কারও চাকরি গেছে শুনে আকাশ থেকে পড়ে তখন আমাদের অবাক লাগে। তারপর যখন চক্রবর্তীর ঘরের অবস্থা দেখে মিষ্টার রিচার্ড বলছে, পৃথিবীতে এরকম দৃশ্য যে থাকতে পারে তা আমেরিকানরা ভাবতেও পারে না—কল্পনা করতেও পারে না, তখন স্পষ্টই মনে হয় এ ভণ্ডামি। আমেরিকায় নিগ্রোরা কি ভাবে দিন কাটায় তা কি আমরা জানি না ?

উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে তর্ক না তুলেও বলা যায় (লেখকও এবিষয়ে সচেতন) বাঙালীর দুর্দশা মিষ্টার রিচার্ডের বর্ণনায় অতিকৃত হয়েছে। স্যাটায়ারিস্ট অথবা সংস্কারক নিজের রচনায় এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। আপনি কেন করেছেন ? করেছেন এইজন্যেই যে সাংবাদিকতার বিষয়-বস্তুকে আপনি treatment-এর গুণে সাহিত্য করতে চেয়েছেন। সফল হন নি। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছে। সাহিত্য-পাঠের ফলশ্রুতি জীবন্ত চরিত্রের

সান্নিধ্যলাভ। চক্রবর্তী তো কোনো জীবন্ত চরিত্র নয়। সরকারী নির্যাতন নীতির যারা বলি হয়েছে তাদের প্রতিনিধি মাত্র। মিষ্টার রিচার্ড তাকে সেইভাবেই দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। ওভাবে দেখানো তো সাংবাদিকের কর্ম। একটি মানুষের জীবনের আয়নায় অনেক মানুষের ছায়া ফেলা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক দুজনেরই কর্তব্য। কিন্তু সাহিত্যিকের প্রধান ভাবনা আয়নাটিকে ঝকঝকে আর সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার দিকে—তিনি জানেন আয়না ভালো হলে অনেকের ছায়া তাতে আপনিই এসে পড়বে। আর সাংবাদিকের প্রধান ভাবনা থাকে আয়নায় অনেক মানুষের ছায়া ঠিক ঠিক পড়লো কিনা। যেহেতু চক্রবর্তীর ব্যক্তিসত্তার চেয়ে প্রতিনিধিসত্তা পাঠকের কাছে বড় হয়ে উঠেছে, অতএব 'আমেরিকা' গল্পটিও সেই পরিমাণে সাহিত্য থেকে সাংবাদিকতা হয়ে গেছে। হতে পারে আমার সাহিত্যবিচার প্রমাদপূর্ণ কিন্তু আপনার লেখা মন দিয়ে পড়েছি এই স্বীকৃতিটুকু দাবি করি। ননস্কার জানবেন।

ইতি—

৪বি, আবদুল রসুল এ্যাভিনিউ (সেকেণ্ড ফ্লোর) সাত্যকি লাহিড়ী
কলিকাতা—৬ ১৪ ১০।৬০

এই পত্রটি প্রাপ্তির পর আমি যথা ঠিকানাতেই একটা উত্তর পাঠালাম। উত্তরটার অংশ-বিশেষ তুলে দিই—

"এ-গল্পের কতখানি সাংবাদিকতা আর কতখানি সাহিত্য—অর্থাৎ objective বা subjective, নায়কের প্রতিনিধি-সত্তাই বা কতখানি আর ব্যক্তিসত্তাই বা কতখানি—তা নিয়ে পাঠক-মহলে এখনও তর্ক-বিতর্ক চলছে। এই মুহূর্তে আমি নিজে ফতোয়া দিয়ে সে তর্কের নিরসন করতে চাই না। তবে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু উক্তি স্মরণীয় :

'আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুমফুল হইতে কেহবা তাহার রং বাহির করে, কেহবা তৈলের জন্য তাহার বীজ

বাহির করে, কেহবা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহবা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহবা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহবা নীতি, কেহবা বিষয়-জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন—আবার কেহবা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না।'

আমার এই গল্পটিতে যদি আপনি একটা নিটোল নিখুঁত গল্প পেয়ে থাকেন তাহলেই আমি কৃতার্থ, তাহলেই আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। ইতি।"

কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটলো এর পরেই। কয়েকদিন পরেই ডাকের অন্যান্য পত্রের সঙ্গে একটি অদ্ভুত পত্র এসে হাজির হলো। পড়লাম :

সবিনয় নিবেদন,

গত শনিবার, অর্থাৎ ২২শে অক্টোবর আপনার শ্রীযুক্ত সাত্যকি লাহিড়ীর নামে প্রেরিত চিঠিখানি আমাদের বাড়ি আসে। ঠিকানা—৪ বি, আবদুল রসুল এভেনিউ, কলিকাতা-২৬। একেবারে নির্ভুল ঠিকানা। এমন কি 2nd floor পর্যন্ত। তবে দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের বাড়িতে সাত্যকি লাহিড়ী নামে কোনও ভদ্রলোক থাকেন না। এমন কি আশে-পাশের কোনও বাড়িতে একঘরও লাহিড়ী আছেন বলে জানি না। খামের ওপরেই আপনার ঠিকানা ছিল, যদিও বুঝতে পারি নি ওটা স্বয়ং আপনারই। তবু কৌতূহলকে দমানো বড় দায় হলো। শেষ পর্যন্ত অনেক সংকল্প-বিকল্প করার পর খুলেই ফেললাম। আশা করি এই কৌতূহল মার্জনা করবেন। পড়ে বুঝলাম আপনি কোন সাত্যকি লাহিড়ীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর আপনার 'আমেরিকা' গল্পটির ওপর কিছু মন্তব্য করার জন্য। এখন প্রশ্ন হলো, কে এই সাত্যকি লাহিড়ী? আর কেনই বা তিনি এমন সমঝ্‌দার পাঠক হয়েও ঠিকানাটা ভুল দিলেন। আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও কেউ সাত্যকি লাহিড়ী নেই যে হঠাৎ তার খামের তলায় আমার ঠিকানা দিয়ে বসবে।

অদ্ভুত ব্যাপার। অতএব আপনার চিঠিটা আমি ফেরত পাঠাচ্ছি। অবশ্য এটাও অনেক ভাবার পর। প্রথমে ভাবলাম রেখে দিই না চিঠিটা এখন। বহুদিন পরে হয়ত বেশ কিছু নাম কেনা যাবে। কিন্তু সে ইচ্ছে মুলতুবী রইল। যাহোক, আপনাকে চিঠি দেবার আর একটা প্রয়োজন ছিল, কারণ চিঠিটায় আপনার লাভ হয়েছে কি না জানি না, কিন্তু আমার কিছু হয়েছে। সুতরাং কৃতজ্ঞতা স্বরূপও লেখা উচিত। আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করবেন, অবশ্য এই অতিরিক্ত অভিনন্দনের জন্যে সাত্যকি লাহিড়ীই দায়ী। হয়ত বেশ ছিলেন আপনি, কিন্তু কোথা থেকে এক সাত্যকি লাহিড়ী এসে প্রহেলিকার সৃষ্টি করে দিয়ে গেল। নমস্কারান্তে ইতি

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

ঘটনাটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ। ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। আমার জীবনে এই ঘটনা প্রথম নয়। এই সাত্যকি লাহিড়ীরা আমার জীবনে বহুবার বিভিন্ন নামে বিচিত্রভাবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং লেখক-জীবনের একেবারে আদিযুগ থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন। এবং নানাভাবে আমার সাহিত্যের ব্যাখ্যা করে আমাকে কৃতজ্ঞতা-ঋণেও আবদ্ধ করে রেখেছেন! তাঁরা আমাকে ভালবাসেন, তা আমি জানি। কিন্তু তাঁদের ঠিকানা না-জানা থাকায় আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগও এর আগে কখনও পাই নি। এবার ভূমিকার আশ্রয়ে সেই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করলাম।

'কড়ি দিয়ে কিনলাম' প্রসঙ্গে

Modern Library থেকে প্রকাশিত Dostoyevskey-র "Brothers Karmazov" এর ভূমিকায় সম্পাদক প্রথম লাইনেই একটি চমৎকার কথা বলেছেন—"The last and crowning work of Dostoyevskey's life, The Brothers Karmazov, first appeared as a serial in "Russky Vistnik", a Moscow magazine, during 1879-1880. Written under severe external and internal pressure, each instalment created a national furore comparable only to the excitement stirred by the appearance, in 1866 of "Crime and Punishment." "কড়ি দিয়ে কিনলাম" উপন্যাস সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ১৯৫৯, ১লা জানুয়ারী থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ১০৭টি কিস্তিতে সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকায় এই উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশের সময় যে-শোরগোল পড়ে যায়, তার সঙ্গে তুলনা করা যায় একমাত্র ১৯৫২, নভেম্বর থেকে ১৯৫৩, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত "সাহেব বিবি গোলাম" উপন্যাসের সঙ্গে। যে মানসিক যন্ত্রণা, শত্রুতা ও বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা সে-সময়ে লেখককে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে তার নীরব সাক্ষী আছি আমি। তখনকার কিছু কিছু চিঠিপত্রও আমি দেখেছি। "দেশ" পত্রিকার অফিসে যে-সব অসংখ্য চিঠি-পত্র এসেছে তা যে-কোনও লেখককে বিভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। তবু মনে হয় অনুকূল পরিবেশের চেয়ে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই বিমল মিত্রের প্রতিভা বোধহয় খোলে বেশি। তাই উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হবার কালে যখন "দেশ পত্রিকার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো তখন, পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকেও এই মর্মে চিঠি আসতে লাগলো যেন উপন্যাস শেষ না হয়। তাঁদের ভালো লাগায় যেন ছেদ না ঘটে! বইটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হওয়ার সময়েই বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের অনুমতির জন্যে অনুরোধ আসতে থাকে। এখন ভারতের বাইরে পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ ত্রৈমাসিক লাহোরের "নুকুশ" পত্রিকায়, এবং ভারতের ভেতরে মালয়ালাম ভাষায় কেরালার "জনযুগম্" সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। হিন্দী ভাষায় গ্রন্থটি দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যে-কোনও ভাষার পক্ষে যে-কোনও বই-এর দাম ৪২ টাকা ৫০ পয়সা

দুর্মূল্যের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দী ভাষা-ভাষাদের কাছে বইটি অভূতপূর্ব সমাদর অর্জন করেছে। এ হেন গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হলো তখন পাঠক সাধারণের মধ্যে অন্তহীন কৌতূহলের সঙ্গে একটি প্রশ্নই ধ্বনিত হতে লাগলো। সেটা এই যে এই ব্যস্ততার যুগেও এমন এপিক লেখা সম্ভব হলো কেমন করে! এই প্রবন্ধটি সেই প্রশ্নেরই জবাব। প্রকাশক "মিত্র ও ঘোষ" পাঠক-সাধারণের কৌতূহল নিরসনকল্পে একটি বিশেষ পুস্তক তালিকায় ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, এবং সেই পুস্তিকাটি দশ সহস্র কপি ছাপিয়ে পাঠকদের কাছে বিতরণ করেন। এটি যে কোন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে বৃহত্তম। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "Recent trends in Bengali Literature" নিবন্ধে লিখেছেন—"...Bimal Mitra's encyclopaedic novel "Karhi Diye Kinlam" —1962, sums up the complexities and unsolved riddles of modern life in a representative individual character and studies life against the background of on ever-widening environment. This is truly a novel with a third dimension that packs up the meaning of the lives of all classes of people and events of far reaching magnitude into the life of a single individual...This is a book which has an intellectual appeal not exhausted at the first reading of the story. With this novel, modern Bengali fiction may be said to have stepped into a new sense of life-values or a new world of cosmic proportions..." এই তো গেল সমালোচকের কথা। কিন্তু লেখক যদি কখনও নিজের রচনা সম্পর্কে কিছু আন্তরিকভাবে পেশ করেন তখন তার মূল্য হয় অনেক বেশী। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

* * *

স্বামী স্ত্রী দু'জন জীবিত থাকতে যেমন তাঁদের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে সত্য কথা বলা বিপজ্জনক, লেখকের নিজের লেখা সম্বন্ধেও তাই। লেখকের জীবিতাবস্থায় তাঁর লেখা ভাল কিম্বা মন্দ বলা চলে কিন্তু সত্য কথা বলা চলে না। আজ পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাসে তা কখনো ঘটে নি। সুতরাং সে চেষ্টা করবো না। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' লেখা-

কালীন যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তা এখন বলা বিপজ্জনক। আমার অবর্তমানে অন্য কেউ সে চেষ্টা করতে পারেন। কারণ তার অনেক সাক্ষীই সশরীরে জীবিত আছেন। আমি এখানে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করি।

সতেরো শ উননব্বই সালে কবে একদিন ফ্রান্সে এক বিপ্লব হয়েছিল। তার স্মৃতি যেন লোকে তখন ভুলতে বসেছে। টাট্‌কা মনে আছে উনিশ শ চোদ্দ সালের বিশ্বযুদ্ধটার কথা। কিন্তু তখনও লুই-দ্য-ফোর্টিন্‌থ্‌ আর ম্যাডাম-দু-ব্যারিরা পৃথিবী থেকে মুছে যায় নি। তাদের কেউ বসেছে ইংলণ্ডের সিংহাসনে, কেউ জর্মানীতে, কেউ আমেরিকায়, আর কেউ বা ফ্রান্স-এ। সেই Liberty, Equality আর Fraternityর বাণী তখন আর কারো কানে ঢোকে না। কে একজন বলেছিল—That government is best which governs not at all. সেকথাও আর তখন কানে ঢুকছে না কারো। দেখতে দেখতে পৃথিবীর কুরুক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে একদিন শেষও হয়ে গেল। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের অপমৃত্যু দিয়েও মানুষ তাদের চাওয়া গভর্নমেণ্ট পেলে না। শ্রমিকেরাও তাদের বন্ধন ভাঙতে পারে নি তখন। মানুষের সংসারের লক্ষ্মী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে ঘর থেকে। ইণ্ডিয়ার টাকা, ইংলণ্ডের পাউণ্ড, আমেরিকার ডলার, ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক, জার্মানীর মার্ক, রাশিয়ার রুবল, ইটালীর লীরা, জাপানের ইয়েন, সকলকে ট্যারিফ বোর্ডের চাবি দিয়ে সেফডিপোজিট্‌ ভল্টে আটকে রাখবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তবু কোথাও স্ট্রাইক বন্ধ হচ্ছে না, হরতাল বন্ধ হচ্ছে না, অসন্তোষ থামছে না। দিন দিন সায়েন্স আর ইন্‌ডাস্ট্রি কেবল লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে আর মানুষের সমাজ স্থাণুর মত হতভম্ব হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তাই দেখছে আর বাঁচবার পথ খুঁজে মাথা কুটে মরছে।

ঠিক এই সময়ে মানুষের ঘরে একটা নতুন নাম জন্মাল। সে দীপঙ্কর।

জন্ম তো হল। কিন্তু তার পর?

তার পর পলে-পলে অপমান, অত্যাচার আর অপমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমি বড় হতে লাগলাম। দেখলাম আমার চারদিকে শুধু ঘৃণা, শুধু লজ্জা, শুধু কলঙ্ক, শুধু ভয়। দেখলাম অঘোরদাদুকে, চন্নুনীকে, লক্কাকে, লোটনকে, ছিটেফোঁটাকে, ছুনিকাকাকে, আর তাদের মত অসংখ্য মানুষকে, যারা ন্যায়-অন্যায়ের বালাই নিয়ে মাথা ঘামায় না। যারা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয় সত্যকে, ধর্মকে আর সুন্দরকে। যারা এক ফুঁ-এ চিরকালের সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ করে দিয়ে মহা-আরামে দিন কাটিয়ে দেয়। অথচ এই সংসারে তাদেরই পাশাপাশি দেখলাম প্রাণমথবাবুকে, সতীকে, দাতারবাবুকে। দেখলাম আরো অনেকের সঙ্গে সনাতনবাবুকেও। কিন্তু মানুষের লেখা পুঁথির সঙ্গে সেই সব মানুষদের জীবনকে যাচাই করতে গিয়ে মুশকিলে পড়লাম। ১৭৮৯ সালের ফরাসী দেশেও ঠিক এমনি অবস্থা ছিল একদিন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই পৃথিবীতে যন্ত্র-সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও আর এক নতুন সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল। সেদিন সেখানকার অবস্থাও ছিল ঠিক এখানকার মত। সেখানকার অঘোরদাদুরাও ঠিক এমনি করে ঠাকুরের নৈবেদ্য চুরি করে যজমান ঠকাতো। সেখানকার চন্নুনীরাও লেখাপড়া শিখতে না পেরে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে জীবন কাটাত। সেখানেও ছিল ছুনিকাকা, সেখানেও ছিল পঞ্চাদা, ছোনেদা, মধুসূদনের বড়দা। সেখানে সেই ফরাসীদেশেও ছিল কালীঘাটের মতন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন। সেখানকার ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনেও রোদ ঢুকত না, শিক্ষা ঢুকত না, সভ্যতা ঢুকত না সেদিন। সি-আর-দাস মারা যাবার দিন সেখানেও সবাই নির্বিকার হয়ে আড্ডা দিত। হুজুগের দিন চরকা কাটত আবার হুজুগ চলে গেলে চরকা ফেলে দিত। সেখানেও লক্ষ্মীদির মত মেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে দীপঙ্করের মত ছোট ছেলেদের ধরে চকোলেট দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শম্ভুদের কাছে প্রেম-পত্র পাঠাত।

সেখানেও কিরণরা রাস্তায় রাস্তায় হাতে-কাটা পৈতে বিক্রি করত আর দীপঙ্করের মায়েরা পরের বাড়িতে রান্না করত আর ছেলে মানুষ করার স্বপ্ন দেখত। আর সেখানেও যারা বড়লোক, যারা ব্যারিস্টার পালিতের মতন বড়লোক, যারা অঘোরদাদুর যজমানদের মত বড়লোক, সেই 'লখার মাঠে'র একাদশী বাঁড়ুজ্জে আর চাউলপটির শশধর চাটুজ্জের দল কড়ি দিয়ে সব কিনে ফেলত—পাপ কিনত, পুণ্য কিনত, ধর্ম কিনত, অধর্ম কিনত। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি যশ সম্মান কীর্তি অমরত্ব সব কিনে ফেলত!

এই সব পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যেত দীপঙ্কর। কোথাও কোনও নিয়ম পেত না, কোথাও কোনও ফরমূলা পেত না। চিরকাল কি এমনিই চলবে? এমনি অনাচার আর এমনি অরাজকতা? তিন শো বছর আগেকার লেখা বই-এর পাতাতেও দেখলে Babeuf (বাবাফ্) লিখছেন, "When I see the poor without the clothing and without the shoes which they themselves are engaged in making, and contemplate the small minority who do not work and yet want for nothing, I am convinced that Government is still the old conspiracy of the few against the many, only it takes a new form."

সেদিন হাজরা রোডের মোড়ে হঠাৎ অমলবাবুর সঙ্গে দেখা।

আশুতোষ কলেজের হিস্ট্রির প্রফেসর অমল রায়চৌধুরী। লম্বা-চওড়া চেহারা। হিস্ট্রিও যে উপন্যাসের মত উপাদেয় হতে পারে তা অমলবাবুর লেকচার শুনেই বুঝেছিলাম। নানা কলেজের ছাত্ররা আশুতোষ কলেজে আসত তাঁর লেকচার শুনতে। কিন্তু আমাকে তিনি চিনতে পারলেন না।

বললেন—তুমি কে? কোন্ ইয়ারে পড়? তোমার নাম কী?

সব বললাম। তার পরে বললাম—একটা কথা জিজ্ঞেস করব স্যার ?

বললেন—কী ?

শেষ পর্যন্ত কথাটা বলেই ফেললাম। কয়েকদিন আগের কথা। ক্লাসে সোক্রেটিসের কথা পড়াচ্ছিলেন। পড়াতে পড়াতে বললেন সোক্রেটিসের একটা কথা। সোক্রেটিস বলেছিলেন—Be hopeful then, gentlemen of the jury, as to death; and this one thing hold fast that to a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the Gods indifferent to his well-being. কথাটার মানে সেদিন ক্লাসে বুঝতে পারি নি। দাঁড়িয়ে উঠে মানে জিজ্ঞেসও করতে পারি নি সঙ্কোচে। ক্লাসের সবাই কথাটার অর্থ বুঝতে পেরেছিল কিনা তাও জানি না। তাই রাস্তায় দেখা হতেই সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম—কথাটার মানে কী ? অর্থাৎ কথাটা কতদূর সত্যি ?

অমলবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় থাকো তুমি ? ম্যাট্রিকে রেজাল্ট কী হয়েছিল তোমার ?

সব প্রশ্নেরই তাঁর উত্তর দিলাম। তার পর বললাম—আপনি হয়তো এখন খুব ব্যস্ত আছেন স্যার, আমি পরে আর একদিন দেখা করব !

বলে চলে আসছিলাম। কিন্তু অমলবাবু থামিয়ে দিলেন। বললেন—না, দাঁড়াও, তুমি একটা কাজ করো, আমার সঙ্গে লাইব্রেরীতে একবার দেখা করো।

—কখন স্যার ?

—যখন ইচ্ছে—বলে অমলবাবু চলে যাচ্ছিলেন। আমিও চলে আসছিলাম।

হঠাৎ যেতে যেতে অমলবাবু আবার ফিরলেন। বললেন—দেখা করো ঠিক, বুঝলে ?

বললাম—করব স্যার।

কিন্তু যাব-যাব করেও আর বহুদিন অমলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সাহস হয় নি। ক্লাসের মধ্যে বইএর ওপর মুখ দিয়েই পড়িয়ে যেতেন। কারোর দিকেই চেয়ে দেখতেন না। কিন্তু সেদিন সব দ্বিধা-সঙ্কোচ এড়িয়ে তাঁর লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তিনি তখন ফোর্থ-ইয়ার ক্লাস শেষ করে এসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। সেই সময়ে দরজার কাছে গিয়ে বললাম—স্যার!

বললেন—কী চাও?

বললাম। সব কথা তাঁকে মনে পড়িয়ে দিলাম। কথাটা শুনে তিনি আমার আপাদ-মস্তক আবার ভাল করে দেখে নিলেন। বললেন—মনে পড়েছে, কিন্তু এতদিন কলেজে পড়াচ্ছি, তোমার মত আগে কেউ আমাকে এ-প্রশ্ন তো করে নি! তা তুমি এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চাও, না ইকনমিক ব্যাখ্যা চাও?

আমি চুপ করে রইলাম।

অমলবাবু বললেন—বুঝেছি, তবে শোন—

বলে তিনি আরম্ভ করলেন বোঝাতে। অনেকদিন আগেকার ঘটনা। সেদিন সেই লাইব্রেরীর অন্ধকার ঘরে বসে অমলবাবু যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা আমার আজো মনে আছে। সেই পুরোন আশুতোষ কলেজও নেই, সেই বিল্ডিংটাও নেই। তার জায়গায় নতুন কলেজ হয়েছে, নতুন বিল্ডিং। কিন্তু কথাগুলো মনে আছে।

সে দক্ষিণেশ্বরের কথা। পরমহংসদেব তখন বেঁচে। এগারো শ ক্রোশ দূর থেকে এক সাধু এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। সাধু হীরাচাঁদ। এসে স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা বলুন তো, ভক্তের এত দুঃখ কেন?

বিবেকানন্দ বললেন—The scheme of the universe is devilish, I could have created a better world.

সাধু আবার জিজ্ঞেস করলেন—তা দুঃখ না থাকলে সুখ বুঝবেন কী করে?

তখন বিবেকানন্দ বললেন—Our only refuge is in Pantheism —সবই ঈশ্বর, এই বিশ্বাসটুকু হলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়—অর্থাৎ আমিই সব করছি, এই বিশ্বাস—

গল্পটা বলে অমলবাবু একটু থামলেন। তারপর বললেন—আমি ইতিহাস পড়াই, ইতিহাসেরও একটা দিক আছে, ভারি ইম্‌পর্ট্যান্ট দিক, সেটা শোন—

—এ তার অনেক পরের কথা। উনিশ শো পাঁচ সালের কথা। একদিন কয়েক হাজার লোক সবিনয়ে এক দেশের রাজার প্রাসাদের সামনে গিয়ে দরবার করলে। গেটের সামনে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল সেপাই-সান্ত্রী। তারা জিজ্ঞেস করলে—কী চাই তোমাদের ?

লোকরা বললে—হুজুরের কাছে আমরা একটা দরখাস্ত পাঠাতে চাই—

দরখাস্তখানা সেপাই রাজার কাছে নিয়ে গেল। অতি বিনীত দরখাস্ত। দরখাস্তে লেখা ছিল : "We come to thee sirea, to seek truth and redress. We have been oppressed ; we are not recognised as human beings, we are treated as slaves, who must suffer their bitter fate and keep silence. The limit of patience has arrived. Sire, is this in accordance with the divine law by the grace of which thou reignest ? Is it not better to die, better for all the people, and let the capitalist, the exploiters of the working class live ? Do not refuse assistance to thy people. Destroy the wall between thyself and thy people and let them rule the country with thvself."

দরখাস্তখানা পাঠাবার খানিক পরেই এক কাণ্ড হল। ওপরের বারান্দা থেকে বলা-নেই-কওয়া নেই, তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে

গুলি চলতে লাগলো, গুলির ওপর গুলি। সেই হাজার হাজার নিরীহ লোকের ওপর লক্ষ লক্ষ গুলির ঝাঁক এসে পড়তে লাগল। হাজারে হাজারে মরে পড়ল লোক, কাত্‌রাতে লাগল, ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল যন্ত্রণায়—

আর মজা এই, ঠিক তার বারো বছর পরে ঠিক সেই বারান্দা থেকেই ১৯১৭ সালে একদিন আর একজন লোক হাজার হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন—Comrades, feeding people is a simple task. We will take from the rich and give to the poor. Take milk from the rich and give to the children of the workers. He who does not work shall not eat. Workers receive cards. Cards bring food.

আরো অনেক কথা বলেছিলেন অমলবাবু। সব ভালো বুঝতে পারি নি। বেশি সময়ও ছিল না। ক্লাসের ঘণ্টা পড়তেই অমলবাবু চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন—পরে তোমাকে এ-সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলব।

কিন্তু তখন কি জানতাম সেই অমলবাবু অত শিগ্‌গির চলে যাবেন! কিন্তু পরে আর একদিন মাত্র এ-বিষয়ে কথা হয়েছিল অমলবাবুর সঙ্গে। ক্লাসের মধ্যে চুপ করে বসেছিলাম এক কোণে।

—রোল নাম্বার সিক্স্‌, রোল নাম্বার সিক্স—

দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—ইয়েস স্যার—

অমলবাবু হঠাৎ বললেন—তুমি তোমার সেই কোশ্চেনের উত্তর পেয়েছ?

বললাম—এখনও ঠিক বুঝতে পারি নি স্যার—

অমলবাবু বললেন—পাবে পাবে, এর উত্তর কারো কাছে জিজ্ঞেস করে পাওয়া যায় না, এর উত্তর জীবন দিয়ে পেতে হয়, জীবন দিয়ে সন্ধান করলে তবে এর উত্তর পাবে তুমি—

১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী 'দেশ' পত্রিকায় দীপঙ্কর সেই যাত্রা শুরু করল। আরম্ভ হল সন্ধান। মানুষের মহাযাত্রার মিছিলে মিশে গেল নগণ্য একটি গ্রামের ছেলে। ছোট, বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, সাহেব মেমসাহেব। কলকাতার তাবৎ জনসাধারণ। ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট থেকে শুরু করে একেবারে কালীঘাটের ডাস্ট্‌বিন পর্যন্ত পরিক্রমা শুরু হল তার। কেউ তাকে ভালবাসল, কেউ ঘৃণা করল, কেউ আঘাত দিলে, কেউ আনন্দ। কিন্তু দিনে দিনে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায়, প্রতিমুহূর্তের অনুভাবনায় দীপঙ্কর তখন মানুষ হয়ে উঠছে আর মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকটি মানুষকে একে একে তার মনের তালুকদারির সমস্ত স্বত্ব উপস্বত্ব সুস্থ চিত্তে বহাল-তবিয়তে দান করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল সে। সর্বরিক্ত হয়ে দীপঙ্কর তার সর্বস্ব নিবেদনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলে !

কিন্তু আমি মুক্তি পাই নি। দীপঙ্করের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছি তখন। দীপঙ্করের পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে আমারও পরিক্রমা চলছে তখন স্বর্গ-মর্ত্য-ভুবন। রাত্রে ঘুম নেই। সারা পৃথিবী যখন ঘুমোচ্ছে, তখন আমি আর আমার বাড়ির সামনের বার্লি-ফ্যাক্টরিটা জেগে আছি। জেগে-জেগে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছি। মাথার মধ্যে সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। আমিও দীপঙ্করের সঙ্গে ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট, প্যালেস-কোর্ট আর গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এ ঘোরা-ফেরা করছি। চোখের সামনে সব ঝাপ্‌সা দেখছি। অন্ধকার।

বাড়ির ডাক্তার কানাইলাল সরকার। কানাই বললে—ডাক্তার নীহার মুন্সীকে একবার দেখাও তুমি চোখটা।

জিজ্ঞেস করলাম—কত নেবেন তিনি ?

ডাক্তার বললেন—মস্ত বড় ডাক্তার, দুদিন দেখাতে হবে, ষোল ষোল—বত্রিশ টাকা—

বত্রিশ টাকা ! বত্রিশ টাকার দাম আমার কাছে অনেক। কিন্তু চোখ যদি অন্ধ হয়ে যায় ? দেখবো কী দিয়ে ? লিখবো কী করে ?

শেষ পর্যন্ত বত্রিশটা টাকা সঙ্গে করে আগের থেকে দরখাস্ত দিয়ে দিন-ক্ষণ স্থির করে গিয়ে হাজির হলাম তাঁর গরচা লেনের বাড়িতে। বহু লোক বাইরে অপেক্ষা করছেন তখন। ভেতরের ঘরে তিনি রোগী দেখছেন। তাঁর পরিচারককে একটা স্লিপে নাম লিখে ভেতরে পাঠিয়ে দিতে বললাম। ভয়ে ভয়ে বাইরে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ তিনি বাইরে এলেন সশরীরে। একেবারে নমস্কারের ভঙ্গি। বললেন—আমার বহু সৌভাগ্য—

আমি তো অবাক! সৌভাগ্য আমার না তাঁর!

যাহোক, পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা।

শেষকালে চলে আসবার সময় জিজ্ঞেস করলাম—কত দিতে হবে?

—কিছু না।

আমি আরো অবাক! এমন কথা আগে কখনও শুনি নি কোনও ডাক্তারের কাছে। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তখনও। আমার হতভম্ব দৃষ্টির দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন—তার চেয়ে বরং আপনার একটা বই আমাকে দেবেন, সেইটেই আমি বেশি দামী বলে মনে করবো!

তার পর ১৯৬২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারীতে একদিন শেষ হলো কড়ি দিয়ে কেনা। অজস্র অসংখ্য চিঠি-পত্র। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ থেকে পত্রাঘাত। কিন্তু আমাকে তা স্পর্শ করে নি। আমি তখন বোম্বাইতে নির্জন নিরিবিলিতে নিবিষ্ট। আমি জানতে পারি নি, জানতে চাইও নি কড়ি দিয়ে কী কিনলাম, আর কী কিনলাম না। 'দেশ' পত্রিকার সাগরময় ঘোষ একটি চিঠিতে লিখলেন, "গতকাল 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' হস্তগত হলো। বইটা হাতে নিয়ে অনুভব করলাম কী বিরাট কীর্তি আর কী অসাধ্য-সাধনই না করেছেন। এর পর আছে দ্বিতীয় খণ্ড। প্রতিদিন অসংখ্য চিঠি আসছে, আপনার

বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অকুণ্ঠ অভিনন্দন। পাঠকদের যে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে এই অগণিত চিঠিই তার প্রমাণ!"

কলকাতায় ফিরে এসে চিঠিগুলো পড়লাম। যাঁরা এই উপন্যাস পড়ে আমাকে পত্রযোগে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আজকে এই সুযোগে তাঁদের প্রত্যেককে আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ উপন্যাস যে তাঁদের ভাল লেগেছে সে তাঁদেরই মহত্ত্ব, আমার কেবল সৌভাগ্য! আমার শেষ সাহিত্যার্ঘ্যের বিনিময়ে এইটুকুই আমার প্রাপ্য। এখনকার মত আর কিছু আমার কাম্য নেই।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

এই প্রসঙ্গে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর দুই খণ্ডের ভূমিকা-লিপি উদ্ধৃত করা হলো। ভূমিকা দু'টি পড়লেই বোঝা যাবে বিমল মিত্রের সাহিত্য-সৃষ্টির ভিত্ কত গভীরে, সমাজ-সচেতনার কোন্ স্তরে, নিহিত। বিমল মিত্র "কড়ি দিয়ে কিনলাম" এই এপিক-ধর্মী উপন্যাস লিখে প্রমাণ করেছেন যে আজকের দিনেও "ইজম্" এর উর্ধ্বে থেকে উপন্যাস লেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ জর্জ বার্নার্ড শ রচিত " Charles Dickens and Great expectations" থেকে কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করলাম: "Marx and Dickens were contemporaries living in the same city and pursuing the same profession of literature, yet they seem to us like creatures of a different species living in different worlds. Dickens, if he had ever become conscious of Karl Marx, would have been classed with him as revolutionist."

ভূমিকা—১ম খণ্ড

ছোটবেলায় আমার প্রিয় গ্রন্থ ছিল রামায়ণ। বলতে গেলে গল্পে সে-ই আমার প্রথম পাঠ। গল্পের রস যে কত গম্ভীর হতে পারে, তা সেদিন চোখের জলের সঙ্গে কেমন করে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম, তারপরে আর কোনও গ্রন্থ পড়ে তা করি নি। এ তো গেল গল্পের দিক। গল্প যতক্ষণ পড়ি ততক্ষণই তার রস। পর মুহূর্তেই গল্পের আবেদন হাল্কা হয়ে আসে। কিন্তু গল্পের উর্ধ্বে আর একটি তীব্রতর এবং গভীরতর আবেদন আছে যা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয় না। যা জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে। যা জীবনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। জীবনের অগ্রগতিতে সাহায্য করে। রামায়ণ সেই জাতীয় গল্প যা যুগ থেকে যুগান্তরে প্রসারিত হয়ে জীবনকে জাগ্রত করে, জীবনকে পুনর্জীবন দান করে। বড় হয়ে দেখছি রামায়ণ শুধু অসার কবি-কল্পনা নয়। এই বর্তমান সংসার-জীবনেও

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রাম সীতা রাবণ আপন মহিমায় বিরাজমান। অযোধ্যা আর লঙ্কা শুধু ভৌগোলিক নাম মাত্রই নয়—কলকাতা শহরের মধ্যেই তাদের অবস্থিতি। এই কলকাতায় এ-যুগেও সীতার হরণ হয়। এ-যুগেও সীতার বনবাস হয়। এবং এই বিংশ শতাব্দীতেও সীতার পাতালপ্রবেশ হয়। অনেক দিনের কল্পনা ছিল রামায়ণের গল্প নিজের ভাষায় লিখবো। তা আর হলো না। হলো "কড়ি দিয়ে কিনলাম"। ইতি—

ভূমিকা—২য় খণ্ড

"রামায়ণ" না লিখে কেন "কড়ি দিয়ে কিনলাম" লিখেছি—তা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলা আছে। আমি বাল্মীকি নই, বাল্মীকির সে-প্রতিভাও আমার নেই। তিনি লিখেছেন সত্যযুগের কাহিনী, আমি লিখেছি কলিযুগের। কিন্তু আসলে কাজ যত সহজ হবে ভেবেছিলাম তত সহজ হলো না—লিখতে গিয়ে দেখলাম কলিযুগের চেয়ে সত্যযুগ অনেক সত্য। সতযুগে পুণ্যের জয় সুনিশ্চিত, পাপের পরাজয় অনিবার্য। কিন্তু কলিযুগে সে বালাই নেই। এ-যুগে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে নির্দোষ বিবাদীকে সর্বস্বান্ত করা যায়, সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকলে হত্যাপরাধেও বেকসুর খালাস পাওয়া যায়। এ-যুগের রাবণের পক্ষে রামকে যুদ্ধে হারিয়ে অযোধ্যার সিংহাসনও দখল করা সম্ভব, এমন কি সমাজে-সংসারে প্রাতঃস্মরণীয় হওয়ার নজীরও আছে। এ-যুগ টাকার যুগ, এ-যুগ কড়ির যুগ। এই কড়ির যুগের কাহিনী লিখতে গিয়ে তাই বার-বার আমি মহাকবিকে স্মরণ করে অহঙ্কারের অপহ্নব ঘটাতে চেয়েছি। কিন্তু এ-সত্ত্বেও ইচ্ছে ছিল উপন্যাসের শেষ পর্বে আমি বাল্মীকির মতই রাবণ বধ সাঙ্গ করে রামকে অযোধ্যার সিংহাসনে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবো। এই কলকাতা শহরেই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটাবো। ভূগোলে না-হোক সাহিত্যে অন্ততঃ গান্ধীজীর স্বপ্ন সার্থক করবো। কিন্তু তা পারলাম না।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অশুভবুদ্ধির চক্রান্তে আমার সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। ওআটার্লুর যুদ্ধের পর ১৮১৫ সালে যারা রাবণকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী করে চিরকালের মত নিঃশেষ করতে চেয়েছিল, তারাই আবার সেই রাবণকে নিজেদের স্বার্থে জীইয়ে তুললো ১৯৩২ সালে। একদিন ফ্রান্সের নেপলিয়ন আবার জার্মানীর চ্যান্সেলর হয়ে বসলো। যে-দেশ মোটা দামে জাপানকে লোহা বিক্রী করেছিল ১৯৩২ সালে, সেই দেশের উপরেই আবার সেই লোহা সুদের বদলে বোমা হয়ে ফিরে এল ১৯৪২ সালে। অর্থাৎ ইংলণ্ডের পাউণ্ড, আমেরিকার ডলার, ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক, জার্মানীর মার্ক, রাশিয়ার রুবল, জাপানের ইয়েন, ইটালীর লীরা আর ইণ্ডিয়ার টাকা পৃথিবীর স্টক্-এক্সচেঞ্জের তাবৎ রাবণরা সব ভাগাভাগি করে দখল করে বসলো। এক রাবণ বহু রাবণে পরিণত হলো। সবাই বুঝলো ন্যুরেমবুর্গ-ট্রায়ালে যাদের ফাঁসি হয়েছিল, শুধু তাদেরই নয়, তাদের যারা বিচার করেছিল সেই সব রাবণদেরও ফাঁসি হলে তবেই বেশি সুবিচার হতো। সুতরাং রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কী হবে, পৃথিবীতে কখন যে রাতারাতি রাবণরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে তা কেউই টের পায় নি। টের যখন পাওয়া গেল তখন আর সময় নেই। সেই সময়েই এ-উপন্যাসের রাবণ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আরো বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসলো। একদিন মানুষের জন্যেই টাকার সৃষ্টি হয়েছিল, তখন টাকার জন্যেই সৃষ্টি হলো ঘোষাল সাহেবদের। আর সীতা? সীতার পাতালপ্রবেশ? এ-যুগের সাধারণ মানুষের সাধ-আহ্লাদ বাসনা-কামনার প্রতীক যদি হয় সতী, তো সে সমস্ত কিছুই অকালে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে মহৎ দাবীর খেসারৎ দিতে দিতে। মনুষ্যত্বকেও আজ চিনতে হয় রক্ত-মাংসের মূল্য দিয়ে। "দেশ" পত্রিকায় এ-উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশ কালে অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেন সতীর কোনও সর্বনাশ না হয়। কিন্তু বাল্মীকিই কি সীতার পাতালপ্রবেশ রদ করতে পেরেছিলেন? বাল্মীকি যা

পারেন নি আমি তা পারবো কেমন করে? আমি অত দক্ষতা কোথায় পাবো? তবু নিজের মনে এই ভেবেই সান্ত্বনা পেয়েছিলাম যে এও হয়ত কলির মাহাত্ম্য! কিন্তু না, আমার ধারণা ভুল। মাহাত্ম্যটা কলির নয়, কড়ির।

আমার চোখে আমি

১৯৪৬ সালে "দেশ" পত্রিকায় "ছাই" (উপন্যাস) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময়ই বিমল মিত্র চক্ষু-পীড়ায় আক্রান্ত হন। চোখের অসুখে প্রায় অন্ধ হবার যোগাড়। লেখক তখন সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অজ্ঞাতবাস নিলেন। সে অজ্ঞাতবাসের কথা কেউ জানতো না একমাত্র "দেশ" সম্পাদক ছাড়া। "ছাই" উপন্যাস ও অন্যান্য গল্প পড়ে সেদিন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ বুঝতে পেরেছিলেন বিমল মিত্রের সাহিত্যিক সম্ভাবনা। তাই অজ্ঞাত-বাস থেকে ফেরাবার জন্য নকল বিমল মিত্রের নামে লেখা ছাপিয়ে সাগরবাবু আবার গল্প লেখালেন আসল বিমল মিত্রকে দিয়ে। আর তারই ফলে আমরা পেলাম "সাহেব বিবি গোলাম," "কড়ি দিয়ে কিনলাম" ও "বেগম মেরী বিশ্বাস"। এই প্রবন্ধ 'ঘরোয়া' পত্রিকার সঙ্গে তৎকালে যুক্ত শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকারের অনুরোধে লিখিত।

*   *   *   *

স্থান—বিলাসপুর। কাল—১৯৪৮ সাল। পাত্র—আমি।

ছত্রিশগড়ের মধ্যে বেশ বড়সড় সিটি বিলাসপুর। রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার কলোনী, বিলাসপুর-সিটি, শনিচরি বাজার, পোস্টাফিস, থানা, জি-আর-পি, কোর্ট-কাছারি, মুন্সেফ, জজ্-ম্যাজিস্ট্রেট, সমস্ত আছে বিলাসপুরে। তারপর আছে আশে-পাশে শিকার করবার ঝিল্-জঙ্গল। আরও আছে বেঙ্গলী ইন্স্টিটিউট, সাউথ্-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান, রানিং-রুম, বুধবারি বাজার আর আছে বিকেলবেলা বেড়াবার জন্যে রেলের প্ল্যাটফর্ম। লম্বা ঢালোয়া প্ল্যাটফর্ম। বিকেলবেলা ডাউন ক্যালকাটা-মেল্ এলে কত নতুন নতুন মুখ দেখা যায়। লাল, কালো, ফর্সা, হল্দে সব মুখ। কত দূর থেকে সবাই আসছে, আবার কত দূরে সবাই চলে যাবে।

এই পরিবেশে আমার চাকরি। এক অদ্ভুত চাকরি। আমার হেড কোয়ার্টার বিলাসপুর, কিন্তু অফিস অনেক দূরে। আড়াইশো

মাইল দূরে। জব্বলপুরে। অর্থাৎ আমি নিজেই নিজের মালিক। আমার কাছে একটা রেলের কার্ড পাশ থাকে—তাতে লেখা আছে 'এনি স্টেশন টু এনি স্টেশন'। অর্থাৎ আমার গতিবিধি যত্রতত্র। আমার ডেজিগ্‌নেশন—'রেলওয়ে সেকশন অফিসার।' আসলে আমি একজন স্পাই। সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্টের কোন্ স্টাফ ঘুষ নিচ্ছে, কে চুরি করছে, কোন্ অফিসার টাকা নিয়ে ওয়াগন সাপ্লাই করছে তারই খবরদারি করি। মাসের মধ্যে সাতাশ-আটাশ দিন ট্রেনে চড়ে ঘুরে বেড়াই চোখ-কান খুলে রেখে। কখনও ফার্স্ট ক্লাসে, কখনও আইস্-ভেণ্ডারস কম্পার্টমেণ্টে, কখনও ব্রেক-ভ্যানে, আবার কখনও বা ডাইনিংকারে। যারা আমাকে চেনে তারা সামনে আমাকে খাতির করে, কিন্তু পেছনে গালাগালি দেয়।

এই ভাবেই চলছিল। হঠাৎ একটা ঘটনায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল।

এ চাকরিতে এসে পর্যন্ত সুনাম-দুর্নাম সবই অর্জন করেছি। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একদিন সেপাই পুলিস-ম্যাজিস্ট্রেট এসে কয়েকজনকে পাকড়াও করে। হৈ-চৈ পড়ে যায় বিলাসপুরে। সবাই বোঝে এ আর কারো কাজ নয়—আমার কাজ। তারা বলাবলি করে—এ মানুষটাকে বাইরে থেকে দেখতে যা আসলে এ তা নয়। আবার কেউ কেউ বলে—উনি ওঁর ডিউটি করেছেন। ওঁর কী দোষ?

সেদিন রাস্তায় এক ভদ্রলোক সামনে এসেই থমকে দাঁড়ালেন।

বললেন—আপনার একটা লেখা পড়লাম বিমলবাবু,—বেশ চমৎকার হয়েছে—

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমি এককালে লিখেছি বটে! তখন নানা পত্রিকায় সে-লেখা পাঠকদের সমাদরও পেয়েছে। কিন্তু সে তো অনেক আগেকার কথা! সে-লেখা এতদিন পরে কী করে হাতে পড়লো ভদ্রলোকের?

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় দেখলেন?

ভদ্রলোক বললেন—এই সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায়,—

আর দাঁড়ালাম না। সোজা প্ল্যাটফর্মে গিয়ে হুইলার্স স্টল্ থেকে একটা 'দেশ' উল্‌টিয়ে দেখি সত্যিই তাই। একটা কবিতা। নাম —'গোলাপ গন্ধ'। কবি—বিমল মিত্র।

আমার চোখে জল এসে গেল। বাড়িতে এসে সারারাতে আর ঘুম এল না। আমার অতীতের সব কিছু কীর্তি আমি যেন নিজের হাতেই সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম। আমি যেন আমার আমিকেই গলা টিপে হত্যা করলাম। আমি বরাবরই নিঃসঙ্গ মানুষ। তখন যেন আরো নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। তবে কেন রাতের পর রাত জেগে আমি একদিন গল্প লিখেছি, গল্প লিখে সময় নষ্ট করেছি? আমি যদি সাহিত্য ছেড়েই দেব তবে কেন সেদিন আমার স্বাস্থ্য, আমার সময়, আমার নিদ্রা সব কিছু ত্যাগ করেছিলাম? ছোটবেলা থেকে তো অনেকে অনেক কিছু হবে বলেই কামনা করে। আমি তো অন্য কিছুই কামনা করি নি। অন্য ভাইদের মত আমি বড়লোক হতে চাই নি বলে বাবা-মা'র কাছে গঞ্জনা শুনেছি। যাতে কোনও অর্থ নেই, যাতে কোন পরমার্থও নেই, আমি নাকি সেই অনাসৃষ্টির কাজেই মনোনিবেশ করেছি! অর্থাৎ তুচ্ছ নগণ্য বাঙলায় এম-এ পাস করেছি। যার একমাত্র পরিণতি স্কুল-মাস্টারি, আর নয় তো কলেজ-মাস্টারি। নইলে তো অনায়াসেই বিদেশে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়তে পারতাম। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারতাম। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থকরী কত-কিছুই পড়তে পারতাম। আমার গুরুজনেরা তাতে খুশীই হতেন। তারা খুশী হয়ে আমার পড়ার খরচ যোগাতেন। আমি আর কিছু না হতে চেয়ে সাহিত্যিক হতে চেয়েছিলাম বলেই তো তাঁদের যত মনোকষ্ট। ভাবলাম— শেষ পর্যন্ত আমার নাম আমার পরিচয় আমার অস্তিত্বই কি মুছে যাবে আর এক নকল বিমল মিত্রের অত্যাচারে?

সেই রাত্রেই. রাত জেগে একটা চিঠি লিখতে বসলাম 'দেশ' সম্পাদককে।

লিখলাম—আমি এখনও জীবিত। গল্প লেখা ছেড়ে দিলেও আমি সশরীরে বেঁচে আছি এখনও। আমাকে কি আপনারা জীবিত অবস্থাতেই মেরে ফেলতে চান? দ্বিতীয় নকল বিমল মিত্রকে আবিষ্কার করে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। যদি মনে করেন যে আমি মৃত তো আমাকে শান্তিতেই মৃত্যু-যাপন করতে দিন! ইত্যাদি ইত্যাদি···

চিঠিটা লিখে পোস্টবক্সে ফেলে দিয়ে এসেও রাত্রিতে ভালো ঘুম হলো না। মনে পড়তে লাগলো আমি লেখক। মনে পড়লো আমার লেখা একদিন লোকের ভাল লাগতো। সেই সে-যুগেও, যখন সাহিত্য-কর্ম ছিল নিতান্তই শখের জিনিস তখন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন তাঁদের 'বিচিত্রা' 'প্রবাসী' আর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখা বাবদ ভালো অর্থমূল্য দিয়ে লেখা ছাপিয়েছেন। মনে পড়লো একদিন রাতের পর রাত জেগে লিখেছি, লেখার জন্যে গুরুজনদের কাছে গঞ্জনা সহ্য করেছি। মনে পড়লো গুরুজনদের কথাগুলো—লেখক মাত্রেই দরিদ্র। আমার এক ভাই ডাক্তার আর এক ভাই ইঞ্জিনীয়ার—আর আমি কি না হবো তুচ্ছ একজন লেখক! তা হোক, যদি সারাজীবন দারিদ্র্যই ভোগ করতে হয় তো তাতেও রাজী। মনে পড়লো বহুদিনের পুরোনো কথাটা —A man is judged not by what he enjoys, but by what he does. মনে পড়লো আমার মতন লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি লোক এই পৃথিবীতে এসেছে আর এখান থেকে বিদায় নিয়েছে। আমার অনুভূতি দিয়ে যাচাই করা যে-সম্পদগুলো বুকের ভেতরে পুষে রেখেছি, তাদের কী হবে? কাকে দিয়ে যাবো? আমার সে-সব জিনিস কবে সকলের সর্বসাধারণের জিনিস করে তুলবো! আমার চেয়ে দশগুণ মাইনে পায় আমার আই-জি। ইন্‌স্‌পেক্‌টার জেনারেল অব পুলিস। আমি তো আমার অফিসের বারোটা জেনারেল ম্যানেজারকেও দেখেছি। তারা একজনের পর একজন এসেছে আর গেছে। কে তাদের মনে রেখেছে? তাদের চিন্তায়

পৃথিবী কতটুকু উন্নত হয়েছে, কতটুকু এগিয়ে গিয়েছে? বড় বড় গাড়ি, ভালো ভালো দামী-দামী স্যুট, সে সব কোথায় গেল আজ? মাসে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাওয়া সেই মহাপুরুষরা?

তিন দিন পরেই চিঠি এল কলকাতা থেকে।

সম্পাদক লিখেছেন—আপনি যদি গল্প না লেখেন তো নকল বিমল মিত্রের লেখা আমি আরো ছাপাবো, যতদিন না লিখবেন ততদিন ছাপবো। অবিলম্বে গল্প পাঠান—

আশ্চর্য! তখন আমার আর কতটুকু খ্যাতি প্রতিপত্তি। ১৯৪৬ সালে 'দেশ' পত্রিকায় একটা মাত্র উপন্যাস ধারাবাহিক ছাপিয়েছিলাম। নাম দিয়েছিলাম 'ছাই'। সে উপন্যাস শেষ হবার আগেই হঠাৎ চোখের অসুখে প্রায় অন্ধ হবার যোগাড়। অন্ধ চোখ নিয়ে সেই যে সাহিত্য-ক্ষেত্র থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলাম, কলকাতা থেকেও উধাও হয়ে গিয়েছিলাম, কেউ আর তারপর আমার খোঁজ রাখেনি। কিন্তু খোঁজ রাখতেন শুধু 'দেশ' সম্পাদক। কিন্তু কেন খোঁজ রাখতেন? তিনি তো আমার বন্ধুও নন। কোন পারিবারিক সম্পর্কও তো ছিল না তাঁর সঙ্গে। আড্ডা দেওয়া তো দূরের কথা। নেহাতই তিনি সম্পাদক আর আমি নগণ্য তুচ্ছ অখ্যাতনামা একজন লেখক। তবে আমাকে লেখাবার জন্যে কেন তাঁর এত পীড়াপীড়ি? কারণটা কী? আজ পর্যন্ত হাজার চেষ্টা করেও এর কোনও সদুত্তর আমি খুঁজে পাই নি। অথচ আমি না লিখলে 'দেশ' পত্রিকার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধিও নেই তখন। আমার নাম অঙ্গে ধারণ করে 'দেশ' পত্রিকার গৌরব এতটুকু বাড়বার আশা তো নেই-ই, বরং কমবার আশঙ্কা আছে!

অনেক চেষ্টা করে তখন চাকরিটা বদলে নিয়ে কলকাতায় চলে এলুম। মাইনেটা কমলো অনেকখানি, কিন্তু মাইনের ওপর তখন ঘেন্না ধরে গেছে। টাকার ওপরেও ঘেন্না। মনে হয়েছিল—পরিচয় দেবার মতো আমার কিছু যদি না থাকে তো টাকা দিয়ে তার অভাব পূরণ করা যাবে না। আমি যে সাধারণ মানুষ একজন, অতি

সাধারণ, অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ, সেই পরিচয়টাই রক্তের অক্ষরে একদিন লিখে যেতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যত অখ্যাত-অবজ্ঞাত-অত্যাচারিত মানুষ এসেছে আর গিয়েছে তাদের আমি অক্ষয় অধিকার দিয়ে যাবো নিজের জীবন দিয়ে। যে মানুষ একদিন ওভারসিয়ার হয়ে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টে ঢুকেছে, যে মানুষ কুলি হয়ে কাজ করেছে, যে-বউটি অন্তঃপুরের আড়ালে থেকে নিজের সত্তাকে কলঙ্কিত করেছে, নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিপন্ন করেছে তাদের সকলের কথা লিখে যাবো। আর শুধু তাদের কথাই নয়। আরো আরো অনেক লোকের কথা লিখবো। কালীঘাটের বস্তি থেকে শুরু করে প্যালেস কোর্ট পর্যন্ত যত লোক প্রতিদিনকার কলকাতার ইতিহাসকে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসেছে তাদের কথাও বলবো। আর এমন করে বলবো যা এর আগে তেমন করে কখনও বলা হয় নি !

কিন্তু মুশকিল হলো কেমন করে বলবো ? কোথায় পাই সেই নতুন গল্প বলার পদ্ধতি ? এমন করে গল্প বলতে হবে যাতে পাঠক ক্ষিদে ভুলে যায়, ট্রেন মিস করে, ঘুমিয়ে না পড়ে। আমার গল্প পড়তে পড়তে পাঠক যদি বই সরিয়ে রাখে তো সে যে আমারই অপরাধ !

টেলিফোনে সম্পাদক জিজ্ঞেস করেন—গল্প হলো ?

আমি বলি—না—

আরো সময় লাগবে। পৃথিবীর সব দেশের সব লেখকের নতুন গল্প পড়তে লাগলুম। কোনওটাই পছন্দ হবার মত নয়। মনে হলো—গল্প বলার ধরা-বাঁধা আইনটাই ভাঙতে হবে। বাঁধা পথে চলবার সুবিধেটা যেমন আছে, অসুবিধেটা আছে তার চেয়ে অনেক বেশি। সেই বাঁধা বুলিই যদি আওড়াবো তো নতুন করে আবার লেখার কী দরকার ? বঙ্কিমচন্দ্র তাহলে কী দোষ করেছেন ? শরৎচন্দ্রই বা কী দোষ করলেন ?

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কালীঘাটের বাজারের পাশ দিয়ে আসছি। পাশেই একটা হোটেল। মনোরঞ্জন বোর্ডিং। দেখি হোটেলের দোতলায় খুব মারামারি চলেছে। কাকে ধরে ম্যানেজার খুব মারধোর করছে। একেবারে বেদম প্রহার।

সোজা ওপরে উঠে গেলাম। তাড়াতাড়ি ম্যানেজারের হাতটা ধরে ফেললাম—মারছেন কেন?

ম্যানেজার বললে—মশাই, তিন টাকা বারো আনার খাবার খেয়েছে, এখন বলছেন একটা পয়সা পকেটে নেই—দেখুন তো, একে মেরে একেবারে খুন করে ফেলতে হয়—

বললাম—তা মারলে কি আপনার পয়সা উশুল হবে?

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পাওনা-পয়সা শোধ করে দিয়ে লোকটাকে বললাম—যা ভাগ এখান থেকে, পালা—

নিরীহ গোবেচারী ধরনের মানুষ। চেহারা দেখে মনে হয় অনেক দিন কিছু খায় নি। লোকটা আমার কথায় আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। মাথা নিচু করে বাইরে চলে গেল।

বাইরের রাস্তায় মোড়ের মাথায় আসতেই দেখি লোকটা একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁট লাল করে পান খাচ্ছে। আমাকে দেখে ফ্যা-ফ্যা করে হাসতে লাগলো—

—কেন মিছিমিছি পয়সাটা দিতে গেলেন স্যার? শুধু-মুধু আপনার ক'টা টাকা গচ্চা গেল—

আমি তো অবাক!

লোকটা আবার বললে—দেখতেন ও ব্যাটা কিচ্ছু করতো না, মেরে ধরে শেষকালে ছেড়ে দিত—আমি সব হোটেলেই ওই রকম করি—মেরে ধরে শেষকালে ছেড়ে দেয়—

আমি কিছু না বলে বাড়িতে এসে সোজা 'দেশ' অফিসে টেলিফোন করে দিলুম।

—কাল সকালে পিওন পাঠিয়ে দেবেন, আমার গল্প তৈরি।

সাগরবাবুর 'চিঠি নিয়ে পরের দিনই সকালে পিওন এসে গল্প

নিয়ে গেল। আর সেই হল সূত্রপাত। সেই ১৯৫১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী। আর তারপর থেকেই শুরু হলো আর এক জীবন, আর এক যন্ত্রণা। সেই ১৯৫১ সাল থেকে শুরু করে আজ ১৯৬২ পর্যন্ত সেই জীবন একভাবে এগিয়ে চলেছে। আজ আনন্দেরও শেষ নেই, যন্ত্রণারও শেষ নেই। কখনও মনে হয় এত আনন্দ বুঝি আমার সহ্য হবে না, আবার কখনও মনে হয় এত যন্ত্রণা বুঝি আর সইতে পারবো না। কিন্তু কোথা দিয়ে যে সব মাথা পেতে গ্রহণ করি। সত্যি, আমার গ্রহণ করার ক্ষমতারও যেন শেষ নেই। আমার পাওয়ারও যেন শেষ নেই। আমি যে আশাতীত পেয়েছি। জীবনকে আমি পেয়েও পেয়েছি আবার হারিয়েও পেয়েছি। আনন্দের মধ্যে দিয়েও পেয়েছি, যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েও পেয়েছি। এই যে আজ অন্তরের সঙ্গে বাইরের, আনন্দের সঙ্গে যন্ত্রণার, বিচার-শক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের সামঞ্জস্য করতে চেষ্টা করছি—সে তো সাহিত্যেরই দৌলতে।

আজ আমার জীবনে অন্তর মিলেছে, বাহির মিলেছে, সুখ মিলেছে, দুঃখও মিলেছে। শুধু যে জীবন পেয়েছি তাই-ই নয়, মৃত্যুও পেয়েছি। শুধু অসংখ্য বন্ধুই নয়, অসংখ্য শত্রুও পেয়েছি। তাই তো আমার জীবনে ত্যাগ আর ভোগ দুই-ই পবিত্র, লাভ আর ক্ষতি দুই-ই সার্থক। সমস্ত সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদ প্রশংসা-নিন্দার সার্থকতা আমার জীবনে নিটোল হয়ে একটি অখণ্ড প্রেমের পরিপূর্ণতায় এক হতে পেরেছে। প্রশংসা-নিন্দা সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদ সব কিছুই আমি আমার প্রাপ্য বলেই গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে প্রশংসা-নিন্দা! মনু বলেছেন—'সম্মানকে বিষের মতো মনে করবে, অপমানই অমৃত।' আর রবীন্দ্রনাথ?

থাক। নিজের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাম মুখে না আনাই ভাল। ওটা অহমিকা। কিন্তু তবু ভাবি সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে এই কুৎসা-কলহ-নিন্দা-প্রশংসা-স্তুতি-স্তাবকতা-পরশ্রীকাতরতা, এ কি একান্তই অপরিহার্য?

মম্

"মম্" প্রবন্ধটি "দেশ" সম্পাদকের অনুরোধে লিখিত। ১৩৫২ সালের ১৬ই পৌষ প্রবন্ধটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের কাছ থেকে যখন অনুরোধ আসে তখন "মম্" মৃত্যুশয্যায়। হাতে সময় নেই। সোমবার অনুরোধ এল আর শুক্রবারের মধ্যে লেখা তৈরী করে দিতে হবে। বিমল মিত্র আমাকে ফোনে জানালেন—"মম্ সম্পর্কে কিছু মাল-মশ্লা চাই"। বললাম, লাইব্রেরীতে আসুন—materials-এর অভাব হবে না। বিমলবাবু লাইব্রেরীতে আসতেই তাঁকে আমি পাঁচখানা বই-এর নাম দিলাম। তারপর আর চারদিন "মম্" সম্পর্কে কোন আলোচনাই হয় নি। পরবর্তী সপ্তাহে যখন "দেশ" বেরোল দেখলাম "মম্" ছাপা হয়েছে। এই ছোট্ট প্রবন্ধের মধ্যে "মম্"-এর জীবনের এমন কোন দিক নেই যা বিমলবাবু আলোচনা করেন নি। মনে মনে ভাবলাম এ বিমল মিত্রের পক্ষেই সম্ভব। সমারসেট মমের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব ও সমসাময়িক কালে সাহিত্যের প্রতি সাধারণ মানুষের ও সমালোচকদের মনোভাব লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এ প্রবন্ধে। "লেখা এমন এক প্রফেশন যার সঙ্গে আপস-রফা করা চলে না। লেখা আর না-লেখার মধ্যে কোনও মাঝামাঝি পথ খোলা নেই। লেখক মানে সেণ্ট পার্সেণ্ট লেখক। সংসারে লেখক ছাড়া আর কে আছে যে অমন স্বাধীন"—বিমল মিত্র "লেখা" ও "লেখক" সম্পর্কে এই ধারণাই মনেপ্রাণে পোষণ করেন এবং নিজের সাহিত্যকীতির দ্বারা তিনি তা প্রমাণ করেছেন। সমালোচকরা "মম্"কে বলতেন "Grand Old Man of Literature." একথা তাঁরা বলতেন "মম্"-এর সাহিত্যকীর্তির জন্যে নয়, বয়সের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে। তবে একথা সত্য যে "মম্" পাঠকদের আনন্দ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাই বলতে ইচ্ছে করে। "...We are fond of talking of those who have given us pleasure; not that we have anything important to say, but because the subject is pleasing :—(Goldsmith—The Life of Dr. Parnell.)

* * *

"In my twenties the critics said I was brutal,

In my thirties they said I was fippant,

In my forties they said I was cynical,
And in my fifties they said I was competent,
And then in my sixties they said I was superficial,
I have gone my own way, with a shrug of my shoulders
Following the path I have traced, trying with my work
To fill out the pattern of life that Ihave madefor Myself."

—William Somerset Maugham.

এককথায় সমারসেট মম্ নিজের সম্বন্ধে নিজেই একটা মূল্যায়ন করে নিয়েছিলেন। অন্তত তিনি জানতেন সমালোচকরা তাঁর সম্বন্ধে কী মত পোষণ করেন। যখন তাঁর প্রথম বই বেরোয় তখন তাঁর বয়েস তেইশ। সেই তেইশ বছর থেকে আশি বছর বয়েস পর্যন্ত অনবরত লিখে লিখে যখন খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সব কিছু হলো, এবং যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর নিজের জীবদ্দশায় অর্থাভাব হওয়ার আশঙ্কা চিরকালের মত দূর হয়েছে, তখন বুক ফুলিয়ে বলতে পারলেন, সমস্ত পৃথিবীর লোককে জানিয়ে দিলেন যে—আমি এখন স্বাধীন, আমি এখন আর কারো ধার ধারি না, পৃথিবী এখন জাহান্নমে যাক্, আমি এবার আমি।

লেখকের জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এই যে তাকে সারা জীবনই লিখতে হয়। একখানা ভালো বই লিখে থেমে গেলে চলে না। একখানা ভালো বইএর পরে আর একখানা ভালো বই লিখতে হয়। তার পরে আরো আরো ভালো বই। শুধু আরো ভালো বই-ই নয়, উত্তরোত্তর ভাল বই। সেই ভালোর চেয়ে আরও উত্তরোত্তর ভালোর সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একদিন লেখকের জীবন শেষ হয়। এবং শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কেউ তাকে রেহাই দেয় না।

মম্ মৃত্যুর আগে তাঁর নিজের সম্বন্ধে যা-কিছু কাগজ-পত্র নোট-বই সমস্ত নিজেই নষ্ট করে দিয়ে গেছেন। এবং তাঁর অপ্রকাশিত চিঠি-পত্রও যাতে ভবিষ্যতে প্রকাশিত না হয়, সে সম্বন্ধে আইনগত

ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। এ সংবাদ খবরের কাগজেই সবাই পড়েছেন।

অনুমান করি, এর একটা মাত্র কারণ অভিমান। সমসাময়িক সমালোচক ও সেই সব সমালোচকদের উত্তরপুরুষের তাঁর প্রতি দুর্জয় অবজ্ঞাই এই সিদ্ধান্তের আনুমানিক কারণ!

এই অবজ্ঞা কেন, তা জানতে গেলে একেবারে মম্-এর জীবনের গোড়ার কথা বলতে হবে।

যখন সমারসেট মম্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১৮৭৪, ২৫শে জানুয়ারী) তখনকার সাহিত্যরথীরা ছিলেন অন্য জাতের। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মত তাঁরা অতটা আদর্শভ্রষ্ট ছিলেন না। যে লর্ড ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে ইণ্ডিয়ার মত বিশাল বিত্তশালী এক ভূখণ্ড অধিকার করে স্বজাতির সম্পত্তি হাজারগুণে বর্ধিত করে দিয়েছিলেন, তিনি পরলোকগমন করেন ১৭৭৪ সালের ২২শে নভেম্বর। তার প্রায় একশো বছর পরে মম্ জন্মান। অর্থাৎ সেই একশো বছরের মধ্যে ইংরেজ জাতি শুধু যে রাজ্য অধিকার করে নিজের সম্পদ বাড়িয়েছে তাই নয়। নিজের উৎপন্ন পণ্য নিজের অধিকৃত কলোনীতে বিক্রি করেও হাজারগুণ মুনাফা লাভ করেছে। সেই কলোনীর ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-কুটিরশিল্প সমস্ত ধ্বংস করে সেখানে নিজের দেশজ পণ্যের আমদানী বাজারও প্রতিষ্ঠা করেছে। শিল্প-বিপ্লবের কল্যাণে তখন ইংলণ্ডে সমৃদ্ধির জোয়ার এসেছে। সেই জোয়ারে ইংলণ্ড যে শুধু বাইরে ম্যান্‌চেস্টারের কলে তৈরী ধুতি-শাড়ি পাঠিয়েছে তাই-ই নয়, ছাপাখানাও পাঠিয়েছে। অর্থাৎ ইংরিজী সাহিত্যের এক বিরাট মার্কেট গজিয়ে উঠেছে তখনকার ভারতবর্ষে, পাকিস্তানে, বর্মায়, সিলোনে আর আফ্রিকায়। তার ফলে ইংরিজী সাহিত্যিকদের পেশা বেশ রীতিমত ঈর্ষার পেশা হয়ে উঠেছে। সমাজে অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের মত সাহিত্য-জীবীদেরও সম্মান-প্রতিপত্তি প্রসার পেয়েছে। জর্জ ইলিয়ট আর কার্লাইল তখন ক্ষমতার শীর্ষস্থানে। টেনিসন আর ব্রাউনিং তখন সাহিত্যের আকাশে

জ্বল জ্বল করে জ্বলছেন। ম্যাথু আরনলড তখন সবেমাত্র লিখেছেন —'কালচার অ্যাণ্ড অ্যানারকি'। ওয়ালটার পেটারের ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রবন্ধটি তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। রাস্‌কিন তখন ইংলণ্ডকে ন্যায় আর সত্যের পথ দেখাবার জন্যে সশরীরে বিরাজ করছেন। আর কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব শেষ হতে তখন আর মাত্র সাতাশ বছর বাকি।

এ হেন যুগে যখন মম্‌ বড় হলেন, আত্মীয়-স্বজন বা শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর ভালোর জন্যে নানা রকম পেশার ব্যবস্থাপত্র দিলেন। আত্মীয়-স্বজন ব্যবস্থাপত্র দিয়েই খালাস। কিন্তু একজনের পক্ষে যা ভালো, আর একজনের পক্ষে তা ভালো না হতেও পারে। শেষকালে তাঁদের চাপে পড়ে তাঁকে ডাক্তারী পড়তে হলো। শুধু পড়া নয়, শেষ পর্যন্ত পাস করতেও হলো।

পৃথিবীর প্রত্যেক লেখকের জীবনের শুরুতেই এই রকম একটা-না-একটা বিভ্রাট ঘটেছে। পৃথিবীর কোনও লেখকের কোনও গার্জিয়ানই নিজের সন্তানের জন্যে লেখকের পেশা সমর্থন করেন নি। আর দশটা প্রফেশানের মত লেখাটা একটা সর্বজন-স্বীকৃত পেশা বলে কোনও দেশেই স্বীকৃতি পায় নি। তুমি লিখতে গিয়ে নিজের পেট চালাতে পারবে কি না সেইটেই যখন অনিশ্চিত, তখন ও-পথে না-যাওয়াই শ্রেয়। আর লিখতেই যদি হয় তো অবসর সময়ে লেখো না। চাকরি করেও তো লেখা যায়। যেমন অনেকেই করেছে এবং করছে। ডাক্তারি পাস করেছ, এখন প্র্যাক্‌টিস করো, আর ভোর রাত্রে চারটের সময় উঠে রোজ দু পাতা করে লেখো। ডাক্তারিও চলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে লেখাটাও। তার পরে যদি বোঝ ডাক্তারির চেয়ে লেখাতেই বেশি আয় হচ্ছে তখন ডাক্তারি ছেড়ে দিও। ছাড়তে এক মিনিটও লাগে না।

কিন্তু, না। সেদিন সেই তরুণ ডাক্তারটির মনে হয়েছিল লেখা এমন এক প্রফেশান যার সঙ্গে আপস-রফা করা চলে না। লেখা আর না-লেখার মধ্যে কোনও মাঝামাঝি পথ খোলা নেই। লেখক

মানে সেণ্ট পার্সেণ্ট লেখক। সংসারে লেখক ছাড়া আর কে আছে যে অমন স্বাধীন। সুতরাং এম-আর-সি-এস এবং এল-আর-সি-পি পাস করেও একদিন তিনি প্যারিসে গিয়ে লেখার পেশাই শুরু করলেন।

পরে এই সূত্রে একবার তিনি বলেছিলেন—অত তাড়াতাড়ি ডাক্তারি-পেশাটা ছেড়ে দেওয়াটা সেদিন সত্যিই আমার ভুল হয়েছিল।

তাঁর মতে যতদিন না লেখায় পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা হয় ততদিন একটা চাকরি নিয়ে চালিয়ে যাওয়া উচিত।

তিনি বলেছেন—অনেক উপন্যাস তখন লিখেছি যেগুলো না-লিখলেই ভালো হতো। যেগুলো আরো একটু ধৈর্য ধরে বেশি সময় নিয়ে লেখা উচিত ছিল। কিন্তু তখন অপেক্ষা করবার আর সময় নেই, টাকা উপায় করতে হবে। এই টাকা উপায়ের ভাবনাতেই সে-সময়ে অনেক ভাল প্লট তাড়াতাড়ি লিখে খারাপ করে ফেলেছি।

এই সূত্রে তিনি আরো বলেছেন—এখন বুঝতে পেরেছি তিরিশ চল্লিশ বছর বয়েসের আগে উপন্যাস লেখাই আমার ভুল হয়েছে। উপন্যাস বয়েসের ফলশ্রুতি। অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। বয়েস বেশি না হলে জীবনকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয় না। আমি সেই ভুলই করেছি—

সে এক অমানুষিক পরিশ্রমের এবং যন্ত্রণার জীবন। সেই প্যারিসের একটা ছোট ঘরে সাহিত্য-অনুশীলনের কাল। ইংলণ্ডে জন্মেও মম্ অল্প বয়েস থেকে যে ফরাসী দেশের সাহিত্যকৃতির ভক্ত তা তাঁর নিজের জবানবন্দীতেও আছে। আসলে ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন আর আমেরিকা এই তিনটে দেশই ছিল মম্-এর বাসভূমি। কিন্তু মনে প্রাণে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ। ব্রিটিশ হয়েও ফ্রান্সের প্রতি তাঁর এই অনুরাগ অকারণ নয়। ফরাসীদের কাছে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি তাদের জীবন-ব্রত। সাহিত্যের প্রতি ফরাসী সাহিত্যিকদের আসক্তি সর্বজনবিদিত। মম্-এর এটা ভালো লাগতো। কারণ

হাঁসের কাছে যেমন জল মম্-এর কাছে ছিল তেমনি সাহিত্য। সাহিত্যের জন্যে সব রকম কষ্ট স্বীকার করার মধ্যে মম্ আনন্দ পেতেন। সাহিত্যই ছিল তাঁর কাছে নিজের অস্তিত্ব।

সেদিন উপন্যাস দিয়েই শুরু হলো তাঁর সাহিত্য-জীবন। সমালোচকরা সে-উপন্যাসের বিশেষ নিন্দে করে নি, কিন্তু তেমন টাকা এল না। একটার পর একটা উপন্যাস লিখে চললেন। বই ছাপা হয়ে বাজারে বেরোল। সমালোচকরা প্রশংসা করলেন তাঁর Mrs Cradhock-কে। কিন্তু বিক্রি হয় না কেন?

১৯০৮ সালে Lady Frederick নাটক হয়ে অভিনীত হলো। তখন চৌত্রিশ বছর তাঁর বয়েস। তখন থেকেই শুরু হলো জনপ্রিয়তা। সে-জনপ্রিয়তা সেই যে শুরু হলো, [illegible] [illegible] তা আর থামে নি। শেষ পর্যন্ত তা বেড়ে বেড়ে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে। একটা সময় এল যখন চারটে থিয়েটারে একসঙ্গে তাঁর চারটে নাটক চলছে। মম্ দেখলেন তিনি শুধু জনপ্রিয়ই নন তাঁর নাম সকলের মুখে মুখে।

মম্ স্বীকার করেছেন যে প্রথমে তিনি টাকার জন্যেই লিখেছেন। টাকা জমিয়ে বড়লোক হবার জন্যে নয়। টাকার বিনিময়ে তিনি নিজের স্বাধীনতা কিনতে চেয়েছিলেন, এবং তা পুরোপুরি পেয়েছিলেন। আর টাকা পেয়েছিলেন বলেই তিনি পৃথিবীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলতে পেরেছিলেন—তুমি জাহান্নামে যাও।

আর টাকা পেয়েছিলেন বলেই তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে পেরেছেন। তিনি বেড়াতে গিয়ে বরাবর কিছু কিছু নোট লিখে রেখেছেন তাঁর খাতায়। যাদের তিনি দেখলেন তাঁরা কেমন, কেমন করে তারা কথা বলে, কেমন তাদের ব্যবহার। এসব জিনিস তিনি তাঁর নোট বইতে লিখে রাখতেন বটে, কিন্তু সব সময়ে ব্যবহার করা হয়ে ওঠে নি। Lord Mountdrago গল্পটা তিরিশ বছর ধরে এমনি করে তাঁর নোট খাতায় লেখা ছিল। কিন্তু কিছুতেই সেটাকে আর গল্পে রূপ দিতে পারেন নি। যতবার চেষ্টা করেছেন,

ততবার থেমে গিয়েছেন। শেষকালে অনেক চেষ্টার পর যখন সেটা শেষ পর্যন্ত লেখা হলো তখন বহু গল্প-সংগ্রহে সেটা ছাপা হয়েছে। তেমনি The Colonel's Lady গল্পটা নোটখাতায় চল্লিশ বছর ধরে পড়েছিল। হঠাৎ একদিন নোটখাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে যখন নজরে পড়লো, সেটা নিয়ে গল্প লিখতে বসলেন। তখন এল।

আঠারো বছর বয়েস থেকে মম্ এই নোটবই রাখার অভ্যেস করেছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে-অভ্যেস রেখেছিলেন তিনি। জীবনে তিনি লেখক হতেই চেয়েছিলেন, এবং প্রচুর টাকা উপায় করতেও চেয়েছিলেন। দুটোই তিনি পেয়ে গেছেন। এবং দুটোই প্রচুর পরিমাণে পেয়ে গেছেন।

মম্-এর এই অসামান্য অর্থ-প্রাচুর্য সম্বন্ধে এত গবেষণা হয়েছে যে, তা একটা ছোট প্রবন্ধে শেষ করা যায় না। তাঁর এই সাফল্যের জন্যে কেউ তাঁকে ঈর্ষা করেছে, কেউ অস্বীকার করেছে, কেউ ছোট করেছে, কেউ ঘৃণা করেছে, কেউ আবার তাঁকে প্রশংসাও করেছে। যখন তাঁর বই বিক্রি হতো না, তখন অনেক সমালোচক তাঁকে উৎসাহ-বাণী যুগিয়েছে, মাঝে মাঝে প্রতিভা বলেও স্বীকার করেছে; বড় বড় কাগজে তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসাও বেরিয়েছে। কিন্তু যেদিন থেকে তাঁর সাফল্য এল সেদিন থেকে সেই সব সমালোচকদের উত্তরপুরুষরা নীরব। তারা তাঁর বই পড়ে, উপভোগ করে, কিন্তু কৃপা বর্ষণ করবার বেলায় বড় কৃপণ হয়ে যায়।

সমালোচকদের ব্যবহারে মনে মনে মম্ সারাজীবন বড় কষ্ট পেয়েছেন। তাঁর নিজের ধারণা সমালোচকরা তাঁর ওপর একটু অবিচার করেছে। কিন্তু সমালোচকদের কৃপণতার তিনি মানে বুঝতেন। মম্-এর আর্থিক সাফল্য তাদের চোখে ভালো না-লাগবারই কথা। তবু তাদের রূঢ় সমালোচনায় তাঁর তেমন কিছু এসে যেত না। কারণ যারা তাঁকে অর্থ যোগাতো তারা তাঁর অগণিত পাঠক-পাঠিকা এবং তাঁর বই-এর ক্রেতা। তাই তাদের কাছ থেকে তিনি যে অসংখ্য

চিঠিপত্র পেতেন তাতে তাঁর অনুরাগীদের মনের পরিচয় তিনি রোজই পেতেন। তাদের ভালো-লাগার অকৃপণ ঔদার্য তার খেসারৎ যোগাতো। কিন্তু একবার 'Time' ম্যাগাজিনে কার্ল স্যাণ্ড্‌বার্গ যখন এক প্রবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে অকারণে এক নিষ্ঠুর মন্তব্য করলেন তখন তিনি সত্যিই বিচলিত হয়েছিলেন। কারণ কার্ল স্যাণ্ড্‌বার্গের মত কবি সাধারণত আগে কখনও কারোর ওপর অমন অসদয় হন নি।

মম্-এর এক বন্ধু ব্যাপারটা তাঁর গোচরে আনাতে তিনি বললেন —এ হিংসে, হিংসে ছাড়া আর কিছু নয়—

অথচ অন্য লেখক সম্বন্ধে মম্ কখনও কোন অপ্রিয় কথা বলেন নি। তিনি বরাবর বলে গেছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেন চারজন। টলস্টয়, ডস্টয়ভ্‌স্কি, ডিকেন্স আর ব্যালজাক। তবে তাঁর মতে তাঁরা চারজনই হলেন ক্রাফ্‌টস্‌ম্যান হিসেবে কাঁচা। কিন্তু মানুষকে তাঁরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা খাঁটি। তাই তাঁরা মহৎ। মম্ নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি মহৎ লেখক নন, তিনি শুধু ভাল গল্প-বলিয়ে। সমালোচকরা তাঁর সম্বন্ধে বলতো —'সুপার্ব স্টোরি-টেলার'। তাঁদের ওপর অভিমান করে তিনিও তাই বলতেন—'হ্যাঁ, আমি স্টোরি-টেলার ছাড়া আর কিছু নই।'

আসলে কিন্তু মম্-এর মনের কথা তা নয়।

যেদিন থেকে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করলে, সেদিন থেকে তিনিও তাদের নস্যাৎ করতে লাগলেন। কিন্তু যারা মম্‌কে কাছ থেকে জানে তাদের কাছে মম্ তাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিজীবীর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, বেশি বিদ্বান। তিনি এমন এমন বই পড়ে আনন্দ পেতেন যা বহু অধ্যাপকই পড়ে বুঝতে পারেন না। তাঁর লেখা পড়েই বোঝা যায় গুরু-গম্ভীর বিষয়কে তিনি কত সহজ সরল করে প্রকাশ করেন। জীবনের মানে খোঁজবার জন্যে তাঁর আপ্রাণ চেষ্টার কথা তাঁর পাঠকদের অজ্ঞাত নেই। সাহিত্যের যারা অধ্যাপক তাদের অজ্ঞতা দেখে তিনি অনেক সময় অবাক হতেন। ইংরাজী, ফরাসী বা আমেরিকান

সাহিত্য সম্বন্ধে সাহিত্যের অধ্যাপকরা যা না জানেন, মম্ তার সম্বন্ধে অনেক বেশি জানতেন। মজা হল এই যে, পাণ্ডিত্যের ভারে তিনি কখনও পীড়িত হন নি, যা সাধারণত হয়ে থাকে। জ্ঞানটা গভীর হলে তখন আর তার বহিঃপ্রকাশের ছটফটানি থাকে না। বছরের পর বছর মিশেও কারো জানবার উপায় ছিল না যে তিনি অনেক কিছু জানেন। অনেক জানা তাঁর কাছে কখনও ভার হয়ে বোঝা হয়ে ওঠে নি।

সমালোচকরা তাঁকে যতই নিন্দে করতে থাকুন, তাঁদের মুখে ছাই দিয়ে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর জাগতিক সাফল্য কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। তিনি ঠিক করলেন সমালোচকদের নস্যাৎ করবার জন্যে তাঁকে প্রচুর লিখতে হবে, এবং লিখে লিখে নিন্দুকদের ডুবিয়ে দিতে হবে। এবং তার জন্যে চাই দীর্ঘ পরমায়ু। বেশি দিন বেঁচে থেকে তিনি তাদের হারিয়ে দেবেন। প্রশংসা যখন তারা করবেই না, তখন বেশি লিখে আর বেশি দিন বেঁচে থেকে তাদের হারিয়ে দাও। তারপর যখন তুমি বুড়ো হবে, চুল পাকবে, দাঁত নড়বে, চোখে ছানি পড়বে, তখন তো অন্তত তারা বলবে—'Grand Old Man of Literature.'

তা হলোও তাই।

কিন্তু যে শিক্ষা একদিন তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠিয়ে দেবে তার শিক্ষানবিশী তাঁকে ছোট বয়েস থেকেই করতে হয়েছে। যখন তাঁর বয়েস কুড়ি, যখন ডাক্তারি পড়ছেন, সেই সময়ে একবার তিনি ইটালী গিয়েছিলেন। সেই তাঁর প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। হেঁটে হেঁটে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন সেখানে যেখানে পাইন-গাছের তলায় বসে একদিন শেলী সোফক্লিস্ পড়তেন। পরের বছরে গেলেন ফ্লোরেন্সে। সেখানে গিয়ে দান্তে পড়লেন ল্যাণ্ড-লেডির কন্যার সঙ্গে। রাস্কিন যেখানে যেখানে প্রশংসা করেছেন, তেমনি করেই সেই জায়গাগুলোর প্রশংসা করলেন। এ সব করার উদ্দেশ্যই ছিল নিজের ডাক্তারি পড়ার লজ্জা ঢাকা। তিনি যে ডাক্তারি পড়েন এ লজ্জা ঢাকবার

জন্যেই বাইরের লোকের সঙ্গে তিনি সাহিত্য আলোচনা করতেন। ডাক্তারি পাস করার পরে যখন সাহিত্যের শিক্ষানবিশী করছেন তখনও দারিদ্র্যের সঙ্গে দিনরাত লড়াই করে তিনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। কবে খ্যাতি হবে, কবে অর্থ হবে, কবে স্বাধীন হবেন। প্রথম দশ বছর এই অমানুষিক সংগ্রাম করার জন্যে তাঁকে অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে চালাতে হয়েছে। কারণ প্রথম দিকের বইতে তাঁর অতি সামান্য অর্থই উপার্জন হয়েছিল।

শেষকালে অনেকে তাঁকে তাঁর এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার জন্যে নানা প্রশ্ন করেছে। কেমন করে তিনি এত জনপ্রিয় হলেন।

অথচ তিনি দিনে তিন ঘণ্টার বেশি পরিশ্রম কখনও করতেন না। সকাল ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত কাটতো তাঁর লেখার ঘরে। তার মধ্যে সবটুকুই লেখা নয়, পড়া আছে, প্রুফ দেখা আছে। তারপর সারাদিন বেড়ানো, গল্প করা, সাঁতার কাটা, খাওয়া বিশ্রাম।

একজন বন্ধু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—মাত্র তিন ঘণ্টা তিনি কেন লেখেন ?

মম্ বলেছিলেন—ডারউইন একজন প্রতিভাধর মানুষ, তিনিই যখন তিন ঘণ্টার বেশি পরিশ্রম করেন নি, আমি সামান্য মানুষ হয়ে তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে যাবো কেন ?

'রেন্' (বৃষ্টি) বলে একটা বিখ্যাত গল্প আছে মম্-এর। খুব বড় গল্পও নয়, আবার খুব ছোটও নয়। ওই একটা গল্প মম্‌কে যে-খ্যাতি এবং অর্থ দিয়েছে, তাঁর অনেক উপন্যাস থেকেও তিনি তা পান নি। গল্পটা লেখার পর প্রায় দশটি পত্রিকা থেকে তা ফেরত এসেছিল। ছাপার অযোগ্য। কিন্তু যখন ছাপা হলো তখন বাহবা পড়ে গিয়েছিল পাঠকদের মহলে।

নাট্যকার হিসেবে মম্-এর খ্যাতি এসেছিল প্রধানত এই 'বৃষ্টি' গল্পটা থেকেই। অথচ একমাত্র এ-গল্পটিরই নাট্যরূপ তিনি নিজে দেন নি। এর নাট্যরূপ হওয়ার একটা বিচিত্র ইতিহাসও আছে।

তখন মম্ গিয়েছেন হলিউডে। যে হোটেলে তিনি উঠেছিলেন,

সেই হোটেলেই তাঁর ঘরের সামনের ঘরে সেদিন উঠেছেন মিস্টার কলটন। একদিন রাত্রে কলটনের ঘুম আসছে না। মম্-এর ঘরের দরজায় এসে তিনি ধাক্কা দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—একটা বই-টই কিছু আছে তোমার কাছে? আমার ঘুম আসছে না—

বই? মম্-এর কাছেও কোনও বই নেই তখন। কিন্তু সবেমাত্র সেদিনই তাঁর নতুন বইএর প্রুফ এসে পৌঁছিয়েছে। সেই প্রুফই তিনি দিলেন কলটনকে। গল্প-সংগ্রহের বই। তারই একটা গল্পের নাম 'মিস টমসন'।

ভোর বেলা ডাইনিং-রুমে ছ'জন লেখকে দেখা। মম্ দেখলেন কলটনের চোখ ছুটো লাল জবাফুলের মত।

—কী হলো? চোখ লাল কেন?

কলটন বললেন—কাল সারারাত ঘুম আসে নি। তোমার 'মিস টমসন' গল্পটা পড়ার পর মনে হয়েছে, ও গল্পটা নিয়ে খুব ভালো একটা নাটক হয়।

—তাহলে লেখো নাটক। ও-গল্পটা তোমাকেই দিলাম।

বলে নিজের হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন কলটনের সঙ্গে।

যখন বই ছাপা হয়ে বেরোল, অন্য নাট্যকারদেরও দৃষ্টি পড়লো গল্পটার ওপর।

একজন মম্-এর এজেন্টের কাছে এসে 'মিস টমসন' গল্পটার জন্যে সাত হাজার ডলার দিতে চাইলেন শুধু তার নাট্যরূপের জন্যে। খবরটা কলটনের কানে যেতেই তিনি আঙুল কামড়াতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে কোনও চুক্তিও করেন নি, শুধু মুখের কথায় সম্মতি জানিয়েছেন। মম্ তখন ইংলণ্ডে। এজেন্ট মম্‌কে সাত হাজার ডলারের কথা জানালো। উত্তরে মম্ টেলিগ্রাফ করে দিলেন কলটনকে—মাই হ্যাণ্ডশেক স্টিল স্ট্যাণ্ডস—

আর এর ফলেই সৃষ্টি হল বিখ্যাত নাটক 'রেন'—

মম্ বলেছেন—সাক্‌সেসই লেখকের চরম শত্রু।

যখন লেখকের জীবনে সাক্‌সেস আসে তখনই শুরু হয় বিভ্রাট।

এ বিভ্রাট তাঁর বন্ধু আরনলড বেনেটের বেলায় ঘটেছে, মাইকেল আরলেনের বেলায় ঘটেছে। তাঁর সমসাময়িক যত লেখক সকলের জীবনেই সাক্‌সেস বিপর্যয় ঘটিয়ে গিয়েছে। মিসেস ভার্জিনিয়া উলফ, ডি-এচ-লরেন্স, জেমস জয়েস, হিউ ওয়ালপোল, আরনলড বেনেট—সকলেই এই বিপর্যয়ের সাক্ষী! কিন্তু মম্ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমালোচক ও সাহিত্যিক-বন্ধুদের সঙ্গ থেকে দূরে ছিলেন। তিনি চাইতেন স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতাই তিনি আজীবন ভোগ করে গেছেন। এ দিক থেকে তাঁর সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে স্যামুয়েল বাটলারকে। স্যামুয়েল বাটলার "ওয়ে অব অল ফ্লেশ" এর লেখক। সে-বইকে ইংরেজী সাহিত্যের একশোটি ক্লাসিকের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি দেখে গেছেন তাঁর বই বিক্রি হয় না। তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এই দেখে যে, লোক তাঁর বই পড়লো না, তাঁর কথা শুনলো না। কিন্তু তবু তিনি হতাশ হন নি। তবু তিনি তাঁর বই-এর ভালো সমালোচনা লেখাবার জন্য সম্পাদকদের খোশামোদ করেন নি, কোনও সাহিত্যিক-গ্রুপের সঙ্গে দহরম-মহরম করেন নি! কারো সঙ্গে আপোস করেন নি। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন —"Independence is essential for permanent value of literature."

মম্‌ও তাই। মম্‌ও দীর্ঘ-জীবন কাটিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন একানব্বুই বছর বয়েসে। কিন্তু জীবনে তিনি চিরকাল ছিলেন নিঃসঙ্গ। মাত্র কয়েক বছরের জন্যে বিবাহিত জীবন-যাপন করলেও, সে-বিবাহ বিচ্ছেদে সমাপ্তি হবার পর থেকে তাঁর জীবন আগাগোড়া স্ত্রীলোক-সংসর্গ বর্জিত। শুধু বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, লিখেছেন, প্রুফ দেখেছেন, ব্রিজ খেলেছেন, আর অর্থ উপার্জন করেছেন। স্যামুয়েল বাটলারের সঙ্গে তাঁর একমাত্র তফাত এই যে, তাঁর বই তাঁর জীবদ্দশায় কেউ পড়ে নি, পরে পড়েছে, আর মম্ জীবদ্দশাতেই দেখে গেলেন যে পাঠক-পাঠিকা তাঁর বই বেরোবার

সঙ্গে সঙ্গে শুধু পড়েছে নয়, গিলেছে। স্যামুয়েল বাটলারের যেমন কোনও সাহিত্যিক বন্ধু ছিল না, মম্‌-এরও তাই। একমাত্র প্রথম জীবনে আরনলড বেনেট এবং পরবর্তীকালে এচ-জি-ওয়েলস ছাড়া তাঁর কোনও সাহিত্যিক বন্ধুই ছিল না। অসাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি। যেমন হিজ্‌ হাইনেস্‌ দি আগা খাঁ, ডিউক-অব-উইণ্ডসর, স্যার উইনস্টন চার্চিল, এমনি আরো কয়েকজন।

মম্‌-এর সাহিত্য-কৃতি সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলে গেছেন—আমার মৃত্যুর পর হয়ত কোনও বই-ই টিঁকবে না, যদি একটা বই টিঁকে থাকে তো সেখানা 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ'। কারণ গড়ে এখনও বছরে চব্বিশ হাজার কপি বিক্রি হয় সেখানা। তবে খুব বেশি দিন না-ও টিঁকতে পারে, বড় জোর আমার মৃত্যুর দশ বছর পর পর্যন্ত, তার পরে আর আমার বই বিক্রি হবে না—

নিজেকেও তিনি কোনওদিন বড় সাহিত্যিক বলে বিচার করেন নি। তিনি বলেছেন—আমি মানুষের দেহের চামড়া ভেদ করে তাদের মনের ভেতরটা হয়ত দেখতে পাই, কিন্তু টলস্টয়, ডস্টয়ভ্‌স্কি, ব্যালজাক বা ডিকেন্স, তাঁরা মহৎ লেখক, তাঁদের দৃষ্টি ইটের দেওয়াল ভেদ করতে পারতো—

বহু লোকের মতে মম্‌ দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক। মম্‌ সম্বন্ধে বহু লোকের বহু অভিযোগ আছে। অনেক বলেন—তিনি নাটকীয়তা সৃষ্টি করবার জন্যে একটা 'ফরমুলা'র আশ্রয় নেন। একই আঙ্গিক বহুবার ব্যবহার করার জন্যেই বোধ হয় এই 'ফরমুলা'র কথাটা উঠেছে। এই 'ফরমুলা'র কথা শুনলে মম্‌ নিজে বড় কষ্ট পেতেন মনে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক হওয়ার কারণ বোধ হয় এই যে তিনি কলা-কুশলী হিসেবে উত্তরোত্তর যত উন্নতি করেছেন, জীবন সম্বন্ধে তিনি তত প্রাজ্ঞ হন নি। প্রজ্ঞা উপলব্ধি থেকে আসে, বই পড়ায় আসে না। সেই প্রজ্ঞা থেকে তাঁর রচনা বঞ্চিত। মৃত্যুর দিন তাঁর বয়েস হয়েছিল একানব্বুই, কিন্তু প্রজ্ঞার দিক থেকে তিনি ছিলেন পঁচিশ বছরের ছেলেমানুষ।

১৯১৫ সালে তাঁর উপন্যাস 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ' প্রকাশিত হয়। সকলেরই অভিযোগ তিনি ওই রকম বই আর একখানাও লিখলেন না কেন। এর উত্তর আজ আর পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি নিজেও কখনও এর উত্তর দিয়ে যান নি। তিনি সারাজীবন ধরে নিজের লেখাকে সুখপাঠ্য করতে চেয়েছেন, এবং সার্থকভাবে তা করতে পেরেছেন। পৃথিবীর বহু প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস সুখপাঠ্য নয়, আবার অনেক সময় তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসও পরম সুখপাঠ্য। সুখপাঠ্যতা দিয়ে উপন্যাসের অনেক দোষ-ক্রটি ঢাকা যায়। কিন্তু সুখপাঠ্যতাই উপন্যাসের অপরিহার্য গুণ নয়। সুখপাঠ্যতা বেশির ভাগ সময়েই মরীচিকার মত পাঠককে পাতার পর পাতা উল্টে যেতে প্রলুব্ধ করে। পাঠক এই আশা নিয়ে পড়ে যায় যে শেষের পরিচ্ছেদে পেঁীছে তার আশ মিটবে।

মম্ সুখপাঠ্য বলেই পাঠক সমাজে এত জনপ্রিয়। কিন্তু যখন দেখি সুখপাঠ্য হওয়া সত্ত্বেও অনেক লেখক জনপ্রিয় নন তখন খটকা লাগে। তবে কি মম্-এর লেখায় সুখপাঠ্যতা ছাড়া আরো কিছু বিশেষ গুণ আছে? যদি থাকে তবে কী সে গুণ?

বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই মম্-এর জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু যাঁরা কাফ্‌কা পড়ে আনন্দ পান, তাঁরাও মম্ পড়েন। যাঁরা সেক্স্‌পীয়র, মিলটন, ডিকেন্স, টলস্টয় পড়েন, এবং পড়ে তা ভাল লাগে, তাঁরাও মম্-এর বই পেলেই তার মধ্যে ডুবে যান। ক্যামু বা সার্ত্রে'র বই পড়ে সবাই তার প্রকাশ্যে আলোচনা করেন, কিন্তু মম্-এর বেলায় যাঁরা তাঁর বই মন দিয়ে পড়েন এবং তা পড়তে যাঁদের ভালো লাগে তাঁরা প্রকাশ্যে তার আলোচনা করেন না। বাথরুমে গিয়ে লুকিয়ে ল্যাংড়া আম খেয়ে, তারপর রুমালে মুখ মুছে বাইরে বেরিয়ে এসে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার মত।

'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট' পত্রিকায় একবার হেনরি জেমস একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম—"আওয়ার ইয়ংগার নভেলিস্টস।" তাতে আটজন ঔপন্যাসিকের সম্বন্ধে আলোচনা

ছিল। সবাই মম্‌-এর সমসাময়িক। মম্‌-এর চেয়েও নিকৃষ্ট লেখক হিউ ওয়ালপোলের উপন্যাসের আলোচনা তাতে ছিল সাড়ম্বরে। কিন্তু মম্‌-এর নাম সেই তালিকা থেকে বাদ গিয়েছিল। পাছে মম্‌-এর নাম উল্লেখ করলে তাঁকে সম্মান দেখানো হয়ে যায়।

মম্‌-এর অর্থ-উপার্জন প্রসঙ্গ একটা কিম্বদন্তী হয়ে আছে। তাঁর বিলাসিতা সম্বন্ধেও তাই। হিজ হাইনেস দি আগা খান, স্যার উইনস্টন চার্চিল, কিম্বা ডিউক অব উইণ্ডসরের মত ব্যক্তিত্ব যাঁর প্রাসাদে ডিনার খেয়ে বন্ধুত্ব-সুখ অনুভব করতেন তাঁকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করার মধ্যে সাহিত্য বিচার থাক আর না থাক, হীনমন্যতা যে আছে সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। অথচ সাধারণ পাঠকের চরম শ্রদ্ধার আসন পেয়েও তিনি নিজে ভিসা অফিসে গিয়ে কিউতে দাঁড়াতে লজ্জাবোধ করতেন না। যদিও জানতেন যে অফিসের কর্তৃপক্ষের কানে যদি একবার যায় যে মম্‌ লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন তো তাঁদের বড়কর্তা নিজেই দৌড়তে দৌড়তে এসে তাঁকে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে বসিয়ে তাঁর কাজটা করে দিতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যাবেন।

শেষ জীবনে যখন মম্‌ লেখা ছেড়ে দিলেন তখন নানা পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা হলো—"Grand Old Man of Literature." যেটা তিনি বহু বছর আগে কল্পনা করেছিলেন, শেষ জীবনে সেইটেই সত্যে পরিণত হলো। বেশি দিন বেঁচে থাকার তো ওই সুখ। যার গোড়া দেখেছেন তার শেষটাও দেখতে পেলেন। সমালোচকরা তাঁর সাহিত্যের সম্মান দিলে না, তাঁর বয়েসের সম্মান দিলে। এই দুঃখ নিয়েই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

শেষের দিকে একদিন বিখ্যাত "লাইফ" পত্রিকার তরফ থেকে একজন ক্যামেরাম্যান এল। তারা তাঁর বিভিন্ন ধরনের ছবি তুলে নিয়ে গেল। কিন্তু পত্রিকায় অনেক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কোনও ছবি ছাপা হলো না।

একজন বন্ধু তখন তাঁর বাড়িতে হাজির ছিলেন। একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন—সেদিন ওরা আপনার অতগুলো ছবি তুলে নিয়ে গেল, সে তো এখনও ছাপা হলো না—

মম্ হাসলেন। বললেন—আমার মরার পর বোধ হয় ছাপবে, তখন হয়ত ছবিগুলোর দাম বাড়বে—

পাঁচকড়ি দে

"বঙ্কিমচন্দ্রের কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে সকল অগণিত সাহিত্য-সেবকের সাধনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ, কালের পরিবর্তনে তাঁদের অনেকের পরিচয় বর্তমান কালের কাছে অস্পষ্ট; বিদ্যার বা দেশচর্চার নানা ক্ষেত্রে অনেকের কীর্তি সাহিত্যসেবকরূপে তাঁদের পরিচয়কে ম্লান করেছে। অথচ তাঁদের সাহিত্যচর্চার বিবরণ ও জীবনকথা সমাদরে রক্ষার যোগ্য।" দেশ-পত্রিকা "এইরকম সাহিত্যসেবীদের সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের বৃত্তির বিবরণ ও জীবনকথা" ১৩৫৩ সালের দেশ—সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশ করেন। ঔপন্যাসিক বিমল মিত্রকে অনুরোধ জানানো হয় পাঁচকড়ি দের সাহিত্যিক জীবন সম্পর্কে লিখতে। প্রবন্ধটি শুধুমাত্র পাঁচকড়ি দের জীবনকথায় পূর্ণ নয়। বিশ্বসাহিত্যে ডিটেকটিভ নভেলের স্থান কোথায় তারও মূল্যায়ন করেছেন লেখক এই প্রবন্ধে। পাঁচকড়ি দে ডিটেকটিভ উপন্যাসের রচয়িতা আর তাঁরই সম্পর্কে লেখবার ভার পড়েছিল বিমল মিত্রের ওপর, যিনি জীবনে কোন দিন ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়েন নি—পাঁচকড়ি দের উপন্যাস তো নয়ই। 'মম্' লেখার সময় কিছু বই পত্র দিয়েছিলাম। এবারও অনুরোধ এল কিছু বইপত্র যোগাড় করে রাখার জন্যে। আমি পাঁচকড়ি দের লেখা সমস্ত উপন্যাস ও ইংরেজীতে লেখা ডিটেকটিভ উপন্যাস সম্পর্কে খানকতক বই বিমলবাবুকে দিয়েছিলাম। কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করলাম বিমলবাবু নিয়মিত ভাবে দিনে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা করে বইগুলো মনোযোগের সঙ্গে পড়ছেন। এক দিন হঠাৎ বললেন, "লেখাটা কাল সাগরবাবুকে দিয়ে এসেছি।" জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন হলো?"—উত্তরে তিনি বললেন, "লিখে আনন্দ পেলাম না।"

* * * *

আমাদের ছোটবেলাতে ছোট ছেলে-মেয়েদের কোনও রকম গল্প-উপন্যাস পড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল বলে পাঁচকড়ি দে'র কোনও বই আমাদের হাতে পৌঁছায় নি। তবে তাঁর নামটা কানে এসেছিল!

আর সত্যি কথা বলতে কী পাঁচকড়ি দে তো দূরের কথা তখনকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র প্রভাতকুমারও ছিলেন আমাদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়। তখনকার দিনে গুরুজনদের চোখে উপন্যাস

মানেই ছিল উপন্যাস, চরিত্র খারাপ করার অস্ত্র। তা সে উপন্যাসের লেখক রবীন্দ্রনাথই হোন, আর পাঁচকড়ি দে'ই হোন।

পাড়ার যারা দুঃসাহসী ছেলে তারা অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে সব বই-ই পড়তো। লাইব্রেরীতে নিয়ম ছিল যাদের বয়েস ষোল বছরের কম তাদের হাতে কিছুতেই কোনও উপন্যাস দেওয়া হবে না।

রাখহরি ছিল আমাদের পাড়ার সেই রকম একটি দুঃসাহসী ছেলে। ক্লাস ফাইভের পর লেখাপড়ার দফা রফা করে বাবার মুদি-খানায় বসতো। আর দোকানে বসে বসে খদ্দেরদের সেবা না করে উপন্যাসের সেবা করতো। তার বয়েস তখন প্রায় উনিশ-কুড়ির কোঠায়।

একদিন তাকেই গিয়ে ধরলাম। বললাম—রাখহরি, তোমায় একটা কাজ করতে হবে ভাই—

মুখ তুলে রাখহরি বললে—কী কাজ বল্ তুই।

বললাম—তুমি তো লাইব্রেরীর মেম্বর, আমার জন্যে একটা নভেল আনতে পারবে লাইব্রেরী থেকে? আমি একদিন পড়েই আবার ফিরিয়ে দেব তোমাকে—

—কী বই?

বললাম—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন'—

রাখহরি প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল নামটা শুনে। জিজ্ঞেস করলে—কী নাম বল্‌লি?

আমি নামটা আবার বললাম। তবু রাখহরি ভালো করে বুঝতে পারলে না। বললে—সেও খুনখারাপির গপ্‌পো লেখে? আমি তো কই নাম শুনি নি?

আমি বুঝিয়ে বলতে রাখহরি খুব উৎসাহিত হলো। একটা নতুন লেখকের নাম শুনে আশ্বস্তও হলো। পাঁচকড়ি দে'র বই পড়ে পড়ে তখন তার প্রায় মুখস্থ হয়ে যাবার অবস্থা। বিকেল পাঁচটার সময় লাইব্রেরীর দরজা খোলে। আমি বার বার শরৎচন্দ্রের

আর 'চরিত্রহীন' বইটার নাম মনে করিয়ে দিয়েছি। রাখহরি লাইব্রেরীতে ঢুকলো, আর আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম একটা গাছের আড়ালে।

রাখহরি ভেতরে ঢুকেই লাইব্রেরীয়ানকে বললে—শশধর চক্কোত্তির 'উন্মাদিনী' বইটা দিন তো—

লাইব্রেরীয়ান মশাই ত অবাক। যে-মেম্বর বরাবর পাঁচকড়ি দে'র উপন্যাস পড়ে সে আবার হঠাৎ এ কোন্ লেখকের নাম করছে।

রাখহরি লাইব্রেরীর মাসিক চার আনা চাঁদা দেওয়া পাকা মেম্বর। তারও অধিকার আছে সব পড়বার।

বললে—কেন, বই দেবেন না কেন? আমার তো বয়েস ষোল পেরিয়ে গেছে—

লাইব্রেরীয়ান বললেন—শশধর চক্কোত্তি বলে কেউ লেখেন না, 'উন্মাদিনী' বলে কোন বইও নেই—

—নেই মানে? রাখহরির গলা তখন শুদ্ধ নিখাদে গিয়ে ঠেকেছে।—নেই মানে কী? আপনি ভাবছেন আমি কিছু জানি না? যতবার আপনার কাছে ডিটেক্‌টিভ বই চেয়েছি, ততবার কেবল 'পাঁচকড়ি দে' ঠেকিয়ে দিয়েছেন। কেন, শশধর চক্কোত্তিও ডিটেকটিভ বই লিখছেন তা তো আপনি ঘুণাক্ষরেও বলেন নি মশাই। পেয়ারের লোকদের জন্যে বুঝি লুকিয়ে রেখেছেন? আমি কিন্তু সে-বই না নিয়ে আজ আর নড়ছি নে—

লাইব্রেরীয়ান বললেন—তা তুমি তো পাঁচকড়ি দে'র পাঠক, হঠাৎ শশধর চক্রবর্তী বলতে একেবারে ক্ষেপে উঠলে কেন? পাঁচকড়ি দে'র বই দিচ্ছি, নিয়ে যাও না!

রাখহরি বললে—কেন নেব মশাই পাঁচকড়ি দে? এবার শশধর চক্কোত্তির 'উন্মাদিনী'ই নেব আমি, দিতেই হবে, না দিলে আমি শুনছি নে—

রীতিমত ঝগড়া বেধে গেল সেদিন সেই লাইব্রেরী-ঘরের ভেতরে। রাখহরি কিছুতেই ছাড়বে না, আর লাইব্রেরীয়ানও নাচার। শশধর চক্রবর্তী বলে কোনও লেখক থাকলে তো তার বই দেবেন।

শেষকালে রাখহরি রেগে গেল। হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার। বললে—আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এখ্‌খুনি জিজ্ঞেস করে আসছি শশধর চক্কোত্তি বলে কেউ লেখে কিনা—আমি এখ্‌খুনি জিজ্ঞেস করে আসছি—

তখন লাইব্রেরীয়ানের সন্দেহ হলো রাখহরির পেছনে নিশ্চয়ই কেউ আছে, যে এই দুর্মতি জুগিয়েছে!

আমি এ-সব কিছুই জানি না। আমি তখন নিরাপদ দূরত্বে নিজের অস্তিত্ব গোপন করে আছি।

হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে রাখহরি এসে হাজির। বললে—কী রে, শশধর চক্কোত্তির 'উন্মাদিনী' তো নেই বলছে, তুই কী ভুল নাম বললি?

আমি বললাম—শশধর চক্রবর্তী বলতে গেলি কেন? তোকে এত করে বলে দিলুম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন'—

কথা আর শেষ হলো না। ওদিকে লাইব্রেরীয়ান নিখিলবাবু একেবারে সশরীরে সামনে এসে উদয় হলেন। আমি যেন ভূত দেখলাম।

এতক্ষণে আমাকে দেখে নিখিলবাবু সব বুঝতে পারলেন। বললেন—ও, তাই বলি, এই বয়সেই লুকিয়ে লুকিয়ে শরৎ চাটুজ্যের 'চরিত্রহীন' পড়বার মতলব। দাঁড়াও তোমার বাবাকে গিয়ে বলে দিচ্ছি···

সেই শেষ! ছোট বয়েসে আমার উপন্যাস পড়বার উদ্যম সেই শেষ। আর আমার জন্যে বেচারি রাখহরিরও নাম লাইব্রেরীর খাতা থেকে চিরকালের মত কাটা গেল। নিজের নামে বই নিয়ে পরকে পড়াবার চেষ্টা করার অপরাধে অপরাধী হয়ে গেল সে। নিজের

চরিত্র তো তার আগেই গিয়েছে, অন্যদের চরিত্র খারাপ করবার চেষ্টা আরো বড় অপরাধ বৈকি।

এ তো গেল বিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের গোড়ার কথা। এ-সব কাহিনী ভুলে যাওয়ারই কথা। ভুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ ১৩৫২ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে, প্রবাসীর একটি সংখ্যায় পাঁচকড়ি দে'র মৃত্যুসংবাদ পড়ে আবার সেই সব দিনের কাহিনী মনে পড়লো।

সেটি শোক-সংবাদ। তাতে লেখা ছিল—"গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার বাঙলার সুপরিচিত ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস রচনায় যেমন তাঁহার দক্ষতা ছিল, তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। মানুষ হিসেবে তিনি অমায়িক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন।"

আমার বন্ধু রাখহরির দোষ নেই। পৃথিবীর তাবৎ রাখহরিরা সাহিত্যের এই বিভাগটিকে আজ একশো বছরের ওপর বাঁচিয়ে রেখেছেন। আধুনিক ডিটেক্‌টিভ গল্পের জন্মদাতা হিসেবে ধরা হয় এড্‌গার এ্যালেন পো'কে। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৮৪১—৪৫ সালেই পো'র পাঁচখানা ডিটেক্‌টিভ গল্প বাজারে বেরিয়ে গেল। তারপর এলেন উইল্‌কি কোলিনস্‌ সাহেব। তিনি ছিলেন ডিকেনস্‌-এর বন্ধু। ডিকেনস্‌ লিখলেন 'ব্লিক-হাউস' আর কোলিনস্‌ লিখলেন—'মুনস্টোন', আর 'দি উওম্যান্‌ ইন্‌ হোয়াইট'। আজকালকার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের গোয়েন্দারা যত কিছু কেরামতি দেখাচ্ছেন, সকলের আদিপুরুষ হলেন সেই পুলিস ইন্‌সপেকটর বাকেট। এমন কি পাঁচকড়ি দে মশাইএর গোবিন্দরাম কি দেবেন্দ্রবিজয়ের আদিগুরুও সেই ইন্‌সপেকটর বাকেট সাহেব।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের এই গোয়েন্দাটি কিন্তু এক অভিনব জিনিস। পুলিসগোয়েন্দার একটা তবু মানে খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ও নানাকারণে অনেকেরই ঘটে থাকে। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ গোয়েন্দার প্রাতুর্ভাব গোয়েন্দা-কাহিনীতেই মেলে বেশি। নানা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষে করে তারা পাঠকদের যত খুশী করেন তত খুশী আর কেউই করতে পারেন না। কেন করতে পারেন না তার কারণ বলতে গেলে সাতকাণ্ড রামায়ণ ফেঁদে বসতে হবে। সুতরাং সে-প্রচেষ্টা থাক।

বাঙলা ভাষায় গোয়েন্দা-কাহিনী আমদানি হয়েছে ইংরিজি ভাষা থেকে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজিতে গোয়েন্দা কাহিনী লেখা হলেও, প্রকৃত কথা বলতে গেলে কিন্তু শার্লক হোম্‌সের আগে অমন করে কেউ আর পাঠক-পাঠিকার হৃদয় কেড়ে নিতে পারে নি। সে-সব বই যখন বাঙলাদেশে এসে পৌঁছুল তখন আমাদের সাহিত্যে সবেমাত্র উপন্যাস লেখা শুরু হয়েছে। যদি ধরা যায় 'তুর্গেশনন্দিনী'ই বাঙলা ভাষার প্রথম উপন্যাস, তাহলে ১৮৬৫র আগে তার অস্তিত্ব ছিল না। আর শার্লক হোম্‌সের জন্ম হলো ১৮৮৬ সালে। (A Study in Scarlet)

দেখা যাচ্ছে পাঁচকড়ি দে'র 'প্রতিজ্ঞাপালন' উপন্যাসের প্রকাশ-তারিখ ১৯০৭। যদি পাঁচকড়ি দে'র গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনা করা যায়, তাহলে বলতে হবে সে-যুগে তেমন জনপ্রিয়তা আর কোনও লেখকের ছিল কিনা সন্দেহ। সাধারণত জনপ্রিয়তা সমসাময়িক সহযোগী লেখক-লেখিকার ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে। শত্রুসংখ্যা বাড়ে, বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক পাঁচকড়ি দে মশাই ছিলেন বন্ধুমহলে বিশেষ প্রীতির পাত্র। তবে এর একটা কারণ হয়ত এই হতে পারে যে, গোয়েন্দা কাহিনীর লেখককে সাহিত্যিক পর্যায়ভুক্ত করার নিয়ম কোনও কালে কোথাও নেই এবং ছিলও না। সুতরাং তাঁর জনপ্রিয়তায় বাঙলা দেশের তৎকালীন লেখকদের কারোরই কোনও মাথাব্যথা ছিল না।

সমসাময়িক বাঙালী লেখকদের মধ্যে তখন যে-সব বই চলছে তার কিছু নমুনা দিলে ভাল হয়। স্কুলে তখন 'পদ্যমালা'র কবিতার চল্।

মনোমোহন বসুর—

হুড় হুড় দুড় দুড় মেঘ ডাকিছে ;
মাঠ পথ ছেড়ে লোক বাড়ি আসিছে।
চিক মিক্ বিদ্যুতের আলো জ্বলিছে ;
'চোক গেল' বলে লোক চোক ঢাকিছে।
কড় কড় হড় হড় বাজ পড়িছে ;
কান যায় প্রাণ যায় বুক কাঁপিছে।

ওদিকে বাঙলা ভাষায় 'Mystries of the Court of London' গ্রন্থের অনুবাদ 'লণ্ডন রহস্য' নামে তখন বাজারে বেরিয়ে গেছে। বাঙালী রাখহরিরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনেছে। কিছু কিছু পড়তে চেষ্টাও করেছে। কিন্তু তেমন রস পায় নি যেমন পেয়েছে 'লণ্ডন রহস্যে'র মধ্যে। সে-যুগে আর একজন লেখক তখন বেশ পাকা আসন করে নিয়েছেন বাঙালী পাঠকের মনোরাজ্যে। তিনি হলেন দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। তাঁর লেখা 'তাপসী-কণ্ঠহার' বেরিয়েছে ১৮৮৮ সালে। 'কণক-প্রতিমা' (১৮৯০), 'মিলন মন্দির' (১৯১০) প্রভৃতি। আর সবচেয়ে বেশি মন কেড়ে নিয়েছে 'দারোগার দপ্তর' অথবা 'ডিটেকটিভ পুলিস'। ১৮৮৬ সালে শার্লক হোমস-এর জন্ম ইংলণ্ডে আর ঠিক তারপরেই ১৮৮৮ সালে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ডিটেকটিভ পুলিস' বাজার মাত করে দিলে ধারাবাহিক প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। 'Indian Mirror' পত্রিকার ২৫শে জানুয়ারি ১৮৮৮ বুধবারের কাগজে পুস্তক সমালোচনা-স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছিল নিচের কথাগুলো :—

The 'Indian Mirror' :

"We have also read with attention another book composed by the same author, and styled 'Detective

Police.' The book has also been written by following the story of the life of a man who was actually tried by the High Court of Calcutta on the most serious charges, and is up to date undergoing the term of punishment in the criminal jail of Alipore……"

এই 'ডিটেকটিভ পুলিস' মানেই ছিল 'দারোগার দপ্তর'। সাময়িকভাবে খণ্ডে খণ্ডে এই গ্রন্থ "১৪নং হুজুরিমলস্ লেন, বৈঠকখানা 'দারোগার দপ্তর' কার্যালয় থেকে উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত" হতো। এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তার নিরিখ হিসেবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমার সামনে যে-বইটি রয়েছে তার নাম "ভীষণ হত্যা অর্থাৎ একটি স্ত্রীলোক হত্যার ভীষণ রহস্য।" এর প্রচ্ছদপটের নিচেয় লেখা আছে "দারোগার দপ্তর, ১৫৭ সংখ্যা। চতুর্দশ বর্ষ, সন্ ১৩১৩ সাল, বৈশাখ।"

অর্থাৎ এটুকু আন্দাজ করে নেওয়া যায় যে, সে-যুগে 'দারোগার দপ্তর' জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত সমাদর পেয়েছিল।

তারপর ছিল সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের উপন্যাস। ভট্টাচার্য মশাই-এর উপন্যাস যে কেমন তার নমুনা না দিলে ঠিক বোঝা যাবে না। 'কণক-প্রতিমা' উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—'বইখানির নাম 'কণক-প্রতিমা' রাখা হইল—কিন্তু কেন রাখা হইল তা বই পড়িয়া অনেকে খোঁজ পাইবেন না। তবে যাঁহারা উপাখ্যানের স্তরভেদ করিয়া পড়েন তাঁদের কাছে যে কিছু লুকান যায়, সে-কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না।…আর একটি কথা, উপন্যাস লিখিতে আজি কালি কেহ বড় ভয় করেন না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, লেখার মধ্যে উপন্যাস লেখাই বড় সোজা কাজ। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে—উপন্যাস পড়া লোকচরিত্র শিক্ষার জন্য। বহু দর্শন বহু বিজ্ঞতায় যাহা হয়, উপন্যাস পাঠে তাহাই শিখা যায়, সে বিষয়ে কতদূর কি করিতে পারিয়াছি, বলিতে পারি না।' বইটির প্রকাশ কাল ১৮৯০। বাংলা ১২৯৭ বঙ্গাব্দ, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ।

'তাপসী-কণ্ঠহার' উপন্যাসের ভূমিকায় ভট্টাচার্য মশাই লিখছেন—"তাপসী-কণ্ঠহারের পাণ্ডুলিপি বাল্মীকি পুস্তকালয়ের প্রোপ্রাইটর শ্রীযুক্ত নবকুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট উচিত মূল্যে বিক্রয় করিলাম; সুতরাং ইহাতে আমার নাম ব্যতীত আর কোনও স্বত্ব রহিল না—ইতি ২রা নভেম্বর ১৮৮৭।'

এ-সব ঘটনা যখন ঘটছে আমাদের রাখহরিরা তখনও জন্মায় নি। কিন্তু শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে কিছু কিছু লোক নাম স্বাক্ষর করতে শিখলো। যারা ডিগ্রী পেয়ে চাকরিতে ঢুকলো তাদের কথা আলাদা। তারা শিক্ষিত সম্প্রদায়। তাদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র আদর পেলেন। কিন্তু যাদের কাছে আদর পেলেন না, তাদের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থেই লেখা আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছে—

"কবি কালিদাসের এক মালিনী ছিল, ফুল যোগাইত। কালিদাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ফুলের দাম দিতে পারিতেন না—তৎপরিবর্তে স্বরচিত কাব্যগুলি মালিনীকে পড়িয়া শুনাইতেন। একদিন মালিনীর পুকুরে একটি অপূর্ব পদ্ম ফুটিয়াছিল, মালিনী তাহা আনিয়া কালিদাসকে উপহার দিল। কবি তাহার পুরস্কার স্বরূপ মেঘদূত পড়িয়া শোনাইতে লাগিলেন। মেঘদূত কাব্য রসের সাগর। কিন্তু সকলেই জানেন যে, তাহার প্রথম কবিতা কয়টি কিছু নীরস। মালিনীর ভাল লাগিল না—সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিল। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—মালিনী সখি! চলিলে যে!

মালিনী বলিল—তোমার কবিতায় রস কই?

কবি। মালিনী! তুমি কখনও স্বর্গে যাইতে পারিবে না।

মালিনী। কেন?

কবি। স্বর্গের সিঁড়ি আছে। লক্ষ যোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া স্বর্গে উঠিতে হয়। আমার এই মেঘদূতকাব্য-স্বর্গেরও সিঁড়ি আছে—এই নীরস কবিতাগুলি সেই সিঁড়ি। তুমি এই সামান্য সিঁড়ি

ভাঙ্গিতে পারিলে না—তবে লক্ষ যোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিবে কি প্রকারে ?

মালিনী তখন ব্রহ্মশাপে স্বর্গ হারাইবার ভয়ে ভীত হইয়া আদ্যোপান্ত মেঘদূত শ্রবণ করিল। শ্রবণান্তে প্রীতা হইয়া, পরদিন মদনমোহিনী নামে বিচিত্রা মালা গাঁথিয়া আনিয়া কবিশিরে পরাইয়া দিল।

আমার এই সামান্য কাব্য স্বর্গও নয়—লক্ষ যোজন সিঁড়িও নাই। রসও অল্প, সিঁড়িও ছোট। এই নীরস পরিচ্ছেদ কয়টি সেই সিঁড়ি। যদি পাঠকশ্রেণী মধ্যে কেহ মালিনীচরিত্র থাকেন তবে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই যে, তিনি এ সিঁড়ি না ভাঙ্গিলে সে রস মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন না।"

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, ১লা জুন 'বিষবৃক্ষ' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ওপরের লেখা থেকেই বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন, যে, বাংলা দেশে জনসাধারণের বেশির ভাগই মালিনী জাতীয়। তারা ঘটনা চায়। শুধু ঘটনা নয়, ঘটনার ঘনঘটা। উপন্যাসের শুরু থেকেই। এখানকার মত তখনও রাথহরিরা ছিল। মুদিখানার মালিক, ফেরিওয়ালা, পালকি বেহারা, কেরানীকুল, সে যুগেও ছিল, এ যুগেও আছে। তাদের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নয়। তাদের জন্যে ছিল প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর,' 'লণ্ডন-রহস্য' দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'কণক-প্রতিমা' 'তাপসী-কণ্ঠহার' প্রভৃতি।

আজকাল রাউরকেলা, ভিলাই, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি জায়গায় এক শ্রেণীর পাঠকদের চাহিদার যোগান দেবার জন্যে যেমন একশ্রেণীর লেখক কলম ধরেছেন, তখন বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও তেমনি কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

প্রয়োজন যে সত্যিই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল 'মায়াবী' 'মনোরমা' 'হত্যাকারী কে' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকাশের

সঙ্গে সঙ্গে। রাখহরিদের মহলে সাড়া পড়ে গেল, শোরগোল পড়ে গেল। সবার মুখেই এক কথা। এমন বই আর হয় না। অদ্ভুত, অপূর্ব, অভাবনীয়।

সবাই বলাবলি করতে লাগলো—'মায়াবী' পড়েছিস? নতুন নভেল।

—লিখেছে কে?

—পাঁচকড়ি দে।

এতদিন 'লণ্ডন-রহস্য', 'দারোগার দপ্তর', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'কণক-প্রতিমা' পড়ে যে রস না পেয়েছে, তখন সেই রস পাওয়া গেল 'মায়াবী', 'মনোরমা', 'হত্যাকারী কে' পড়ে। এ এক নতুন জগৎ, এ এক নতুন নাম, এ এক নতুন প্রতিভা। রাখহরিরা লাফিয়ে উঠলো আনন্দে। লাইব্রেরীতে কাড়াকাড়ি মারামারি শুরু হয়ে গেল। এক-একটা বই বাজারে ছাপা হয়ে বেরোয় আর রাখহরিরা গোগ্রাসে গেলে। হাজার হাজার বই দেখতে না দেখতে অদৃশ্য হয়ে যায়। ছাপাখানা ছাপিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। সংস্করণের পর সংস্করণ। রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চ। রহস্যের পর রহস্য। এ-বইতে আর বঙ্কিম চাটুজ্জের মত প্রকৃতির বর্ণনা নেই, রূপসীর রূপের ব্যাখ্যা নেই। তারপর কী হলো, সেই কথাটাই আসল। সেই কথাটা শুনে তবে তৃপ্তি।

কিন্তু কে এই আশ্চর্য লেখক?

পাঁচকড়ি দে! তখন রাখহরিদের মহলে একটা কথা প্রায় প্রবাদ-বাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—"হত্যাকারী কে? না পাঁচকড়ি দে।"

সুন্দর সুপুরুষ চেহারার মানুষটি। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। খদ্দরের বেনিয়ান গায়ে। পায়ে চটি। হাতে একটি ছড়ি। ছোট-বেলায় ভবানীপুরের একটা স্কুলে লেখাপড়া শিখেছেন। অবস্থা

মাঝামাঝি। ১৮৭৩ সালে জন্ম। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তাঁর উপন্যাস পড়ার ঝোঁক। পিতা কেদারনাথ দে ভেবেছিলেন এ ছেলে নির্ঘাত গোল্লায় যাবে। উপন্যাস পড়ে কেউ কখনও জমিদারি বাড়ি গাড়ি করেছে? যখন তাঁর একটু বয়েস হয়েছে তখন থেকেই বাঙলা সাহিত্য গোয়েন্দা কাহিনীতে ছেয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের লেখা ভাল বটে, কিন্তু তা পড়ে তো পড়ার পিপাসা মেটে না। সে-সব পুজো করবার জিনিস, তা মাথায় থাক। আপামর জনসাধারণ যা চায় তা হলো সস্তা ঘন-ঘটনার গল্প। তখন থেকেই মাথায় ঢুকেছিল আকাঙ্ক্ষাটা। এমন বই লিখলে কেমন হয় যা সবাই পড়ে বাহবা দেয়, যা না পড়লে জীবন বৃথা যায়, যা শেষ করতে না পারলে রাত্রের ঘুমটাই নষ্ট!

'দারোগার দপ্তরে'র কথাটা আগেই মনে ছিল। সেইটে চোখের সামনে রেখেই একদিন কলম ধরলেন। শার্লক হোমস্-এর বইও তখন হাতের কাছে। সে-সব বই ভাবায় না, শুধু রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। পাঠকরা ভাবতে চায় না, শুধুই রোমাঞ্চ চায়। সেই রোমাঞ্চের গল্পই লিখতে লাগলেন। এমন গল্প যাতে তত্ত্ব নেই, দর্শন নেই। সে-সব থাকলে পাঠক পালিয়ে যাবে। থাকবে শুধু উত্তেজনা। আর সেই উত্তেজনা পাবার জন্যেই বাঙালী পাঠক-কুল তখন উদ্‌গ্রীব। বন্ধুবান্ধবও জুটে গেল কিছু। 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল মশাই-এর দাদা যতীন্দ্রনাথ পাল প্রাণের বন্ধু। পাল-ভ্রাতারা দু'জনেই সাহিত্য-পাগল মানুষ। ফণী পাল মশাই আবিষ্কার করেছিলেন শরৎ চট্টোপাধ্যায়কে। সেইটেই তাঁর চরম কৃতিত্ব। আর যতীন পাল মশাই-এর আকাঙ্ক্ষা ছিল সাহিত্যিক খ্যাতি পাবার। তিনজনে মিললেন ত্রয়ী হিসেবে। তিনজনেই এক নাগাড়ে উপন্যাস লিখতে লাগলেন। এখনকার পাঠকরা যতীন পালের নাম শোনেন নি। তিনি একটার পর একটা ছাব্বিশটা বই লিখে ফেললেন। 'কুলবধূ', 'গৃহিণী', 'ঘরের লক্ষ্মী', 'ধর্মপত্নী'। ফণী পাল মশাই লিখলেন একে একে ন'খানা বই—'ইন্দুমতী', 'ছোট বৌ',

'বন্ধুর বৌ', 'মধুমিলন', 'স্বামীর ভিটা'। আর পাঁচকড়ি দে একে একে লিখলেন—'মায়াবী', 'মনোরমা', 'হত্যাকারী কে'। এমনি করে প্রায় সবসুদ্ধ ছাব্বিশখানা বই। সব ক'টাই ডিটেকটিভ নভেল।

রাতারাতি শোরগোল পড়ে গেল বাজারে।

ততদিনে অখ্যাত অজ্ঞাত পাঁচকড়ি দে মশাই বেশ গণ্যমান্য হয়ে গেছেন। সারা বাঙলা দেশের লোক তাঁকে চেনে। তাঁকে দেখবার জন্যে সবাই ছটফট করে। পরে তিনি কী বই লিখছেন তাই নিয়ে গবেষণা করে, মাথা ঘামায়।

ফণীন্দ্রনাথ পাল তখন 'যমুনা' বার করলেন। মাসিক পত্রিকা। শরৎচন্দ্র তাতে ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন। আর যতীন পাল মশাই বার করলেন আর একটা মাসিক পত্রিকা—'জাহ্নবী'।

আর পাঁচকড়ি দে শুধু লেখা নয়, আরম্ভ করে দিয়েছেন বই-এর দোকান—'পাল ব্রাদার্স'—৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন। জোড়াসাঁকো। সঙ্গে আছে 'বাণী প্রেস'। রামতনু বোস লেনে তিনতলা বাড়ি করেছেন। নাম দিয়েছেন 'নিরালায়'। সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউতে বিরাট তিনতলা বাড়ি করেছেন—'বাণী পীঠ'। বাণী দে ছিলেন তাঁর পিতামহী। সমস্ত কিছুই ডিটেকটিভ নভেল ও প্রকাশনার দৌলতে। বাঙালী পাঠক-পাঠিকাকে তিনি রসের যোগান দিয়ে গেছেন আর তারাও দিয়ে গেছে তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি, অর্থ খ্যাতি প্রতিপত্তি।

পাঁচকড়ি দে মশাই-এর উপন্যাস যে সেকালে কত জনপ্রিয় ছিল সে-সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞাপনের হুবহু নকল নিচে তুলে দেওয়া গেল। এর থেকেই অনুমান হবে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থের চেয়েও পাঁচকড়ি দে'র উপন্যাসের চাহিদা কত বেশি ছিল। এবং সেকালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের তুলনায় পাঁচকড়ি দে'র উপন্যাসাবলী বিভিন্ন ভাষায় কত বেশি অনুবাদ হয়েছিল।

"১০০,০০০ লক্ষাধিক বিক্রয় হইয়াছে !!!

প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের

সমগ্র সচিত্র উপন্যাসের তালিকা

মায়াবী	১।৶৹	লক্ষ টাকা	৸৹
মনোরমা	৸৵৹	হত্যা রহস্য	১৵৹
মায়াবিনী	॥৹	ভীষণ প্রতিশোধ	১॥৵৹
পরিমল	৸৹	ভীষণ প্রতিহিংসা	১।৹
জীবন্মৃত রহস্য	১॥৹	কালসর্পী	৸৹
হত্যাকারী কে ?	১/৹	রঘু ডাকাত	১৲
নীলবসনা সুন্দরী	১॥৹	বাঙালীর বীরত্ব	১৲
গোবিন্দরাম	১৵৹	নরবলি	৸৹
রহস্য-বিপ্লব	১॥৹	মৃত্যুরঙ্গিণী	৸৹
মৃত্যু বিভীষিকা	৸৵৹	শক দুহিতা	১৲
প্রতিজ্ঞা পালন	১।৹	হরতনের নওলা	১৲
বিষম বৈসূচন	১।৹	সুহাসিনী	৸৹
জয় পরাজয়	১৲	মবিয়ম	(যন্ত্রস্থ)

বিশেষ সুবিধা—একত্রে ৫৲ কিংবা তদূর্দ্ধ মূল্যের এই উপন্যাস লইলে মাশুল লাগে না। এবং 'সতী শোভনা' সচিত্র উপন্যাস উপহার পাইবেন। বঙ্গসাহিত্যে এই সকল উপন্যাসের কতদূর প্রভাব তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সংস্করণের পর সংস্করণ হইতেছে, লক্ষাধিক বিক্রয় হইয়াছে—এখনও প্রত্যহ রাশি রাশি বিক্রয়। হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলেগু, কেনেরদী, মারাঠি, গুজরাটি, সিংহলিস, ইংরাজি প্রভৃতি বহুবিধ সভ্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, সর্বত্র প্রশংসিত। ছাপা-কাগজ-কালি উৎকৃষ্ট।

সকল পুস্তকেই অনেক মনোরম ছবি—সুরম্য বাঁধান।"

তাঁর এক একটা বই বেরিয়েছে আর নানা পত্রিকায় তার অকুণ্ঠ প্রশংসা বেরিয়েছে।

তাঁর একটি বই সম্বন্ধে স্টেটসম্যান লিখলে—"The plot of the story is cleverly worked out and the several incidents and situations are so arranged that the work can be dramatised and adopted to the stage."

হিতবাদী লিখলে—"রচনা চাতুর্যে চরিত্র অঙ্কনে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা দেওয়ান গোবিন্দরাম পাঠে প্রকৃতই পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।"

The Indian Empire, 9th June 1908—"This is a sensational Hypnotic Novel in Bengali. This, we are sure, will prove interesting to those who like an engrossing story, and will be much delighted by its reading."

বলতে গেলে বাঙলা দেশের একচ্ছত্র ঔপন্যাসিক হয়ে উঠলেন পাঁচকড়ি দে। তারপর যখন ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেলেন, তখন পাঁচকড়ি দে তাঁর 'জীবন্মৃত-রহস্য' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করলেন। উৎসর্গ-পত্রে লিখলেন—"শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহাশয় করকমলেষু—"

কিন্তু এদিকে বাঙলা সাহিত্য রাজ্যে তখন নতুনের সম্ভাবনায় উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠা। নতুনকে অভিনন্দিত করবার জন্যে এক নতুন পাঠকগোষ্ঠী প্রস্তুত! বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আছেন, এবার কে? এবার যিনি আসবেন কে তাঁকে আহ্বান করবে? কোথায় তাঁর আসন প্রতিষ্ঠা হবে?

ফণি পাল মশাই-এর 'যমুনা' পত্রিকায় হঠাৎ এক নতুন উপন্যাসের আবির্ভাব হলো—'বড়দিদি'। কিন্তু লেখকের নাম-গন্ধ নেই কোথাও।

রবীন্দ্রনাথ তখন 'ভারতী'র সম্পাদক। একজন ভক্ত গিয়ে তাঁকে অনুযোগ করলেন—গুরুদেব আপনার 'বড়দিদি' পড়লাম, কিন্তু নিজের নামটা দিলেন না কেন?

রবীন্দ্রনাথ নিজেও অবাক হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। বললেন—কই, দেখি—

'বড়দিদি'র প্রথম কিস্তিটা পড়লেন আদ্যোপান্ত। বাহাদুর লেখক বটে! লেখাটার নিচে তাঁর নিজের নামটা দিতে পারলে অখুশী হতেন না। কিন্তু লেখাটা তো তাঁর নিজের নয়। নিজের যদি না হয়, তবে কার? কে এই অজ্ঞাতকুলশীল লেখক?

ওদিকে পাঁচকড়ি দে মশাই-এর জীবনেও এক মহা দুর্যোগ ঘটে গেছে তখন। তিন বন্ধু লিখতেন। তিনজনেই সার্থক লেখক।

ফণি পাল, যতীন পাল আর পাঁচকড়ি দে। কিন্তু হঠাৎ অকাল-মৃত্যুর কোপে পড়লেন যতীন্দ্রনাথ পাল। 'জাহ্নবীর' সম্পাদক, ছাব্বিশখানা বেস্ট-সেলার উপন্যাসের প্রণেতা। পাঁচকড়ি দে মশাই-এর অকৃত্রিম অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বন্ধুর বিচ্ছেদ-শোক আর সহ্য করতে পারলেন না পাঁচকড়ি দে। তিনি জীবন্মৃত হয়ে রইলেন, কিন্তু তাঁর রহস্য-কাহিনীর উৎস চিরকালের মত শুখিয়ে গেল সেই দিনটি থেকে। বন্ধুর মৃত্যুর পর আর পঁচিশ তিরিশ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আর কোনও বই লেখেন নি। যেমন কোনও উপন্যাস লেখেন নি টমাস হার্ডি জীবনের শেষ তিরিশটি বছর।

পাঁচকড়ি দে শেষ জীবনে অর্থের প্রাচুর্য ভোগ করে গেছেন। কলকাতার কেন্দ্রের ওপর বিরাট অট্টালিকা তৈরী করেছেন। সেই অট্টালিকা বহু লোকের ঈর্ষার বস্তু হয়ে আজও সগৌরবে বিরাজ করছে। তিনি বই লিখে কী চেয়েছিলেন জানা নেই। খ্যাতি চেয়েছিলেন না অর্থ চেয়েছিলেন তারও হদিস কেউ দিতে পারে না। যদি অর্থ চেয়ে থাকেন তো তা তিনি যথেষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু যদি পরমার্থ চেয়ে থাকেন তো ভুল করেছিলেন। কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় তাঁর নাম বা গ্রন্থ পরিচিতি সংযুক্ত হয় নি। বাঙলা সাহিত্যের কোনও ইতিহাসেও তাঁর নামগন্ধটুকু নেই। প্রথম নোবেল পুরস্কার পাওয়া ফ্রান্সের কবি 'প্রোদ্‌হমা'র মত তিনিও অপাঙক্তেয় হয়ে আছেন বাঙলা সাহিত্যের পঙক্তি ভোজে।

আর রাখহরি? রাখহরিরা চিরকালই অকৃতজ্ঞ। পাঁচকড়ি দে'কে রাখহরিরা ঋণশোধ করেছে তাঁর বই কিনে, কিন্তু প্রীতি দেয় নি। রাখহরিদের স্বভাবই তাই। তারা রোমাঞ্চের কাঙাল। তুমি যতদিন আমাদের রোমাঞ্চ দেবে ততদিন পয়সা দিয়ে তোমার মূল্যশোধ করবো। কিন্তু প্রীতি অন্য জিনিস। তার জন্য আছে অন্য লেখক। গোয়েন্দা-কাহিনীর উপাদেয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে

অনেক যুক্তি শুনে এসেছি ভক্তদের কাছ থেকে। তাঁদের যুক্তি এই যে গোয়েন্দা-কাহিনী পড়লে নাকি মনে চিন্তাসূত্র-সুনিয়ন্ত্রিত হয়। কল্পনা প্রখর হয়। কিন্তু তাদের সব যুক্তির উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—"যে-যুগে দলে দলে গরজের তাড়ায় অবকাশ ঠাসা হয়ে নিরেট হয়ে যায় সে-যুগ প্রয়োজনের, সে-যুগ প্রীতির নয়। প্রীতি সময় নেয় গভীর হতে। আধুনিক এই ত্বরা-তাড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরিপানার মতোই সাহিত্যধারার মধ্যেও ভূরি ভূরি ঢুকে পড়েছে। তারা বাস করতে আসে না, সমস্যা-সমাধানের দরখাস্ত হাতে ধন্না দিয়ে পড়ে। সে দরখাস্ত যতই অলংকৃত হোক, তবু সে খাঁটি সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই। দাবি মিটলেই তার অন্তর্ধান।"

এমন অকাট্য সত্য কথা আর দুটি নেই।

হত্যাকারী কে, এই তথ্যটি প্রকাশ হয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ডিটেকটিভ-উপন্যাসের পাঠকের দাবি মিটে যায় বলেই এ-বই-এর পরমায়ু অল্প।

রাখহরির সঙ্গে বহুদিন পরে আবার একদিন হঠাৎ দেখা। সে আমার বাড়িতেই এল।

বললে—নতুন একজন লেখক বেরিয়েছে, পড়েছিস?

রাখহরি যে তখনও সেই মুদিখানায় বসে খদ্দের সেবা না করে উপন্যাসের সেবা করে চলেছে তা আমার তখন জানা ছিল না। আর জানবোই বা কী করে? আমার বয়েস তখন কুড়ি পেরিয়ে গেছে। আমিও সাবালক হয়েছি। বুঝতে শিখেছি কোন্ লেখাটা প্রয়োজনের আর কোন্‌টা প্রীতির। বুঝতে শিখেছি সাহিত্যের জনপ্রিয়তা জিনিসটা জাপানী কাচের গেলাসের মতই ঠুন্‌কো। তার যেটা বাহার সেটা বাইরের। চোখ ভোলালেও মনের মধ্যে তার আনাগোনা নিষিদ্ধ। অন্তরের অনুরাগই যদি কেড়ে নিতে না পারলে তো বৃথাই তোমার চোখ-ধাঁধানোর বড়াই।

আমার মৌনতা দেখে রাখহরি বোধহয় একটু দুঃখ পেয়ে চলে যাচ্ছিল। বললে—তুই বুঝি এখন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিস ?

বললাম—না, এখনও পড়ি—

রাখহরি উৎসাহ পেয়ে বললে—আমি এবার অন্য একটা লাইব্রেরীর মেম্বর হয়েছি রে, ওরা তো সেবার আমার নাম কেটে দিয়েছিল। কিন্তু এখানেও শশধর চক্কোত্তির "উন্মাদিনী"টা পেলাম না ভাই—

বললাম—না পেয়েছিস ক্ষতি নেই, আমি পড়ে নিয়েছি-- আমিও অন্য একটা লাইব্রেরীর মেম্বর হয়েছি—

রাখহরি বললে—ভালোই হয়েছে, তাহলে দীনেন রায়ের 'রূপসী বোম্বেটে' বইটা পড়েছিস নিশ্চই, খুব ভালো, না রে ?

আমি রাখহরির কথায় সেদিন অবাক হই নি। কারণ আমি ততদিনে জেনে গিয়েছি যে পাঠককুলে রাখহরিরাও যেমন সত্যি, রাখহরিদের খোরাক যোগাবার জন্যে সেই জাতীয় লেখকদের আবির্ভাবও তেমনি সত্যি। আরো জেনে নিয়েছি যে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র, বিদ্যাসাগর চিরকাল পাশাপাশিই থাকবেন। হয়ত রবীন্দ্রনাথের বই-এর চেয়ে "দারোগার দপ্তর" সংখ্যায় লক্ষগুণ বেশিই বিক্রি হবে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথের কথায় "বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনটা সোনার, কোনটা তামার, কোনওটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হালকা ও ভারী, আনন্দের ও প্রমোদের যত রকমের সুর আছে সবই তাঁর বীণায় বাজে।···সবই যে উদাত্তধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলি নে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে।"

একটি নাম কাটার কাহিনী

"একটি নাম কাটার কাহিনী" প্রবন্ধটি ১৩৫২ সালের "সচিত্র শ্রীমতী"র শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু খুব সাধারণ হলেও বক্তব্যগুণে এটি অসামান্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। লেখক সাহিত্যিক জীবনে যে ঈর্ষা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন, তিনি তারই নিখুঁত চিত্র একেছেন এখানে। বাঙলা দেশকে পরশ্রী-কাতরতার দেশ বললে সেটা নতুন তথ্য হিসেবে গণ্য হয় না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র বহুকাল আগেই দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন —"যেখানে যশ সেখানেই নিন্দা; সংসারের ইহাই নিয়ম। পৃথিবীতে যিনিই যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায়-বিশেষ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন, ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, দোষশূন্য মানুষ জন্মে না; যিনি বহুগুণ-বিশিষ্ট তাঁহার দোষগুলি গুণসান্নিধ্য হেতু কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়। সুতরাং লোকে তৎকীর্তনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চির-বিরোধ। দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে। তৃতীয়, কর্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্যের গতিকে অনেক শত্রু হয়। শত্রুগণ অন্যপ্রকারে শত্রুতাসাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ, অনেকের স্বভাবই এই, প্রশংসা অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে। সামান্য ব্যক্তির নিন্দার অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম, ঈর্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম। অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।"

* * * *

আজ থেকে পঁচিশ তিরিশ বছর আগে সাহিত্যের হাটে কী ধরনের হট্টগোল হতো তা আজকের তরুণ সাহিত্যিকদের জানবার কথা নয়। হাট কথাটা ব্যবহার করেছি শ্লেষাত্মক অর্থে, শ্লেষের সঙ্গে যদি কিছু পরিমাণে বেশি ঝাঁঝ প্রকাশ হয়ে পড়ে তো অনিবার্যতা হিসেবে আশা করি তা মার্জনার হবে।

যে-জগৎটা নিয়ে লেখক তার রচনায় নিবিষ্ট থাকে সেটা তার

পারিপার্শ্বিক জগৎ হলেও, সে জগতের মুখ্য নায়ক সে নিজেই। সেই নিজস্ব জগতের একমাত্র নায়ক সেই লেখকই। নিজেকে জানার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেই লেখক আত্মপ্রকাশের পথটি খোঁজে। কখনও সে নারী কখনও সে নর। কখনও সে দেশ, কখনও ইতিহাস। আবার কখনও সে ব্যক্তি, কখনও তত্ত্ব।

কিন্তু এ-সবের অনেক ওপরে আর একটি জিনিস আছে সেটি সাহিত্যের মূল কথা। তার নাম হলো রস। রস সংজ্ঞাটি বড় ব্যাপক। কিসে রসসৃষ্টি হয় আর কীসে রসসৃষ্টি হয় না শাস্ত্রে তার সুনির্দিষ্ট বিধান আছে। কিন্তু রসিক-চিত্ত বিধানের অধীন নয়। সে বলবে তুমি বিধান মেনেছ কি মানোনি তা আমি দেখবো না; আমি শাস্ত্রও জানি না বিধানও জানি না; আমি কেবল জানি আমার রসনাকে। তাই রসের গরজ বড় গরজ। সে দূরকে কাছে করে, পরকে আপন। রসের গরজে মুসলমান বৈষ্ণব হয়, ব্রাহ্মণ ফকির! যে রস এত ব্যাপক, সে কি এত সুলভ হতে পারে? বিশ্বের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্না দিয়েও এ-রসের ডিগ্রী পাওয়া যায় না। আর পাওয়া যায় না বলেই সাহিত্যিককে ধ্রুব রসিক পাঠকের ভরসায় যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা করতে হয়।

এই প্রতীক্ষা করার যন্ত্রণা ভীষণতম যন্ত্রণা। ওই যন্ত্রণা সহ্য করবার অমিতশক্তি না থাকলে সাহিত্যিকের অপমৃত্যু ঘটে। ওতে বিচলিত হলে সাহিত্য-কর্মে বিঘ্ন ঘটে। সাহিত্যিককে স্থিতধী হয়ে স্বীয় সৃষ্টির সাধনায় মগ্ন থাকতে হয়। সাহিত্যিকের সংসার নেই, আবার সংসার-বৈরাগ্যও নেই। সমস্ত থেকেও সাহিত্যিক সমস্ত কিছু থেকে সংস্রব-মুক্ত। সব কিছুতে যুক্ত থেকেও মুক্ত থাকবার তার সিদ্ধি। জীবিত অবস্থায় তার খ্যাতি তো পেতেই নেই, পুরস্কারও পেতে নেই, পেলে যে খুব ক্ষতিকর তা নয়, কিন্তু না-পেলেও লোকসান নেই। কারণ জীবনের সমস্ত বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারী কাছারীর আইন-কানুন প্রযোজ্য হলেও সাহিত্যিক যশ জিনিসটা এখনও তার এক্তিয়ারের বাইরে রয়ে গেছে। এবং আশার

কথা চিরকালই থাকবে। চৌকিদার বা দারোগাকে একটা নির্দিষ্ট বয়সে পেনসন গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু সাহিত্যিকের রিটায়ার করবার আইন এখনও চালু হয় নি। তার পেনসন্ সুরু হয় তার মৃত্যুর পর থেকে।

এ-সব কথা আগে বোধ হয় কোথাও বলেছি। তবু এই কাহিনী বলতে গিয়ে এ-কথাগুলো সেই কাহিনীর ভূমিকালিপি হিসেবেই ব্যবহার করলাম।

সাহিত্যিক বা যে-কোন শিল্পীর জীবন-ভাবনায় উপরোক্ত কথা-গুলো অপরিহার্য বলেই উল্লেখযোগ্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে ঔপন্যাসিক বলে স্বাভাবিকভাবেই জীবন-সচেতন। অন্য শিল্পীদের জীবনে সেই সচেতনতা কেমন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আমি লক্ষ্য করে থাকি বরাবর। সেই কারণেই ইতিহাসের বই এবং মানুষের জীবনীগ্রন্থ পড়া আমার কাছে অন্যতম নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এইবার পড়লাম আর একটা জীবনী। নিজের জীবনের একটা ঘটনার সঙ্গে সেই ঘটনা এমন মিলে গেল যে সেটা না বলে পারছি না।

জীবনটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র-শিল্পী চার্লি চ্যাপলিনের। চার্লি চ্যাপলিনের কোনও ছবিও দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কিন্তু তাঁর ছবি আর তাঁর জীবন সম্বন্ধে এত কথা শুনেছি যে তাঁর সম্বন্ধে আমার অনেকখানি জানা হয়ে গেছে।

প্রথমে তাঁর জীবনের ঘটনাটিই বলি। পরে আমার সাহিত্য-জীবনের কাহিনীটা বলবো।

চার্লির জীবনের একেবারে গোড়ার দিকের কথা। তখন সিনেমা বস্তুটি কী তাও তাঁর জানা নেই। দারিদ্র্য, অর্থাভাব, উদগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সব কিছু নিয়ে তিনি তখন উদ্‌ভ্রান্ত। এমন সময় একটা কোম্পানীর মালিক একদিন তাঁর স্টুডিওর অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন চার্লিকে।

সিনেমা-কোম্পানীর স্টুডিওর অফিস। সাধারণ অফিসের মত শান্ত পরিবেশ। লোকজনের ভিড়, ব্যস্ততা, কলগুঞ্জনে ভরা চারদিক।

চার্লি সদর গেট পর্যন্ত গেলেন। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে কেমন যেন অহেতুক লজ্জা হলো। ভেতরে ঢুকবো কি ঢুকবো না, এই নিয়ে দ্বিধা সঙ্কোচ মেশানো এক অকারণ আতঙ্ক।

শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে এলেন চার্লি।

তার পরদিনও তাই। এক অকারণ জড়তা এসে তাঁর মন আর তাঁর পা দু'টোকে সেদিনও একেবারে অসাড় করে দিলে। সদর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতায় নগণ্যতায় নিজেই বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন। স্টুডিওর ভেতর থেকে যারা বাইরে বেরোচ্ছে এবং যারা বাইরে থেকে গট্‌গট্ করে ভেতরে ঢুকছে তারা সবাই তাঁর চোখে স্বনামধন্য বলে প্রতিভাত হলো। আর তিনি তখন একজন তুচ্ছ অখ্যাতনামা সামান্য মানুষমাত্র। তাঁকে যদি কেউ ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়!

সেদিনও চার্লি বাড়ি ফিরে এলেন শেষ পর্যন্ত।

পর পর দু'দিন। তিনি ঠিক করলেন তিনি আর স্টুডিওতে যেতে পারবেন না। স্টুডিওতে যাবার সাহস আর তাঁর নেই।

কিন্তু কোম্পানির মালিক তাঁর কাছে খবর পাঠালেন। কী হলো? তুমি আসনি কেন? আজ নিশ্চয়ই আসবে। এসে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে দেখা করবে।

সেদিন আর তেমন জড়তা এসে অচল করে দিলে না চার্লিকে। সেদিন তিনি মাথা উঁচু করে স্টুডিওর ভেতরে ঢুকলেন। চারিদিকে তখন কাজ-কর্মের ব্যস্ততা। রং মাখা মুখ নিয়ে এদিকে ওদিকে ছেলে-মেয়েরা ঘোরাফেরা করছে।

কোম্পানীর মালিক পরিচয় করিয়ে দিলেন হেনরি লারম্যানের সঙ্গে।

হেনরি লারম্যান তখন ছবির জগতে নাম করা পরিচালক। বড় দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ।

বললে—তুমি আগে কখনও সিনেমায় কাজ করেছ ?

চার্লি বললেন—না—

লারম্যান বললে—তাহলে আমি যা করি তুমি তা মন দিয়ে দেখ—

সেই-ই সিনেমা সম্বন্ধে চার্লির প্রথম অভিজ্ঞতা। কেমন করে ছবি তোলা হয়, কেমন করে ছবি এডিটিং করা হয়, সমস্ত কিছু দেখলেন। তারপর একটা ছবিতে অভিনয় করবার পালা। একটা খবরের কাগজের রিপোর্টারের ভূমিকা।

হেনরি লারম্যান সব বুঝিয়ে দিলে চার্লিকে, কেমন ভাবে অভিনয় করলে লোকে হাসবে। কেমন ভাবে অঙ্গ-ভঙ্গি করলে লোকে মজা পাবে, তারই ব্যাখ্যা।

জীবনে প্রথম সিনেমায় অভিনয় করা। সে যে কী রোমাঞ্চ, কী উন্মাদনা, কী কৌতূহল। আর শুধু কি তাই! তার সঙ্গে আশঙ্কা! ভয়ে রাত্রে ঘুম হতো না চার্লির। ঘুমের ঘোরেও চার্লি নিজের ছবিটা কল্পনায় দেখতেন। কল্পনা করতেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর ছবি দেখছে আর দেখতে দেখতে হেসে গড়িয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। যে কটা দিন ছবি তোলা হতে লাগলো চার্লি প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে লাগলেন। শিল্পীর জীবনে সে সব দিন সংগ্রামের দিন। প্রত্যেক জীবন-সচেতন শিল্পীকেই এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়। যার জীবনে এই সংগ্রাম নেই, তার সার্থকতাও নেই। সে-সংগ্রামের যত যন্ত্রণা ততই সাফল্যের সিংহদ্বারের কাছাকাছি পৌঁছোনো।

প্রত্যেকটা দৃশ্যে অভিনয় করেন চার্লি। তাঁর হাতের কাছে যাকে পান তাকেই জিজ্ঞেস করেন—কেমন লাগলো ?

লোকে বলে—মন্দ নয়!

হেনরি লারম্যানকেও জিজ্ঞেস করেন চার্লি—কেমন লাগলো আপনার আমার অভিনয় ?

লারম্যান তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে—দেখি···

যে শিল্পী ভাবীকালে একদিন নিখিল বিশ্বের সপ্রশংস-দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তার যে এত সহজে প্রশংসা পেতে নেই, তা তখন জানা ছিল না চার্লির। তাই তাঁর কেবল মনে হতো কেন লোকে তাঁর অভিনয় দেখে প্রশংসা করছে না! কেন লোকে হেসে গড়িয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে না তাঁর অভিনয় দেখে?

অথচ বেশি জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা হচ্ছে। লোকে ভাববে কী! একটু নিজের ওপর বিশ্বাস নেই নাকি ছেলেটার?

একদিন অনেক প্রতীক্ষার পর ছবি শেষ হলো, মনে মনে আশার দুর্দমনীয় একটা আবেগ সারা মনকে আলোড়িত করে—এবার বোধহয় আমার খুব সুখ্যাতি হবে। সারা পৃথিবীর মানুষ আমার নাম জানতে পারবে, আমাকে দেখতে চাইবে, আমাকে প্রশংসা করবে, আমাকে ভালোবাসবে। উঠতে বসতে খেতে ঘুমোতে দিন-রাত্রির ওই একই চিন্তা অস্থির করে তোলে ছেলেটাকে।

সেদিন ছবি দেখার ব্যবস্থা হলো।

ছবির কোম্পানীর মালিক, ছবির পরিচালক হেনরি লারম্যান, ছবির অভিনেতা অভিনেত্রী সবাই উদ্‌গ্রীব আগ্রহে হল্ ঘরে ঢুকলো।

কিন্তু সকাল থেকেই চার্লির হৃৎকম্প স্বুরু হয়েছে। গিয়ে কী দেখবো, কেমন দেখবো, কেমন লাগবে তাঁর অভিনয়।

ছবি আরম্ভ হলো।

ছবি শেষও হয়ে গেল এক সময়ে।

কিন্তু ছবির কোথাও চার্লির নাম-গন্ধও নেই।

সবাই তখন ছবির দোষ-গুণ নিয়ে আলোচনা করতে ব্যস্ত। চার্লি তাদের মধ্যে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, ওতে আমার ছবি নেই কেন? আমি যে অত কষ্ট করে প্রাণপণে অভিনয় করলাম?

সে-কথার উত্তর দেবার সময় তখন কারুর নেই। সবাই তখন অন্য কথায় ব্যস্ত।

শেষ পর্যন্ত লারম্যানের সঙ্গে মুখোমুখি মোকাবিলা হয়ে গেল।

—মিস্টার লারম্যান, আমার ছবি তোলেন নি আপনি?

লারম্যান কৃপা-কটাক্ষে একবার চাইলে চার্লির দিকে। বললে—হ্যাঁ, তুলেছিলাম বৈকি। কিন্তু এডিটিংএর সময়ে বাদ গেছে—

বলে অন্য লোকের সঙ্গে অন্য কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

সেদিন সেই ঘটনায় চোখের জলের সঙ্গে যে-ব্যর্থতা শিল্পীর বুকে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, বহু বছর পরে চার্লি চ্যাপলিন তার প্রতীকার করেছিলেন বিশ্ব-খ্যাতির মাশুল আদায় করে। সেদিন বুঝেছিলেন সার্থকতার সৌধ চিরস্থায়ীভাবে মজবুত করতে হলে ব্যর্থতা আর চোখের জল দিয়েই তার বুনিয়াদ গড়া ভাল।

বহুদিন পরে সেই লারম্যানের সঙ্গে চার্লির দেখা হয়েছিল। লারম্যান তখন বিস্মৃতির অতলে, আর চার্লির খ্যাতি তখন মধ্য-গগন ছুঁয়েছে। পুরনো কথার সঙ্গে সেই প্রথম ছবিটার কথাও উঠলো। চার্লি জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, সেদিন আমার ছবিগুলো আপনি কেটে দিয়েছিলেন কেন? আমার অভিনয় কি খারাপ হয়েছিল?

লারম্যান বলেছিল—কেটে দিয়েছিলাম কেন জানো? আজ আর আমার বলতে আপত্তি নেই, তোমার অভিনয় এত ভালো হয়েছিল যে আমার খুব হিংসে হলো। ভাবলাম ছবিতে তোমার অভিনয় থাকলে তোমার খুব নাম হয়ে যাবে। তাই কেটে দিয়েছিলাম—

কিন্তু পৃথিবীর শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে হেনরি লারম্যানরা শুধু যে চার্লি চ্যাপলিনকেই হিংসে করে তা নয়, তারা সব যুগেই জন্মায় আর বিভিন্ন নামে বিভিন্ন শিল্পীকে তারাই খ্যাতির উঁচু শিখরে ওঠায়।

নিজের কথা বলি এবার।

তখন নতুন আমি। একবারে নতুন না হলেও নতুন। তখনকার দিনের নতুন হওয়ার সঙ্গে এখনকার দিনের নতুনের অনেক তফাৎ। তখনকার নতুনদের একটা সুবিধে ছিল। তারা সহানুভূতি পেত,

স্নেহ পেত, উৎসাহ পেত। তখন বাঙলা সাহিত্যের অভিভাবক ছিল। এখনকার নতুনদের মত তারা পিতৃ-মাতৃহীন ছিল না।

সেই সময়ে একদিন বাড়িতে বিশ্রাম করছি। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে আমার নাম ধরে খোঁজ করলেন।

জিজ্ঞেস করলাম—কী চাই?

ভদ্রলোক বললেন—আপনার কাছে এসেছি একটা লেখা চাইতে—

—কী পত্রিকা?

ভদ্রলোক বললেন—পত্রিকাটা নতুন বার করছি। নাম দিয়েছি 'শতাব্দী'। তার প্রথম সংখ্যাতেই আপনার লেখা দিতে চাই।

একে তো আমি নতুন, তার পরে আবার লেখার জন্যে খোশামোদ, তার ওপর প্রথম সংখ্যায় গল্প-লেখকদের যে-তালিকা দিলেন, তাতে আর আমার কৃতার্থ না হয়ে উপায় রইল না। সত্যি সত্যিই আমি কৃতার্থ হলাম এই ভেবে যে বঙ্গ-বিখ্যাত লেখকদের পাশে তিনি আমার মত নতুনকেও ঠাঁই দেবার সম্মান দিতে মনস্থ করেছেন।

বললাম—দক্ষিণার ব্যবস্থা আছে তো?

ভদ্রলোক বললেন—আছে, তবে প্রথম সংখ্যায় পারবো না। তৃতীয় সংখ্যা থেকে নিয়মিত দেব।

এতক্ষণে বুঝলাম বঙ্গ-বিখ্যাতদের পাশে আমার গল্প ছাপানোর রহস্যটা। তবু রাজি হলাম। কারণ তখন অর্থের প্রয়োজন আমার ছিল না। আর তা ছাড়াও সেই কুড়ি একুশ বছর বয়সে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'প্রবাসী'তে গল্প ছাপিয়ে আমি পর্যন্ত দক্ষিণা পাই। আর তাতে অর্থটা গৌণ হলেও সম্মান পাওয়া যায় যথেষ্ট।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার নাম?

ভদ্রলোকের নামটা আজ উহ্য থাক। কাজ চালাবার জন্যে ধরা যাক তাঁর নাম হেনরি লারম্যান।

পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত হলো। এবং সত্যি কথা বলতে

কী, পত্রিকাটি তখনকার দিনে বিশিষ্ট গুণীজন মহলে আদৃত আলোচিতও হলো। সে গল্প কত পাঠকের এবং কত গুণীজনের ভালো লাগলো হেনরি লারম্যান মশাই সবিস্তারে তার বিবরণ দিলেন। তাঁর সংগৃহীত মন্তব্যগুলো শুনে মনে মনে যে খুশী হলাম তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এটুকুও বুঝলাম ভালোভাবেই যে দক্ষিণার শূন্যতাটুকু তিনি প্রশংসার খেসারৎ দিয়ে পূর্ণ করতে চাইছেন।

তা হোক, তবু আমি খুশী হলাম।

চারদিকের প্রশংসা শুনে যে খুশী হলাম তা নয়। খুশী হওয়ার কারণ অন্য। তিনি যে আমার মত নতুনের ঠিকানা সংগ্রহ করে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করে সেই ঠিকানায় হাজির হয়ে আমার লেখার জন্যে সবিনয় অনুরোধ করেছেন, তাইতেই আমার যথেষ্ট খুশী হওয়ার কারণ ঘটেছে।

তারপর থেকেই লারম্যান মশাই ঘন ঘন আমার কাছে আসতে লাগলেন। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলেন। আমিও ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম, এবং বিগলিতও হলাম।

বয়েস তখন কম ছিল বলে জানতাম না যে ভালবাসা প্রশংসা খ্যাতি চাইতে নেই। জানতাম না যে মানুষের বাইরের মুখের চেহারাটা যা, ভেতরের চেহারাটা তা নয়। জানতাম না যে যারা আমার প্রশংসা করে, যারা আমার সঙ্গে হেসে কথা বলে, তারা আমার খ্যাতির সুযোগ নিয়ে কার্যোদ্ধার করতে চেষ্টা করে বলেই অমন করি। তখন জানতাম না যে মানুষের সংসারে এমন দিন আসছে যেদিন খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সব কিছুই মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। জানতাম না যে এমন দিন আসছে প্রেম, পুণ্য, ভালবাসা, স্নেহ, দয়া, মায়া যেদিন অর্থমূল্যে যাচাই হবে, কড়ি দিয়ে কেনা যাবে। সমস্ত কিছু পণ্য বলেই গণ্য হবে।

সেই লারম্যান মশাই-ই প্রথম আমার জীবনে সেই ধারণা বদ্ধমূল করে দিলেন।

ঘটনাটা ঘটলো এই রকম: সেই শতাব্দী পত্রিকারই তৃতীয়

সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। প্রবন্ধটির নাম 'আধুনিক বাঙলা ছোটগল্প'।

এমন প্রবন্ধ তো কতই প্রকাশিত হয়। কয়েকজন মাস্টার সাহিত্যিক আছে, তারা ওই ধরনের কিছু প্রবন্ধ লিখে সাহিত্য খ্যাতি অর্জন করার চেষ্টা করে, মাস্টারি করে করে এমন নেশা হয়ে যায় তাদের যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তারা মাস্টারি বিদ্যে প্রয়োগ করতে চায় বলে সাহিত্যক্ষেত্রও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

কিন্তু এ প্রবন্ধটি সে জাতীয় নয়। রসজ্ঞ মনের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির উদার সমন্বয়ের নিদর্শন প্রবন্ধটিতে সুস্পষ্ট। বঙ্গবিখ্যাতদের নাম এবং গুণাবলীর বিবরণ তাতে বিশ্লেষণ সহকারে দেওয়া আছে। তখনকার দিনে যাঁরা খ্যাতির শিখরে তাঁদের নামের উল্লেখ তো আছেই এবং তাঁদের সাহিত্যকৃতির যোগ্য সমাদরও সন্নিবেশিত হয়েছে।

বড় ভালো লাগলো প্রবন্ধটি পড়ে।

লারম্যান মশাই সেদিন এসে বললেন—প্রবন্ধটা কেমন লাগলো?

মন খুলে প্রশংসা করলাম। বললাম—এক কথায় অপূর্ব।

লারম্যান মশাই বললেন—খুব পণ্ডিত লোক, জানেন পণ্ডিত হলেও কিন্তু আবার রসবোধ আছে, যেটা সাধারণত ও লাইনে থাকে না।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—লাইন মানে? কীসের লাইন?

—ওই মাস্টারি লাইন। ভদ্রলোক প্রফেসার কিনা। টাকী কলেজের বাঙলার প্রফেসর। সব্বাই প্রশংসা করেছে প্রবন্ধটার।

পত্রিকার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই বললাম—ওঁকে দিয়ে আরো প্রবন্ধ লেখান।

—লেখাবো। কিন্তু খুব পণ্ডিত লোক তো, পড়া নিয়েই বেশিক্ষণ কাটান, লিখতে চান না মোটে, অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি, আর একটা লিখবেন বলেছেন।

লারম্যান মশাই আরো অনেক কিছু বলতে লাগলেন। তারপরে এক সময়ে বিদায় নিলেন। এমনি করে বস্তুত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলো। কাগজের কিসে উন্নতি হয়, কাকে দিয়ে লেখানো যায়, সে সব উপদেশও উপযাচক হয়ে দিতে লাগলাম। বলতে গেলে আমিও লারম্যান মশাইএর সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়ে উঠলাম। লারম্যান মশাইএর উপকারের জন্যে বিনা দক্ষিণাতেই গল্প দিতে লাগলাম।

কিন্তু হঠাৎ একদিন একটা অঘটন ঘটলো।

এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আলাপ হলো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। কী নাম? গীষ্পতি ভট্টাচার্য। বললাম, আপনিই কি 'আধুনিক বাঙলা ছোটগল্প' নাম দিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন একটা?

তিনি বললেন—হ্যাঁ—

বললাম—আর লেখেন না কেন? আপনার প্রবন্ধটা আমাদের সকলের খুব ভালো লেগেছিল। আমি সম্পাদককে বলেছিলাম আপনাকে দিয়ে আরো লেখাতে।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—সম্পাদককে কি আপনি চেনেন?

বললাম—খুব চেনাজানা হয়েছে সম্প্রতি। তিনি আমার লেখার একজন ভক্ত। কাগজের প্রথম সংখ্যাতেই আমার লেখা বেরিয়েছে।

—সম্পাদক আপনার লেখার ভক্ত?

বললাম—হ্যাঁ।

—আপনি ঠিক জানেন তিনি আপনার লেখার ভক্ত?

বললাম—তিনি নিজেই তো সে-কথা বলেন।

—তাহলে তিনি আপনার নামটা আমার প্রবন্ধ থেকে কেটে দিলেন কেন?

—কীসের নাম? কার নাম? কোন্ প্রবন্ধ?

ভদ্রলোক বললেন—ওই 'আধুনিক বাঙলা ছোট গল্প' প্রবন্ধতে তো আপনার নামও ছিল। তিনি সমস্তটা ছাপিয়েছিলেন, কিন্তু

তিনি যদি আপনার ভক্তই হবেন তো তা থেকে শুধু আপনার নামটা কেটে বাদ দিয়েছেন কেন ?

এর পর কত বছর কেটে গেছে। সে যুগও বদলে গেছে নিজেও বদলে গিয়েছি। সেই লারম্যান মশাইও বদলে গেছে। সে পত্রিকাও এখন উঠে গেছে। কিছুই চিরকাল এক রকম থাকে না। লারম্যান মশাইও আর সে-রকমটি নেই। কলকাতার একটি বিখ্যাত ছাপাখানায় তিনি এখন হেড্-প্রুফ্রীডার। সেই আগেকার মত যোগাযোগ নেই আর। বহুদিন পরে একদিন শুধু দেখা হয়েছিল। তখন তাঁর খুব দুরবস্থা। ঘটনাটা মনে করিয়ে দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সেদিন আমার নামটা কেটে দেওয়ার কারণটা কী! লারম্যান মশাই অকপটে স্বীকার করেছিলেন—ঈর্ষা। সেদিন সেই এক খ্যাত পত্রিকার একটি প্রবন্ধের এক কোণে আমার নামটা ছাপা হয়ে গেলে পাছে আমি বিখ্যাত হয়ে যাই সে ভয় তাঁর হয়েছিল। তাই নির্মমভাবে আমার নাম কেটে দিয়েছিলেন। শেষকালে স্বীকার করেছিলেন—বিমলবাবু, আমি ভেবেছিলাম আপনার নামটা কাটলেই আপনার কপালটা কাটা হবে। কিন্তু তা হয় নি, আপনার কপাল কাটতে পারি নি!

সেই শুরু, তারপর এত বছর ধরে আরো অনেক লারম্যান আরো অসংখ্যবার আমার নাম কেটেছে। এখনও কাটছে, জীবনের শেষ দিনের মুহূর্তটি পর্যন্ত এমনি করেই লারম্যান মশাইরা আমার নাম কেটে চলবে। কিন্তু তাতে বিচলিত হলে সাহিত্য-নিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটে। ওতে দ্বিধা করতে নেই। কারণ শিল্পীর পক্ষে তার নিজের জীবদ্দশাটাই সব নয়। এই নাম-কাটা, এই বিরুদ্ধ-ভাষণ, এই অপযশ, এই প্রশংসা, এই সম্বর্ধনা, এই পুরস্কার, এই তিরস্কার—এ সমস্তটাই সংগ্রাম। শিল্পীকে এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই ধ্রুব-চিত্তের ভরসায় যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা করতে হয়। তবেই সিদ্ধি আসে। তার আগে নয়।

ক'লকাতার উপকণ্ঠ ঃ চেতলা

বিমল মিত্র বাল্যকালে যে-স্কুলে পড়েছিলেন তার প্রাক্তন ছাত্র সমিতির মুখপত্রে এই প্রবন্ধটি প্রথম ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু চেতলার ইতিহাস ও তার সমৃদ্ধির মূলে মেজর টলির অবদানের কথা হলেও লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি কৈশোরে যে স্কুলে পড়েছিলেন সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। লেখক শিক্ষকজীবনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাই তাঁর 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'একক দশক শতক' ও 'কন্যাপক্ষে'র মধ্যে "পজিটিভ ক্যারেকটার" হিসেবে শিক্ষক চরিত্রের চিত্র তিনি এঁকেছেন। লেখকের অন্যান্য রচনায় যেমন বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তেমনি এ প্রবন্ধটিতেও তা আছে। প্রসঙ্গতঃ মেজর টলির সম্পর্কে বলা যায় যে তিনি বাংলাদেশে ১৭৬৭ সালে প্রথম আসেন। তখন ছিলেন তিনি সৈন্যবিভাগের একজন "ক্যাপ্টেন", ১৭৭৩ সালে ও ১৭৮২ সালে তিনি যথাক্রমে মেজর ও লে: কর্ণেল পদে উন্নীত হন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে চাকুরিতে ইস্তফা দেন এবং ঐ বৎসরই তিনি মারা যান। মেজর টলি "বেলভেডিয়ার হাউস"-এর মালিক ছিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি এ বাড়ীটি ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছ থেকে কিনে নেন।

* * *

বয়েস যতো বাড়ছে, ততই পুরোনো পাঁজি ঘাঁটছি। বয়েস বেশী হওয়ার অনেক অসুবিধে। কথা বলা বেড়ে যায়, সহ্য ক্ষমতাও কমে। যাকে বলে পরমত-অসহিষ্ণুতা। এ-সব ছাড়া দাঁত-পড়া, হজম-শক্তি কমা, চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়া ইত্যাদি ত আছেই। মোট কথা, বুড়ো হওয়ার সাড়ে পনেরো আনাই কেবল অসুবিধে। দু'পয়সা যা বাকী, সেইটেই কেবল সুবিধে। খুঁজে খুঁজে সেই দু'পয়সার সুবিধেটুকু আমি অনেক কষ্টে আবিষ্কার করেছি।

সুবিধেটা হলো এই যে, ছেলেবেলায় যার আরম্ভটা দেখেছি, তার শেষটুকু দেখবার সুযোগ পাওয়া যায় বেশী বয়স হলে, এই ধরুন, ছোটবেলায় হয়ত কাউকে বলেছিলুম,—লোকটা উচ্ছন্নে যাবে—

কিন্তু, বুড়ো বয়সে দেখলাম, উচ্ছন্নে তো সে যায়ই নি, বরং উল্টে ধনেজনে বিষয়-বৈভবে লক্ষ্মীলাভ হয়েছে তার।

এমনি অনেক মানুষ অনেক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনও দেখেছি, আবার তার পরিণতিও দেখবার স্থযোগ পেয়েছি। হয়ত কখনো সে-পরিণতি আনন্দের, কখনো বা দুঃখের। কিন্তু, বেশী বয়স হবার সৌভাগ্যে দেখবার সুযোগ হয়েছে। এবং জীবনে যখন দেখাটাকেই নেশা এবং পেশা করে ফেলেছি, তখন তার জন্য আনন্দও পেয়েছি।

এই যেমন চেতলা। চেতলার কথাই ধরা যাক।

কবে একদিন একটি অখ্যাত গ্রাম ছিল এটি। তখন এখানে বাঘ বেরিয়েছে, সাপ বেরিয়েছে, ডাকাতের ভয়ে মানুষ সন্ধ্যে থেকেই ঘরের খিল বন্ধ করে থেকেছে। সে-সব দিনের কথা না দেখলেও কল্পনা ত করে নিতে পারি?

তখন আলিপুরে সেরেস্তা কাছারি হয় নি। শুধু আদিগঙ্গা পেরিয়ে মা-কালীর মন্দির। চেতলার লোক চাষ-বাস করে, পাঁচালী শোনে, কিংবা, অবসর সময়ে খাল-বিল-পুকুরে, কি, আদি-গঙ্গায় মাছ ধরে। এমনি করেই সুখে-দুঃখে চেতলার মানুষদের দিন কেটে যাচ্ছিল। তারা হিন্দু-বৌদ্ধ-পাঠান-মোগল আমলের রাজা-বাদশার উত্থান-পতন নিয়ে মাথা ঘামায় নি। এরই মধ্যে কবে বর্গীর হাঙ্গামা হয়েছে, কবে শোভা সিংহের বিদ্রোহ হয়েছে, কবে চুপি চুপি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফিরিঙ্গীরা এসে তাদের গ্রামের পাশেই মাথা গলিয়েছে, তারও খেয়াল করে নি। বেহালার মানুষ রাস্তার মানুষ দেখে জিজ্ঞাসা করেছে,—কোথায় চললে ঘোষের পো?

ঘোষের পো বলেছে, চেতলায়—

বেহালার মানুষ অবাক হয়েছে। বলেছে,—তোমার ত খুব সাহস ঘোষের পো, এই ভর সন্ধ্যেবেলায় চেতলায় চললে! প্রাণের ভয়ডর নেই তোমার?

তা চেতলার তখন আর দোষ কী। চেতলা তখন ক'লকাতার তুলনায় স্বর্গ। চেতলার ওপারে ভবানীপুর, চৌরঙ্গী, ডালহৌসী স্কোয়ার তখন আরো ভয়ঙ্কর জায়গা। ভবানীপুরের হোগলার বনে তখন পর্তুগীজ ডাকাতদের প্রতিপত্তি পসার খুব। ছেলে-মেয়ে ডাকাতি করে এনে তখন ওইখানে বেচা-কেনা করে ফিরিঙ্গীদের কাছে। সে তুলনায় চেতলা নিরুপদ্রব স্থান, নিরাপদ জায়গা। একদিকে দিল্লীর মসনদের রাজকীয় ষড়যন্ত্র, আর একদিকে মুর্শিদাবাদের আমলাতন্ত্র। অন্যদিকে বর্গীর হাঙ্গামা। তারপর 'বড়শে-বেহালার' সাবর্ণ চৌধুরীদের আমলা-কর্মচারীদের হামলা ত হামেশাই লেগে আছে। এর মধ্যে চেতলার মানুষরা বলতে গেলে বেশ নিরুপদ্রবেই দিন কাটাচ্ছিল।

কবে জব চার্নক ১৬৯০ সালে কলকাতার প্রতিষ্ঠা করলেন, কবে এখান থেকে সুতো, তুলো, পাট চালান যেতে লাগলো বিলেতে, তারও খবর রাখলে না। কবে ধান ভানার কল, নোট ছাপার কল, বাষ্পীয় জাহাজ এসে হুগলী নদীতে ঠেকলো, তারও খবর রাখলে না। শুধু হঠাৎ একদিন দেখলে, এখানে চেতলার বুকে ফিরিঙ্গীদের একটা কাছারি-বাড়ী হয়েছে।

কবে কোন্ সালে, কোন্ তারিখে কাছারি হয়েছে, তা গবেষকরা বলতে পারেন। আমি গবেষক নই। তবে চেতলা জায়গাটা যে কলকাতাতেও নয়, আবার কলকাতার বাইরেও নয়, এটা আমি জানি। এ-এক অদ্ভুত ভূগোল এর। এ যেন শহর হয়েও শহর নয়। বর্তমান ভূগোলের ম্যাপের তিব্বতের মতন এর অবস্থাটা। না—ঘাটকা না-ঘরকা। পুরোনো কলকাতার ম্যাপে আবার চেতলার নাম-গন্ধও নেই। আলিপুর আছে, ভবানীপুর আছে, কালীঘাট আছে, চেতলা নেই। আমরা ট্যাক্স দেই কলকাতার হারে, কিন্তু পুরো সুবিধে পাইনে কলকাতার।

কলকাতার কয়েকটা ইতিহাস-ভূগোলের বই আছে, তাতেও এ-জায়গার নাম নেই দেখছি। আবার চব্বিশ পরগণার বইতেও এর নামোল্লেখ নেই। ব্যাপারটা অনুসন্ধানের যোগ্য।

অনুসন্ধান করতে করতে ছাপার অক্ষরে প্রথম চেতলার নাম পাওয়া গেল ১৯০৩ সালে ছাপা একখানা বইতে। আজ থেকে ১৩৯ বছর আগের বিবরণ তাতে লেখা হয়েছে। রামতনু লাহিড়ী প্রথম কলকাতায় এসে এই চেতলায় ওঠেন তাঁর এক আত্মীয়ের বাসায়। সে ১৮২৬ সালের কথা। বইটি থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিলে আপনারা তখনকার চেতলা সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পারবেন। চেতলা সম্বন্ধে মন্তব্যটা একটু কটু হলেও উপভোগ্য :—

"তখন চেতলার সন্নিকটে ইংরাজী স্কুল ছিল না। চেতলার দাস-দাসীগণকে এখনও যেরূপ বিকৃত দেখা যায়, তখন তাহারা যে কিরূপ ছিল বলিতে পারি না। সর্বত্রই দেখিতেছি, তীর্থস্থানের সন্নিকটে সামাজিক নীতির অবস্থা অতি জঘন্য। বহু সংখ্যক অস্থায়ী গতিশীল নরনারী এই সকল স্থানে সর্বদাই আসিতেছে ও যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া বা পাপে লিপ্ত করিয়া কিছু উপার্জন করিবার মানসে অনেক স্বার্থপর, ধর্মজ্ঞানশূন্য লোক এই সকল তীর্থস্থানের চারিদিকে বাস করে। দুশ্চরিত্রা নারীদিগের গৃহে এই সকল স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। যাত্রীদিগকে বাসা লইতে হইলে অনেক সময় এই সকল নারীদের ভবনে বাসা লইতে হয়। তাহারা দিনে যাত্রীদিগকে বাসা দিয়া ও রাত্রে বারাঙ্গনা বৃত্তি করিয়া দুই প্রকারে উপার্জন করিতে থাকে। যখন রূপ ও যৌবন গত হয়, তখন ইহাদের অনেকে ভদ্র গৃহস্থ-দিগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। চেতলা তখন এই শ্রেণীর পুরুষ ও নারীতে পূর্ণ ছিল। বর্তমান সালের ন্যায় তখনও চেতলা বাণিজ্যের একটা প্রধান স্থান ছিল।

বর্ষে বর্ষে ইংলণ্ডে যে সকল চাউলের রপ্তানী হইত, চেতলা সে-সকল চাউলের সর্বপ্রধান হাট ছিল। এতদর্থে সুদূর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে, এবং দক্ষিণ মগরাহাট, কুলপী প্রভৃতি স্থান হইতে শত শত চাউলের নৌকা ও শালতি আসিয়া কালীঘাটের সন্নিকটবর্তী টালীর নালা নামক খালকে পূর্ণ করিয়া রাখিত।

সুতরাং পূর্ববঙ্গনিবাসী গোলাদার, আড়তদার ও বাঙ্গাল মাঝি প্রভৃতিতে চেতলা পরিপূর্ণ ছিল। এরূপ প্রবাস বাসী—বণিক-দলের আবাস স্থানে কিরূপ লোকের সমাগম হয়, সকলেই তাহা অবগত আছেন। সকলেই অনুমান করিতে পারেন কিরূপ সামাজিক জলবায়ুর মধ্যেও কিরূপ সংসর্গে বালক রামতনু চেতলাতে থাকিতেন। সৌভাগ্যের বিষয়, এরূপ স্কুলে ও সংসর্গে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই।"

ছাপার অক্ষরে চেতলা সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া গেল, তা আজকের নয়। এ আজ থেকে ১৩৯ বছর আগেকার চিত্র। বোঝা গেল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আবির্ভাবের পর থেকে ১৮২৬ পর্যন্ত, অর্থাৎ একশো উনচল্লিশ বছরে চেতলার যা পরিবর্তন হয়েছে তা একজন ভদ্রসন্তানকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ওই সময়ের একজন বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর ছোট বেলায় একটি কবিতা রচনা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে।

কবিতাটি এই—

রেতে মশা দিনে মাছি
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।

মিথ্যের দিক থেকে কবিতাটি যতখানি অনবদ্য, সত্যের দিক থেকে বোধ হয় ততোধিক। ছোটবেলা থেকে এ-কবিতাটি শুনে শুনে আমাদের এখন প্রায় চির-স্মরণীয় হয়ে আছে। ঠিক এই রকম আর একটি কবিতা আছে চেতলা সম্বন্ধে। চেতলারই কোনো যশলিপ্সুহীন কবি লিখে গেছেন,—

চাল চিঁড়ে ঝ্যাঁতলা
এই নিয়ে চেতলা।

'ঝ্যাঁতলা' যে কী বস্তু, তা জানি না। অনুমান করি, মাদুর বা শেতলপাটি জাতীয় কোনো শয্যাদ্রব্য। এখন চেতলায় তা বোধ হয় দুষ্প্রাপ্য। তবে চাল আর চিঁড়ে সম্বন্ধে যে উক্তি আছে তা আজকের পটভূমিকায় নিশ্চয়ই লজ্জার বা সঙ্কোচের নয়। আমরা

যখন ছোট, তখন উপরোক্ত সবগুলো জিনিসের কিছু কিছু সাক্ষ্য দেখেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে রেনেসাঁস-এর সূত্রপাত হয়, মনে হয় এই চেতলা তা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বহুদিন। বিচ্ছিন্ন থাকবার ভৌগোলিক কারণটাই হলো আসল। পূর্বে গঙ্গা, উত্তরে জেলখানা, দক্ষিণে রেল-লাইন। তিন দিক আঁটা। যাবো কোথায়? এখনকার মতো তখন না ছিল ট্রাম, না বাস, না ট্যাক্সি। তার চেয়ে এখানেই থাকবো আত্মসন্তুষ্ট হয়ে। আত্মবিলাপ করে। কিন্তু ইতিহাসের যিনি ভগীরথ, তিনি চুপ করে থাকতে পারেন না। তাঁর একদিন ঘুম ভাঙলো।

ভগীরথ গঙ্গাকে এনেছিলেন মর্তে,—সে হলো পৌরাণিক কাহিনী। বাঙলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে—খাল কেটে কুমীর আনা। ভগীরথের গঙ্গার সঙ্গে কুমীরও এসেছিল কিনা তা পুরাণে লেখে না, কিন্তু এটাও সবাই জানেন যে মকর-কূর্ম ওরা সব আমাদের দেবতারই শামিল। কলিযুগে ফিরিঙ্গীরাই দেবতা। এই রকম একজন ফিরিঙ্গীই আমাদের চেতলায় এসেছিলেন নব-ভগীরথ হয়ে। তাঁর নাম মেজর ডবলিউ টলি।

মেজর টলি কোথাকার লোক, কোথায় তাঁর বাড়ী, এখানে কোথায় তাঁর কবর কিছুই কেউ জানে না। আমরাও জানতাম না। আমরা ছোটবেলায় চেতলার স্কুলে পড়তে এসেছি। ছুটির পর আদি গঙ্গার ধারে এসে হাওয়া খেয়েছি। ওপারে তখনকার বালিগঞ্জ-শা'নগরের বন-জঙ্গলের দিকে চেয়ে চেয়ে দু'পাশের ধান-গোলার আমদানী-রপ্তানী দেখেছি। অসংখ্য মোষের গাড়ীতে ধানের চালান লক্ষ্য করেছি। বড়ো বড়ো নৌকোর আমদানী দেখেছি গঙ্গায়। কাঠের লম্বা সিঁড়ি পেতে দেওয়া হয়েছে রাস্তা থেকে একেবারে নৌকোর ওপর পর্যন্ত। মুটের মাথায় ধানের বস্তা বোঝাই হয়েছে দিনের পর দিন।

আর শুধু কি ধান? ডিঙি ভর্তি খড় এসে জমা হয়েছে গঙ্গায়। মাঝিরা সেই নৌকার ভেতরই সংসার পেতেছে। আর ভোর হতে না হতেই মাঝিরা খড় মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পাড়ায় পাড়ায়। গলির ভেতর তারা খড় ফিরি করেছে চীৎকার করে,—খড় চাই—খড়—

তারপর বর্ষার দিনে এই গঙ্গাতেই আবার বান এসেছে। বান এসে রাস্তা ডুবে গেছে। ক্রমাগত তিন চার দিন বৃষ্টির পর রাস্তা-ঘাট-পুকুর সব ডুবে গেছে। আমরা ভিজতে ভিজতে স্কুলে এসেছি। দেখেছি গঙ্গা একেবারে জলে টই-টম্বুর। তখনো জানি না, চেতলার এই যে সমৃদ্ধি, এর পেছনে মেজর টলির দান কতখানি। তখনো মেজর টলিকে একবারও স্মরণ করি নি।

মনে আছে এক বছর ভীষণ বর্ষা নামলো। ভেসে গেল চেতলা। তিন-চার দিনের পর যখন প্রথম সূর্য উঠলো, তখন বাড়ী থেকে বেরোলাম। দেখলাম,—সব সমুদ্র হয়ে গেছে, ওদিকে গোবিন্দ আঢ্য রোড, পশ্চিমে মায়ারপুর রোড (এখন যার নাম পিয়ারীমোহন রায় রোড), সব জলে একাকার, সেই জল দেখতে রাস্তায় বেরিয়েছে ছেলে বুড়ো সবাই। পুকুরগুলো সব একাকার, বড়ো বড়ো মাছ ভাসছে। হাত দিয়ে ধরা যায় তাদের। ছোট ছোট ছেলেরা গামছা নিয়ে জলে টানছে। বালতি-বালতি মাছ ধরে জড়ো করছে ঝুড়িতে।

মায়ারপুর রোডে তখন ছিল নারাণ কলু মশাইয়ের সরষের তেলের দোকান। ভেতরে ঘানি গাছ ছিল, কতদিন সেই ঘানি গাছে উঠে আমরা মজা করেছি। সরষের তেল ছাড়া তাঁর দোকানে চাল-ডাল-নুন সবই পাওয়া যেতো। বুড়ো মোটা-সোটা মানুষ। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। খালি গায়ে দোকানে বসে থাকতেন, আর সমস্ত দিন ডাবা হুঁকোয় তামাক খেতেন। সেই বর্ষার দিনে যখন সমস্ত রাস্তাঘাট ডুবে গেছে, তখনো সামনে গিয়ে দেখলাম, তিনি দোকানে বসে তেমনি করেই একমনে তামাক খাচ্ছেন।

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটলো।

হাতের ডাবা হুঁকোটা পাশে রেখে দিয়ে একেবারে ষোলো বছরের ছোকরার মতন সামনের জলের ওপর ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, জ্বলন্ত হুঁকো কোনো কিছুর কথাই তখন তাঁর খেয়াল নেই। আমিও একটু অবাক হয়ে গেছি তাঁর ব্যস্ততা দেখে।

কিন্তু, দেখি, একটা বিরাট প্রায় পাঁচ-সেরা জ্যান্ত কাতলা মাছ ধরে ফেলেছেন তিনি। ধরে, সেটাকে দোকানের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু এদিকে কলকের জ্বলন্ত টিকে চালের ওপরে পড়ে দোকানে কীভাবে আগুন লেগে গিয়েছিল, তা কারোর খেয়াল ছিল না। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে তখন দোকানে। আমি দেখতে পেয়েই চীৎকার করে উঠলাম। আগুন অবশ্য তখনি নিভিয়ে ফেলা হলো। বরুণ দেবতার কাছে বৈশ্বানর হার মানলেন তখনি। কিন্তু তখনো জানি না এই যে মাছ, এই যে সরষের তেল, এই যে চেতলার সমৃদ্ধি, এর পিছনে টলি সাহেবের দান কতখানি।

ডেভিড হেয়ার সাহেব এদেশে এসেছিলেন ঘড়ি-মেরামতের ব্যবসা করতে। এসেছিলেন যা করতেই হোক, কিন্তু শেষকালে তিনি হয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষক। বাঙলা দেশের ছেলেদের তিনি মানুষ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। মেজর টলি সাহেবও এসেছিলেন হয়ত ক্লাইভ-সাহেবের দলে লড়াই করতে। হয়ত তিনিই কামান দেগে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ্দৌলাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো ইতিহাসের কেতাবে তাঁর কাহিনী লেখা নেই কোথাও। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁর নাম কোথাও পাই নি। কিন্তু কল্পনা ক'রে নিতে দোষ কী?

ইতিহাস বলছে ১৭৭৬ সালে মেজর টলি এই আদিগঙ্গা কেটে-ছিলেন।

কিন্তু কেন কাটতে গেলেন, কীসের দায় পড়লো তাঁর?

তখন সারা বাঙলাদেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কবলে। সিরাজ-উদ্দৌলা নিহত। সাহেবরা মোটা মোটা টাকা লুটপাট করে ছোটখাটো নবাব হয়ে বসেছে। সেই সময় তিনি চাকরি থেকে রিটায়ার করলেন। রিটায়ার করে আর নিজের দেশে ফিরে গেলেন না। বিবিকে নিয়ে এদেশেই বাস করতে লাগলেন। অনেক টাকার মালিক হয়ে বসেছেন তখন। কেবল খান দান, আর শিকার করে বেড়ান। কলকাতায় সব জায়গাটাই তখন শিকারের পক্ষে অনুকূল।

শিকারের উদ্দেশ্যেই একদিন এলেন এই চেতলায়। এই চব্বিশ পরগণার চেতলা তৌজিতে। নল-খাগড়া আর হোগলা বনের ভেতরে সরু মেটে পথ দিয়ে পালকি চড়ে যেতে যেতে দুপাশের অধিবাসীদের দুর্দশার চিহ্ন তাঁর নজরে পড়লো।

বেহারাদের জিজ্ঞেস করলেন,—এ জায়গার নাম কি ?

বেহারারা বললে,—চেতলা তৌজী হুজুর—

জিজ্ঞেস করলেন,—এখানকার লোকদের এত দুরবস্থা কেন ?

বেহারারা বললে,—হুজুর, আদিগঙ্গা শুকিয়ে গেছে, এখানে ফসল হয় না আর—

আরও অনেক দুর্দশার কথা জানালে তারা। খিদিরপুর থেকে এই আদিগঙ্গা একেবারে সোজা কুলপী হয়ে বিদ্যাধরীতে গিয়ে পড়তো।

সেখান থেকে মাতলাতে।

তখন এখানকার লোকদের অবস্থা ভালো ছিল। এই আদি গঙ্গা দিয়ে কামার কুমোর তেলি সকলের পসরা বিদেশে যেতো। খড় জ্বালানি-কাঠ সমস্ত। গঙ্গা শুকিয়ে যাবার পর থেকে সকলের উপোস চলেছে। কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। কাজ-কারবার খতম। রোগ-ভোগ বেড়েছে। এখানে আর থাকা চলবে না। এখানকার কাওরা, এখানকার চাষী-ক্ষেত-মজুরদের আধপেটা চলছে এখন।

দেখে সাহেবের দয়া হলো বড়ো।

পরের দিন তিনি লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রস্তাব দিলেন তিনি নিজের খরচে এই খাল কেটে দেবেন। তাঁকে যেন কোম্পানী থেকে এই জমি ইজারা দেওয়া হয়।

তা তাই-ই মঞ্জুর হলো।

লম্বা এই আঠার মাইল খাল। একেবারে খিদিরপুরের মুখ থেকে দক্ষিণের তারদহ পর্যন্ত। ১৭৭৭ সালে খালটা কাটা আরম্ভ হলো। তার কিছুদিন আগেই ১৭৭০ সালে, অর্থাৎ বাঙলা ১১৭৬ সালে কুখ্যাত ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর গেছে। দেশের দুর্দশা তখন চরমে পোঁচেছে। সেই সময়ে টলি সাহেবের কাজ পেয়ে হাজার হাজার কুলি-মজুর কোদাল নিয়ে খাল কাটতে লাগলো। এক বছরও লাগলো না এই খাল শেষ হতে। রাতদিন কাজ করে ১৭৭৭ সালে গঙ্গার জল আবার বিদ্যাধরীতে গিয়ে পড়লো। আবার ধনে জনে পূর্ণ হয়ে উঠলো জনপদ। আবার কামার-কুমোর তেলি-কাওরারা খেতে পেয়ে বাঁচলো। নৌকা এসে কুদ্ঘাটাতে লাগলেই টলি সাহেবের লোক কুদ্ঘাটায় টোল আদায় করে। বড় জোর এক পয়সা কি একটা আধলা। কিম্বা কড়ি।

তা হোক, তবু তো খেতে পাচ্ছে লোক। তবু তো ব্যবসা-বাণিজ্য চালু হয়েছে, একেবারে সেই খিদিরপুরের মুখ থেকে একেবারে কুলপী, গড়িয়া, পিয়ালী, বিদ্যাধরী মাতলা পর্যন্ত।

এরপরে আর কিছু জানতে পারা যায় না টলি সাহেব সম্বন্ধে। ১৭৯৪ সালের ১৮ই মার্চ তারিখের ক্যালকাটা গেজেটের একটা বিজ্ঞাপনে দেখা গেল শ্রীমতী আন্না মারিয়া টলি জনৈক জন্ হুপার উইলকিন্‌সন্ নামের এক সাহেবকে তাঁর এই খালের স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছেন। তখন থেকে টলি সাহেবের বিধবা মেম সাহেবের আর কোনও অধিকার রইল না। তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে টলি সাহেব ততদিনে মারা গিয়েছেন। আর তাঁর বিধবা পত্নীই সেই স্বত্ব ভোগ করছিলেন। যাই হোক, তারপর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে বাঙলা সরকারই এই খালের স্বত্বাধিকারী হয়ে গেলেন চিরকালের মতন।

আমরা কিন্তু তখন এ সব কিছুই জানতাম না। জানতাম না কার নাম স্মরণীয় করবার জন্যে টালিগঞ্জের নামকরণ করা হয়েছে। জানতাম না কোন্ মিলিটারি সাহেবের কৃপায় আমরা তৌজির সমৃদ্ধি দেখছি। তখন চেতলায় হাসপাতাল হয়েছে। রাস্তা হয়েছে। অসংখ্য বাড়ি হয়েছে। ইংরেজী স্কুল হয়েছে। আমরা আরো দু'দশ জনের মত চেতলায় এসে সেই সমৃদ্ধি ভোগ করছি। এক-জোড়া জুতো কিনতে হলে অবশ্য ভবানীপুরে যেতে হয়। কলেজে পড়তে গেলে ভবানীপুরে যেতে হয়, সব কাজেই আমাদের অবশ্য ভবানীপুর ভরসা। কিন্তু যা হয়েছে তাই-ই বা কম কী। তাই বা টলি সাহেব না হলে আর কে করতো!

স্কুল তখন বেশ জম-জমাট। মনে আছে সুরেশবাবুর কথা। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। চমৎকার সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান চেহারা, আগাগোড়া খদ্দরের পোশাক। ভয় যেমন তাঁকে করতাম—ভক্তিও করতাম তেমনি। তাঁকে দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যেত আমাদের। এক-একদিন ক্লাসে এসে এক-একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করতেন। তিনি আমাদের ইংরেজী পড়াতেন। ছোটবেলাকার সেই ভয় কবে একদিন ফার্স্ট ক্লাসে পৌঁছে ভক্তিতে পরিণত হয়েছিল টের পাই নি। তাঁর ক্লাসে কোনও গোলমাল হবে না। তাঁর ক্লাসে কোনও ফাঁকি চলবে না। তাঁর কাছ থেকে কোন ছুটি পাওয়া চলবে না। তখন অকারণে ছুটি দেওয়ার কোন নিয়মই ছিল না। তুচ্ছ কারণে ছুটি চাওয়ার রেওয়াজ ছিল না সে যুগে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগ সেটা। পৃথিবীতে তখনও ডিক্টেটরের জন্ম হয়নি। সদা সত্য কথা বলার যুগ। সিনেমা স্টার বা ফুটবল খেলোয়াড়রা তখনও ছাত্রদের আদর্শ হয়নি। চুলে চিরুনি ছোঁয়ানোও তখন অপরাধ। বয়োবৃদ্ধদের সামনে গান গাওয়া বা শিস দেওয়া তো গর্হিত অপরাধের শামিল।

আজও অনেক সময় সেই যুগটার কথা ভাবি, শিক্ষক-ছাত্রদের

সম্পর্কটা তখনও এমন জটিল হয়ে ওঠেনি। দেবেনবাবু শাসন করেছেন। সে শাসন শারীরিক, তাতে দেহ পীড়িত হতো বটে, কিন্তু মন কলুষিত হতো না। অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্ত গুণ সেই সময়ে বাংলা দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পুরোমাত্রায় কায়েম হয়েছে। ক্লাসের যারা বেয়াড়া ছাত্র, তারা বেয়াড়াপনা করেছে বৈকি। একেবারে গঙ্গার ধারে প্রসন্নময়ী ঘাটের আড়ালে বসে সিগারেটে টান দিয়েছে। কিন্তু সে অত্যন্ত গোপনে, গার্জেন টিচার সকলের অগোচরে। নিজেদের অপরাধ সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল। সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত ইংরেজী পড়িয়ে এসেছেন অন্য এক শিক্ষক। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে সুরেশবাবুর পড়ানো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পেছন দিকের বেঞ্চে যারা গোলমাল করতাম, তাঁর ক্লাসে সামনের বেঞ্চে এসে বসতে লাগলাম। সেদিন ক্লাসে এসেই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন সুরেশবাবু। বললেন, বলো তো মেজর টলি কে ছিলেন ?

মেজর টলি! ক্লাসের ভালো ছেলেদের মুখের দিকে চাইলাম। সবাই ভাবনায় পড়লাম। মেজর টলির নাম তো শুনিনি কখনও। কোন বইয়েই তখন পড়িনি। তিনি আবার বললেন—তোমরা যদি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারো তো আজ তোমাদের ক্লাসের ছুটি দিয়ে দেব।

ছুটি জিনিসটা তখন আমাদের দুর্লভ সামগ্রী! সহজে ছুটি পাওয়া যায় না তখন এখনকার মত। হরতালও হয় না তখন, ধর্মঘট হয় না। একেবারে জেলখানার মত। অধ্যয়ন জপ-তপ ধ্যান। তিনি আবার বললেন—তোমাদের মধ্যে যে কোনও একজন বলতে পারলেই সবাই ছুটি পেয়ে যাবে—বলে তিনি আমাদের সকলের মুখের দিকে চেয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কেউ জানে না মেজর টলিকে। কী জন্যে তিনি বিখ্যাত। আমরা সবাই আকাশ-পাতাল খুঁজতে লাগলাম। স্বামী বিবেকানন্দের নাম জিজ্ঞেস করলে বলতে পারতাম আমরা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হলেও পারতাম বলতে। মহাত্মা গান্ধী, সি-আর-দাস, আশুতোষ মুখার্জীর নাম হলেও বলতে পারতাম। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন হলেও বলতে পারতাম। সকলের কর্মজীবনী জন্ম সব বলতে পারতাম। কিংবা যদি চার্লস ল্যাম্, কিংবা লর্ড বাইরন-এর নাম জিজ্ঞেস করতেন তাও বলতে পারতাম। শেক্সপীয়র, মিলটন হলেও বলতে পারতাম কেউ কেউ। সুরেশবাবু হাসলেন। বললেন—নিজের পাশের বাড়ির খবর রাখো না! লজ্জায় আধমরা হয়ে গেলাম। লজ্জা হলো নিজেদের অজ্ঞতায় ঠিক নয়। লজ্জা হলো নিজেদের পাশের বাড়ির খবর না রাখায়। চেয়ে দেখলাম রমেশের দিকে, চেয়ে দেখলাম সতীশের দিকে, চেয়ে দেখলাম মণীন্দ্রের মুখের দিকে। আমি না-হয় খারাপ ছেলের দলে। কিন্তু তারা তো ভালো ছেলের দলে। সুরেশবাবু বললেন—কেউ পারলে না?

আত্মধিক্কারে তখন আমাদের অর্ধমৃত অবস্থা। আমরা সেদিন কেউ উত্তর দিতে পারিনি সে-প্রশ্নের। আমরা নিরুত্তর হয়ে যে-যার মুখের দিকে চেয়েছি কেবল। আমাদের ছুটি হবে। আমরা মুক্তি পাবো।

কিন্তু ছুটি আমাদের কপালে নেই।

আমরা পাশের বাড়ির খবর বলতে পারিনি সেদিন। বলতে গেলে আমরা নিজেদের খবর রাখিনি। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। আমরা ছুটি পেলাম না। আজ এতদিন পরেও সেই দিনের কথা ভাবতে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দিই। শেষ পর্যন্ত সেই সুরেশবাবু সেদিন আমাদের ছুটি দেননি। আমরা শুকনো মুখে চুপচাপ আবার তাঁর পড়ানো শুনতে লাগলাম। ঘণ্টা পড়লো। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর বাড়লো। তবু ছুটি পেলাম না। মুক্তি হলো না আমাদের। তারপর তার কিছুদিন পরে তিনি নিজেই ছুটি নিলেন। ছুটি নিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু আজও এক-এক সময়ে মনে হয় যদি

তাঁর দেখা পাই তো বলবো—স্যার, এবার ছুটি দিন, এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো—

কিন্তু কোথায় বা সেই সুরেশবাবু, কোথায়ই বা সেই দিন-গুলো। কোথায়ই বা সেই ছাত্র-জীবন। সংসারের হাজার হাজার সুরেশবাবুরা তারপর হাজার হাজার প্রশ্ন, হাজার হাজার সমস্যা চাপিয়ে দিলেন মাথার ওপর। আর আমাদের ছুটি পাওয়া হলো না। আর আমাদের মুক্তি পাওয়া হবে না। মুক্তি কি অত সোজা।

আয়নার সামনে

"আয়নার সামনে" প্রবন্ধটি বোম্বাই প্রদেশ থেকে প্রকাশিত হিন্দী সাহিত্য-মাসিক "শারিকা" পত্রিকার বিশেষ অনুরোধে লেখা। ১৯৬০ সালের মে মাসের সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক রচনাটি মূল বাংলা থেকে হিন্দীতে অনূদিত করে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পরে বাংলা ভাষায় লেখা মূল পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদকের দপ্তর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। অগত্যা শ্রীদীনেশ আচার্যের সাহায্যে হিন্দী অনুবাদ থেকেই বর্তমানে আবার বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করা হলো। এই প্রবন্ধটি শ্রীমোহন রাকেশ সম্পাদিত এবং নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশিত 'আয়নেকে সামনে' নামক হিন্দী গ্রন্থে সন্নিবেশিত।

*　　*　　*　　*

আমার অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের দিকে চোখ মেলে দেখে মনে হলো যে সেখানে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যতটা পারা যায় নিজের সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। শাস্ত্রেও উক্ত হয়েছে যে প্রশংসা থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখাই উচিত—বিশেষ করে একজন সাহিত্যিকের পক্ষে। আমি নিজে একজন সামান্য সাহিত্য-পথের পথিক—সুতরাং নিজেকে আমার লেখার মধ্যে দেখলে সেটাই হবে আমার আত্ম-প্রতিকৃতি। আমার লেখাই হলো আমার সত্যিকারের আয়না। সেই আয়নায় আমার বৈশিষ্ট্য ভেসে ওঠে বলেই আমি কাচের আর্শীতে কখনও নিজেকে যাচাই করে দেখিনি।

আমি যা কিছু খাই, যা কিছু পরি, সূর্যোদয়ের সঙ্গে উঠে, সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত যা কিছু করি যা কিছু ভাবি—সেই "আমির" সবটুকুই আমার সাহিত্যে বিধৃত রয়েছে। সুতরাং আমি যদি নিজেকে আয়নার মধ্যে দেখতে চাই তো আমার লেখার মধ্যেই তা দেখা উচিত।

তবে, একটা কথা—নিজের লেখার সমালোচনা নিজে না করাই ভালো। কারণ সেই সমালোচনায় যে পক্ষপাতিত্ব থাকবে না

এমন স্থির-নিশ্চয়তা আমার নেই। ওদিকে উপনিষদেও তো বলা আছে যে—নিজের নিন্দাকে অমৃত আর স্তুতিকে বিষ মনে করবে।

আজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি যদি আত্মনিন্দা করি তাহলে তাও যেমন মিথ্যে হবে, তার চেয়ে আরও বড় ভুল হবে যদি আমি আত্মপ্রশংসার বর্ণাঢ্য রং-এ নিজেকে কলঙ্কিত করি।

ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু করেছি, যা কিছু আমার হয়েছে, আমার পূর্ণ বা অপূর্ণ কামনা-বাসনা-অভিলাষ, প্রত্যেকটি জিনিসকে আলাদা আলাদা করে আমার প্রতিবিম্বের মধ্যে খুঁজতে লাগলাম। ভাবলাম—আমার সাহিত্যের মধ্যে কি তার কণামাত্রও ছাপ আছে? আমার সাহিত্যে আমি কি আমার মনের ভাবনা ও চিন্তার সঠিক রূপ দিতে পেরেছি? এখন পর্যন্ত যা কিছু ভেবেছি তার প্রতিরূপ কি আমার সাহিত্যে ফুটে উঠেছে?—

আমি তাই চোখ মেলে দেখতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে আবার আমার ছেলেবেলাকার জীবনে ফিরে গেলাম। ছোট্ট একটি ছেলে, বিমল মিত্র। সেদিনের সেই বিমল যে প্রত্যেক জিনিসকে অবাক দৃষ্টিতে দেখত। এই পৃথিবী, এই আকাশ, এই সব কিছু দেখে সে একমনে শুধু ভাবত আর যা কিছু সত্য তাকে আঁকড়ে ধরে ভাবনার সমুদ্রে হাবুডুবু খেত।—

আমি সেই দিনকার সেই ছোট ছেলেটাকেই শুধু দেখতে লাগলাম। দেখতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম সেদিনকার ভাবনাগুলো। কে এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? আর যদি কোনও সৃষ্টিকর্তা থাকেন তো কোথায় তিনি? তাঁকে দেখতে কেমন? কোথায় তিনি থাকেন?

বাড়ি থেকে স্কুলে যাবার পথে একদিন একটা ছেলে আমার মাথায় চাঁটি মারলে।

যে চাঁটি মেরেছিল তার নাম দাশু। অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। কিন্তু সে বোধ হয় তখন তার নিজের আনন্দেই

মশগুল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—আমাকে মারলে কেন,—আমি কী করেছি?

সে তখন মনের আনন্দে হাসছে। বললে—বেশ করেছি, আমার খুশী, আমি মেরেছি—

আমি ভাবতে লাগলাম যে আমি কী এমন অপরাধ করেছি যে আমাকে এমন অহেতুক মার খেতে হবে। ভাবতে ভাবতে সেদিন অনেক কথাই মনে এসেছিল। ভেবেছিলাম বোধ হয় আমার ময়লা জামাকাপড়ের জন্যেই আমাকে মার খেতে হয়েছে। পরের দিন তাই ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড় পরে স্কুলে গেলাম—কিন্তু সেদিনও তেমনি। সেদিনও দাশুর প্রহার থেকে অব্যাহতি পেলাম না। এবার ভাবলাম আমার মাথার চুল হয়ত ভাল করে ছাঁটা হয়নি। তাই তখনি সেদিন সেলুনে গিয়ে চুল ছাঁটিয়ে নিলাম। ভাবলাম আর বোধ হয় আমাকে দুর্ভোগ সইতে হবে না। কিন্তু পরের দিন ফল একই হলো। আবার দেখা হতেই সে চাঁটি মারলে—রোজ রোজ মারতে লাগলো।

সেদিন বুঝলাম যে দোষ কারোর নয়। আমার মার খাওয়ার পেছনে বিশেষ কোন কারণ ছিল না বা দাশুর মনেও আমার প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না। এটা ছিল ওর খেয়াল। আক্রমণ করতে কারো কারো ভালো লাগে—দাশুরও ভালো লাগতো এবং আমাকে মেরে সে তৃপ্তি পেত, এইটেই বড় কথা।

মনে আছে প্রথম দিন দাশুর হাতে মার খেয়ে আমি অঝোরে কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু তখন আমার এমন একটা আশ্রয় ছিল না যেখানে বসে আমি নিরাপদে কাঁদতে পারি। কাঁদতে কাঁদতে যে বাড়ি যাব তারও উপায় নেই তখন। বাড়িতে প্রথমেই মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। মা জিজ্ঞাসা করবে—কাঁদছিস কেন? আমি বলব—দাশু মেরেছে। মা বলবে—আর সবাইকে ছেড়ে তোকেই বা দাশু মারে কেন? শুধু শুধু কি কেউ কাউকে মারে!

সেই ছোটবেলাতেই ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড সম্বন্ধে আমার একটা

স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম যে মানুষের সমাজে বিচার মানেই বিচারহীনতা। তাই তার পরে আর কোনদিন মার খেয়ে কাঁদবার নির্বুদ্ধিতা হয়নি আমার। সেই অল্প বয়েসেই আরো বুঝতে পেরেছিলাম যে নালিশ করা নির্বুদ্ধিতা। এ পৃথিবীতে মানুষের মহাধিকরণে ন্যায়-বিচার চাইতে নেই। ন্যায়-বিচার চাওয়া অন্যায়। তবে শুধু একটা জিনিস সেদিন বুঝতে পারিনি সেটা এই যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দরবারে বিচার-প্রার্থী হবার সাহস কোথায় পাবো; শুধু তাই নয়, তাঁকেই বা পাবো কোথায়?

বলতে গেলে সেইদিন থেকেই আমি ঘরে বাইরে পর হয়ে গেলাম। একেবারে আলাদা হয়ে গেলাম পরিবার এবং সমাজ থেকে। আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কলকাতায় আমার কলেজে যাওয়া আসার পথে একটা গীর্জা পড়তো। গীর্জার দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকতো 'The World Is a Mirror Look Pleasant Please'—কথাটি বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি। প্রথমে এ কথাটার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল—কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো ততই মনে হতে লাগলো এমন মিথ্যে আর দুটি নেই পৃথিবীতে। কিংবা কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে না হলেও অর্ধ মিথ্যে তো বটেই। কারণ ততদিনে আমি দাশুকে মন থেকে পরিত্যাগ করলেও দাশু আমায় ছাড়েনি। আমি স্কুল থেকে কলেজ, এবং একদিন কলেজ থেকেও বেরিয়ে এলাম। তার পর ইউনিভার্সিটি। সেই ইউনিভার্সিটির গণ্ডীও একদিন অতিক্রম করলাম। চাকরিতে ঢুকলাম—সেই চাকরিও একদিন ছেড়ে দিলাম। চাকরিতে বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল তখন। আর এখন তো বয়েস বেড়েছে। সেদিন দাশু ছিল একক। এখন সেই দাশুরা অসংখ্য।—তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আর আমি? আমি সেদিনও ছিলাম একান্তভাবেই নিঃসঙ্গ, আজও তাই।

আমার বাড়ির পেছনে একটা রেলওয়ে স্টেশন ছিল। বড় নিরিবিলি জায়গা সেটা। স্টেশনটার নাম—কালীঘাট। কখনও কখনও এক আধটা গাড়ি আসত সেখানে, কিছুক্ষণ থামতো, তারপর আবার চলে যেত। কখনও কখনও দু-চারজন যাত্রী উঠতো নামতো। স্কুল থেকে বেরিয়েই আমি সেখানে চলে যেতাম, আর সেখানেই ঘটনাচক্রে আমার দু-চারজন বন্ধু-বান্ধব জুটে গিয়েছিল। ওরা কোনদিন আমার পেছনে লাগেনি। তারা আমাকে ভালবাসত।

সেই মুক্ত আকাশ—সেই সবুজ ঘাস, পাখীর কলতান, সেই নদী, সেই তারা আর চাঁদ সকলেই আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল আর আমিও যেন একান্তভাবে তাদেরই একজন হয়ে গেলাম। বসে বসে তাদের কাছে আমি আমার মনের আর্জি বলতাম। জানি না কত কথা সেদিন বলেছি। তবে সবই ছিল একতরফা। বক্তা আমি—আর তারা শ্রোতা। সেই সব কথা বহুদিন ধরে জমে জমে একদিন মনের মধ্যে কথার পাহাড় গড়ে উঠল। আমার ভালবাসা, আমার আনন্দ, আমার অবসাদ আর দুঃখ যা কিছু জমেছিল সমস্তই ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে লাগল।

মন সেদিন বললে—যারা তোমাকে অপমান করেছে—যারা তোমাকে কিছু দেয়নি, তাদেরই তুমি তোমার মনের আর্জি জানাও। মানুষের পৃথিবীতে মানুষের জুলুমের কথা মানুষের দরবারে জানানোই উচিত—মানুষেই সে আর্জি শুনবে। নিজের প্রয়োজনেই মানুষ ভগবানকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ইচ্ছে করলে মানুষ তো নিজেও ভগবান হতে পারে। ভগবান মানুষের জীবনকে দুরবীন দিয়ে দেখে আর তাই মানুষের দেওয়া সিংহাসন দেখে ভগবান দুঃখ পায়। তাই পশুত্ব মানুষের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই ভগবান কাঁদে আর মানুষও সেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমার সেদিনকার মনের কথাগুলো অনেকটা ছিল এই রকম।

কিন্তু কি করে তা শোনাব! আমার মনের মধ্যে যেসব কথা আছাড় খেয়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে সেই কথা এই হৃদয়হীন পৃথিবীকে

শোনাবার জন্যে কোন্ পথ অবলম্বন করব। আমি উপদেশ দিতে চাই না। ভাবলাম বুকের সমস্ত যন্ত্রণা দিয়েই নিজের কথা তাদের কাছে পৌঁছে দেব। তাই করলাম। কিন্তু ইংরেজীতে যাকে "abstract" বলে তাই হল। আমি হিন্দু—আমার সামনে পূজোর জন্যে প্রয়োজন মূর্তির। যতক্ষণ না সামনে কোন মূর্তি থাকে ততক্ষণ তো তৃপ্তি পাবে না সে। ভাবলাম মূর্তি একমাত্র থাকে কাহিনীতে। তাই একে একে কাহিনীর পর কাহিনী সৃষ্টি করে যেতে লাগলাম। কবিতা দিয়ে জীবন শুরু করে কাহিনীতে এসে তৃপ্তি পেলাম।

যাঁরা আমার অগ্রজ অর্থাৎ যাঁরা বহুকাল আগে গল্পের মাধ্যমে নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করে গেছেন তাঁদের রচনা পড়তে লাগলাম। কিন্তু দেখলাম আমার যা কিছু ভাবনা চিন্তা সব তাঁরা আগে থেকে লিখে রেখে গেছেন। কিছু আর বাকি রাখেননি।

কিন্তু আমি তো তাঁদের অনেক পরে জন্মেছি—আমি যে-মানুষদের দেখেছি তাঁরা তাঁদের দেখেননি।

বিংশ শতাব্দীর যে সমস্যা-বহুল জীবনের মধ্যে আমি মানুষ হয়েছি তার সন্ধান তাঁদের জানা ছিল না। দু'মুঠো ভাতের জন্য নিজের সন্তানকে খুন করা, মান-সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়ে নারীর মাতাল হওয়া, রাজনীতির নেশায় মাতাল হয়ে দেশকে পরের হাতে বিক্রি করে দেওয়া এবং এই সব কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্যে পথের অনুসন্ধান করা—এ সব কাহিনী তাঁদের রচনায় ছিল না। কিন্তু আমি তো এই বাস্তবের মর্তেই মানুষ হয়েছি। তাই নিজের গল্পের মাধ্যমে এ সমস্ত প্রকাশ করব। লিখতে লিখতে যদি কলমের কালি শুকিয়ে যায় তো নিজের রক্ত দিয়ে কলম ভরে নেব। ভাল মন্দ দুই লিখব। পৃথিবীর সবকিছুর সম্পর্কেই লিখব। এবং প্রার্থনা করব-যাতে মানুষ মানবতাকে বলি না দেয়।

আমি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আয়নাতে নিবদ্ধ করলাম। সেদিনের সেই ছোট ছেলেটি এখন অনেক বড় হয়েছে। এতদিনে সে অনেক

কিছু দেখেছে—অনেক কিছু ভেবেছে—অনেক কিছু লিখেছে কিন্তু শান্তি পায়নি। তার ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। হঠাৎ নজরে পড়লো আমার প্রতিবিম্বের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে? কাঁদছ কেন?—

উত্তর পেলাম্ না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম—কিছু একটা বল—

সত্যিই কি কাঁদছে! নিজের চোখে হাত দিয়ে দেখলাম—না, আমার চোখে তো জল নেই, তবে আমার ছায়াটা কাঁদছে কেন? তবে কি ও মুষড়ে পড়েছে?

আমি আবার ওকে জিজ্ঞাসা করলাম—সে বললে আমি কে? আমি তো কেউ নই। কে আমাকে সম্মান দেখালে?—আমি তো না থাকারই শামিল।

আমি বললাম—তোমাকে এত কথা কে শেখালো?

—তারাই, যারা মনুষ্যত্বে অপমান করেছে। আমি ভাবছি আমিও যদি সম্মান পেতাম, ভালবাসা পেতাম? আমার আনন্দ হতো তাহলে।

—বলতে বলতে সে মাথা নীচু করে নিলে—

আমি হেসে ফেললাম। আমি ওকে বললাম—মানুষকে যদি একটুও বিশ্বাস করতে তাহলে তোমার আর দুঃখ করবার কিছু থাকতো না। —জীবনে তাড়াহুড়ো করা ভালো নয়। তোমার কি জানা নেই যে খারাপের মধ্যেই ভাল আছে। মানুষ তো আর ভগবান নয়, মানুষের প্রশংসার রীতিনীতি যে আলাদা। মানুষ যেমন একদিকে মানুষকে ভগবান তৈরী করেছে তেমনি আবার তাকে তো খুনও করেছে। যীশুখ্রীষ্ট, মহাত্মা গান্ধী, সক্রেটিস সকলের বেলাই তো এ জিনিস ঘটেছে। তুমি শক্তিমান তাই তোমার শত্রু আছে—তুমি ছোট নয় বলেই যারা নিজেরা অতি সামান্য জীব তারা অন্যকেও নিজেদের স্তরে টেনে নামিয়ে আনে। কারণ তারা নিজেরা নিন্দার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। এটা সত্যিই যে কেউ তোমার প্রশংসা

করেনি—কিন্তু জগতে কে-ই বা প্রশংসা পেয়েছে? শেক্সপীয়র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলকেই তো লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমার চলার পথে যে বাধা এসেছে তা অগ্রজদের বেলাও ছিল কারণ চলার পথ হচ্ছে কণ্টকময়।" টমাস মান বলেছেন—"আমার বই শব্দের সিন্দুক। সেখান থেকে মানবতাকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়নি। তাতে সাহিত্যের চেয়ে আরো বেশী কিছু আছে।"

তুমি বোধ হয় ভাবছ যারা তোমায় কষ্ট দিচ্ছে তারা কৃতকার্য হচ্ছে আর কোটি কোটি লোক যারা তোমার প্রশংসা করছে তাদের আনন্দকে তো তুমি দেখলে না? মাটি দিয়ে দেশ গড়া যায় না —গড়া যায় মানুষ দিয়ে। গাছপালা পশুপক্ষী এরা না থাকলেও চলবে কিন্তু মানুষ না থাকলে যে চলবে না—দেশ যে তাহলে মরুভূমি হয়ে যাবে। আর এটাও ভেবে দেখ যে মানুষ তো ছাঁচে ঢালা ঘটি বাটি নয়। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে এবং অনেক বিপদ-আপদের মুখোমুখি হতে হয় তাকে। কিন্তু এই আপাতঃ বিভিন্নতার মধ্যেও যে ঐক্য আছে। সেই ঐক্য দিয়েই তো সমাজের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। কিন্তু সেখানে যেমন ভাল আছে তেমনি আবার মন্দও আছে—এই তো দুনিয়ার নিয়ম। যখন সমাজ গ্লানিতে ভরে ওঠে তখন সেই গ্লানি আর অধর্মকে সমাজ থেকে নির্বাসিত করার জন্যেই তো জন্ম হয় মহাপুরুষদের! যেমন যীশু, বুদ্ধ, চৈতন্য, তুলসীদাস আর কবীর।

সাহিত্যের জগতেও এ ধরনের সংস্কারকের জন্ম হয়—তাই এলেন শেক্সপীয়র, গ্যেটে, ডিকেন্স, ফ্লবেয়ার, তলস্তয়, রুশো, ভলতেয়ার, স্টেন্‌দাল, রবীন্দ্রনাথ।

পৃথিবী কি এঁদের কম লাঞ্ছনা দিয়েছে? কিন্তু এঁরা তো সে অপমান বা লাঞ্ছনা গায়ে মাখেননি। তাঁরা নিজেদের এই নিন্দা আর অপবাদের ঊর্ধ্বে রেখে আপন-আপন কাজ করে গেছেন। তাঁরা অপেক্ষা করেছেন তাঁদের গুণগ্রাহী পাঠকদের জন্যে। সাহিত্যে যে রস

আছে সেই রস জাতিধর্ম-ভেদকে মনের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। সেই সাহিত্যরূপ অমৃত-রস তাঁরা একসঙ্গে পান করেন এবং তাতেই তাঁরা জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ পান। এ রস পরকে আপন করে—দূরকে কাছের। এই রসের বিচার করা সহজ নয়। আর একে অত সহজে আয়ত্ত করাও সাধনা-সাপেক্ষ। যাঁরা এই রসের ভাণ্ডারী তাঁরা ভালো করেই জানেন যে তাঁদের কলম থেকে কালির যে আঁচড় পড়ে তার কাছে বাইরের আঘাতের আঁচড় বড় অকেজো, বড় দুর্বল, বড় অসহায়। তাই তাঁরা নির্ভীক, নিরলস, নিঃসঙ্গ।

একথা বললে ভুল বলা হবে না যে যারা হাতে একবার কলম ধরেছে—তাদের কাছে আত্মীয়স্বজনও পর। তার আলাদা কোন জগৎও নেই আবার নিজের জগতের বাইরে যাবারও কোন প্রশ্নই ওঠে না তার। তার সাফল্যের সবচেয়ে বড় রহস্য হচ্ছে এই যে সে জগতে থেকেও জগতের অন্যান্য সব কিছুর থেকে সে বিচ্ছিন্ন।

কলমকে যারা বরণ করেছে এ পৃথিবী কোনও দিন তাদের কোন পুরস্কার দেয়নি। যা কিছু প্রাপ্তি তা এই পৃথিবীর পরপারেই। যদিও পুরস্কার পেলে তার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু না-পেলেও কোনও লোকসান নেই।

এখন তো সরকারী আইন-কানুন জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু শিল্পের রাজ্যে আদালতের কোন এক্তিয়ার নেই এখনও। সেখানে পুলিস দারোগার লাঠির কোন শক্তিই খাটে না। সরকারী চাকরি থেকে প্রত্যেকটি কর্মচারীকে একদিন পেনসন নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয় কিন্তু সাহিত্যিকের জন্যে কোন পেনসন নেই। সরকারী চাকুরের পেনসন মৃত্যুদিন থেকে বন্ধ হয়ে যায় আর সাহিত্যিকের পেনসন শুরু হয় মৃত্যুর পর থেকেই।

এতক্ষণ আমার ছায়া খুব মনোযোগের সঙ্গেই আমার কথা শুনছিল এবার হঠাৎ সে বলে উঠল—তুমি বলতে চাও তাহলে সংসারে আমার কিছুই প্রাপ্য নেই?

আমাকে আবার হাসতে হলো। আমি বললাম—তুমি যা খুঁজছ

সে তো শান্তি—তাই বা কি খুব কম পাওয়া হলো ? এর মূল্য চাল-ডালের মত নয়। শান্তি অসামান্য জিনিস। একটি কথা সব সময় মনে রেখো যে নিজের মূল্য পাওয়ার জন্যে খুব ব্যাকুল হলে চলবে না, তার জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে। নিজেকে হয়ত তুমি প্রশংসাযোগ্য বলে মনে করছ কিন্তু এখনও অনেক সংগ্রাম তোম্‌ার বাকী আছে। পৃথিবীকে দু'চোখ ভরে দেখ—পৃথিবীকে বোঝবার চেষ্টা কর—যাচাই কর—তারই মধ্যে পুরস্কার লুকোনো আছে। এই পৃথিবীতে না এলে মানুষের শোভাযাত্রার এত বড় মিছিল কি অন্য কোথাও তুমি দেখতে পেতে ? নিজের চোখে যে দুনিয়ার আসল রূপটি দেখতে পেয়েছো তা তুমি অন্য কোথাও পেতে ? তুমিই জেনেছ—মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। তাই এখানে একজনের ভুলের জন্যে অন্যজনকে মাশুল দিতে হয়। তাই বলছি যে পৃথিবীর সমস্ত ভুলত্রুটিকে ক্ষমা করে দাও। যেখানে আঘাত বেশী কঠিন হয়ে বাজে সেখানেই দেখবে বেশী ভালবাসা। প্রেম যার গভীর সেই কেবল সমস্ত দুঃখ-কষ্ট আনন্দচিত্তে সহ্য করতে পারে। তাই আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই যে—তুমি আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর, আমার প্রণাম নাও, তোমার বিচিত্র সৃষ্টির জয় হোক।

কিছু ভেজাল

বাংলা সাহিত্যের স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে শাখাটি সবচেয়ে বেশী প্রসারিত হয়েছে সেটি হচ্ছে রম্যরচনা। এ ধরনের রচনা পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করেছে 'রম্য' বলে, স্থায়ী আসন পাঠকমনে করে নিতে পারেনি কারণ রসোত্তীর্ণ নয় বলে। আমরা এমন অনেক রম্যরচনা উল্লেখ করতে পারি যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশনা-ক্ষেত্রে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সেই সমস্ত রম্যরচনা হাজার হাজার কপি বিক্রীও হয়েছিল কিন্তু আজ আর সেই সমস্ত রচনার কথা কেউ উল্লেখ করেন না। কালের কষ্টিপাথরে মেকী বলে ধরা পড়ে গেছে।

"কিছু ভেজাল" এই রচনাটি "সাজঘর" মাসিক পত্রিকার ১ম সংখ্যায় (আগস্ট ১৯৫৭) প্রকাশিত হয়। এটি রম্যরচনা। শুধু রম্যরচনা বললে ভুল হবে। এই রচনাটি রম্যরচনার উৎকৃষ্টতম নমুনা। আর তাছাড়া শ্লেষাত্মক রচনায়ও যে লেখকের উপন্যাস রচনার মতই দক্ষতা আছে তারই প্রমাণ এ রচনাটি।

'সাহেব বিবি গোলাম' যখন প্রকাশিত হয়েছিল (১৯৫৩) তখন লেখকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কাগজে বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। লেখক সেদিন চুপ করেছিলেন। কোন বিরুদ্ধ মন্তব্যেরই প্রতিবাদ করেননি কারণ তিনি নিজের শক্তি ও সৃষ্টির ওপরে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। ৺ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সাহেব বিবি গোলাম উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'আমার একটি ইঁচড়েপাকা নাতি মনে করেন সমালোচনা মানেই বিরুদ্ধ আলোচনা।' আমাদের বাংলাদেশের হাজার প্রতি ৯৯৯ জন সমালোচক এই 'ইঁচড়েপাকা নাতি'র দলে। তাঁরা সমালোচনা বলতে বোঝেন বিরুদ্ধ সমালোচনা। তাই বোধ হয় সমালোচনা সাহিত্যের শাখাটি বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত অতটা উৎকর্ষ লাভ করেনি।

"কিছু ভেজাল" রচনাটি বিমল মিত্রের উপন্যাস বুঝতেও পাঠককে সাহায্য করবে।

Searchlight সম্পাদক "A memorable Novel" প্রবন্ধে বিমল মিত্রের সাহিত্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছিলেন ; "He is a master of Bengali prose. There are few in Bengal now who can write such an

easy but forceful prose." এই রচনাটিও সে কথার সত্যতা প্রমাণ করবে।

* * * *

মনোজগতে যেমন ভুল, বস্তুজগতে তেমনি ভেজাল। একসঙ্গে অনেক জিনিস যাদের মনে রাখতে হয়, কিছু ভুল করতে তারা বাধ্য। তেমনি যারা একসঙ্গে অনেক জিনিসের কারবার করে, কিছু ভেজাল না নিয়ে তারা পারে না।

ব্যক্তিগতভাবে ভুলো-প্রকৃতির মানুষদের আমি ভালবাসি। যে-মানুষ সারাজীবনে একটা পেন্সিলও হারায়নি বলে গর্ব করে, আমার তো তাদের সঙ্গে মিশতে রীতিমত ভয় করে। গল্পে-উপন্যাসে ভুলো-মানুষ চরিত্রদের কাহিনী আমি একটু বেশি প্রীতির সঙ্গে লিখেছি। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে যারা ভুলো-প্রকৃতির তারা অপেক্ষাকৃত সৎ। এমন কোনও মানুষের সাক্ষাৎ অদ্যাবধি পাইনি যে একাধারে হিসেবী এবং সৎ। হিসেবের সঙ্গে সততার বোধ হয় চির-বিরোধ।

এক-এক সময় মনে হয় আমার চাওয়াটা হয়ত একটু আবদারের মত শোনায়। সত্যিই তো, সবাই হিসেবী হবে আবার সঙ্গে সঙ্গে সৎ হবে, এ দাবিটাই তো এক বেয়াড়া আবদার। আর আমার আবদারের ওপর নির্ভর করে তো সংসার চলবে না। অতীতেও চলেনি, ভবিষ্যতেও চলবে না। তবে এ আবদারের অর্থটা কী?

আর শুধু কি তাই? আমি দেখেছি সবাই-ই ভুলো-প্রকৃতির মানুষদের একটু বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখে (একমাত্র বোধ হয় সেই ভুলো-প্রকৃতির লোকদের স্ত্রীরা ছাড়া)। কিন্তু ভেজালের কারবারীরা প্রায় সকলেরই চক্ষুশূল। ভেজালের কারবারীদের সবাই ফাঁসি দিতে পারলেই যেন বাঁচে। যেন ভেজালের কারবারীরা মানুষের কিছু মঙ্গল করে না!

আসলে কারোরই খেয়াল থাকে না যে দু'টো একই জিনিস। ওই ভুল আর ভেজাল। সেই জন্যেই তো গোড়াতেই বলে নিয়েছি যে মনোজগতে যেমন ভুল, বস্তুজগতে ঠিক তেমনি হলো ভেজাল।

তাহলে স্বীকারই করি আমি ভেজাল-ভক্ত।

এখন, কথা হচ্ছে এই ভেজালের যুগে, যখন ওষুধে, দুধে, চালে, তেলে, শিক্ষায়, সহবতে সর্বত্র ভেজাল ছড়িয়ে পড়েছে, তখন ভেজালের পক্ষ নিয়ে কিছু বলা বিপজ্জনক। জানি ভেজাল প্রমাণ হলে মূল্য-ফেরত দেবার ক্ষমতা আমার নেই, তবু ভেজালের স্বপক্ষে কিছু বলেও যে মুক্তি পাবো এমন দুরাশাও আমি করি না।

ধরা যাক্, অত বড় মহাকাব্য যে রামায়ণ, মহাকবি বাল্মীকি কি তাতে ভেজাল দেন নি? ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয় দেখানোই যদি মহাকবির উদ্দেশ্য হতো তো রামচন্দ্রই বা পরাজয়ের হাত থেকে মুক্তি পেলেন কী করে? রামচন্দ্রই কী নির্ভেজাল? রামায়ণের সৃষ্টিই তো একটা নিরপরাধ হত্যা-কাণ্ড দিয়ে। হত্যাই তো অধর্ম। নিরপরাধ ক্রৌঞ্চ-মিথুনের হত্যায় ব্যথিত হওয়ার পর মহাকবির কলম দিয়ে যে অশ্রু নির্গত হলো তাই-ই এক মহাকাব্য!

আর তা ছাড়া রামচন্দ্র যে সারাজীবন যন্ত্রণা ভোগ করলেন তার মূলেও তো সেই একটা মনোজগতের ভেজাল। অর্থাৎ বুদ্ধিনাশ! হরিণ-শাবক মনে করে যাকে রাজা দশরথ হত্যা করলেন সে আর কেউ নয়, একজন নিরপরাধ ঋষি-পুত্র!

তাই আজো ভাবি ঋষি-পুত্র মরে গিয়ে কাব্য-সাহিত্যের কত বড় একটা অবদানের সৃষ্টি করে গেল। নইলে কি বাল্মীকি রামায়ণ লিখতেন, না তুলসীদাসের 'রাম চরিত মানস' লেখা হতো।

বহুদিন আগের কথা বলি।

কথা মানে একটা ঘটনা।

আজ থেকে সে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। তখন আমি সবে সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেছি।

একজন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবীণ সাহিত্যিক আমাকে কাছে পেয়ে বললেন—তোমাকে একটা কথা বলি বিমল, তুমি নতুন লিখতে আরম্ভ করেছ, ভবিষ্যতে কথাটা তোমার কাজে লাগবে—

বললাম—বলুন—

তিনি বললেন—তুমি হাজার ভালো লেখ, লোকে তোমার নিন্দে করবেই। সে তুমি কিছুতেই এড়াতে পারবে না। আর তুমি যত বেশী ভালো লিখবে তত বেশী নিন্দে পাবে। সেইটেই লেখার জগতের নিয়ম।

বললাম—ভালো লিখলেও নিন্দে করবে?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, তবে তুমি যদি খারাপ লেখো তাহলে কাগজে-কলমে প্রশংসা বেরোবে। ভুরি ভুরি প্রশংসা। এখন কোন্‌টা তুমি চাও, বলো?

উত্তর দেওয়া মুশকিল হলো। একদিকে পাঠক বই কিনবে না, অথচ কাগজে-কলমে প্রশংসা ছাপা হবে, অন্যদিকে পাঠক হাজার হাজার কপি বই কিনবে অথচ কাগজে-কলমে নিন্দে বেরোবে। এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বেছে নেবো বলা মুশকিল।

আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে তিনি বললেন—এক কাজ করলে দু'কূল বজায় রাখা যায়, তা কি করতে পারবে?

বললাম—বলুন?

তিনি বললেন—বেশির ভাগ বই-ই মন দিয়ে খেটে ভালো করে লেখবার চেষ্টা করবে, কেবল একটা বই ছাড়া—

বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—তার মানে?

তিনি বললেন—লোকের তো খুঁত ধরা স্বভাব। খুঁত না ধরতে পারলে কোনও মানুষেরই ভাত হজম হয় না। তুমি হাজার ভালো লিখলেও তোমার খুঁত তারা বার করবেই। সেই জন্যেই একখানা ভাই খারাপ করে লিখবে। যাতে তাদের খুঁত ধরার প্রবৃত্তিটা ওই একটা জায়গায় গিয়ে সীমাবদ্ধ থাকে। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ওই জন্যেই 'দম্পতি' বলে একখানা বই লিখেছিলেন—অর্থাৎ এক কড়া দুধে এক হাতা জলের ভেজাল দেবে।

এ ঘটনাটা বহুদিনের তা আগেই বলেছি। সেই প্রবীণ সাহিত্যিকের উপদেশ মত কাজ করে আমার একটা দার্শনিক

উপলব্ধি হয়েছে।

ছোটবেলায় দেখেছি গয়লার সঙ্গে মা তুমুল ঝগড়া করেছে দুধে জল মেশাবার অভিযোগে। গয়লা যত অস্বীকার করে, মা তত অভিযোগ করে, কিন্তু আবার সেই মা-কেই দেখেছি দুধ জ্বাল দেবার সময় ঘটি থেকে খানিকটা জল দুধে ঢেলে দিতে।

মনে আছে একদিন মা'কে জিজ্ঞেস করেছিলাম—মা, তুমি যে নিজে ভেজাল দিচ্ছ ?

মা বলতো—জল মেশালে দুধ একটু বেশি মিষ্টি হয়।

মা কী অর্থে কথাটা বলেছিল জানি না। মানুষের চিরাচরিত নিন্দুক স্বভাবের কথা জানতো কিনা তাও জানি না। দুধে জল ভেজাল দিলে দুধ বেশি মিষ্টি হয় কিনা, তাও কখনওতুলনামূলক বিচার করে দেখিনি। কিন্তু বাস্তবজীবনে আর সাহিত্যের জগতে কথাটার সত্যতা বার বার ধ্রুব বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বহুদিন আগে একটা ছোট্ট গল্প পড়েছিলাম। একজন লেখক এক মহকুমা-শহরে গেছেন। একে একে শহরের গণ্যমান্য সমস্ত লোকই এসে দেখা করলেন। সবাই-এর মুখে একই প্রশ্ন—ভুবনবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?

লেখক বললেন—না—

কেউ বললেন—ভুবনবাবুর মত মানুষ হয় না, ভারি পরোপকারী মানুষ—

একজন বললেন—ভুবনবাবু মানুষ নন্ দেবতা—একেবারে স্বর্গের দেবতা—

আর একদিন আর একজন বললেন—সে কী? ভুবনবাবুর সঙ্গেই আপনার আলাপ হয়নি? আলাপ হলে বুঝতেন মানুষ কাকে বলে! অমন অমায়িক ভদ্রলোক এ যুগে হয় না—

পরের দিন আর একজন বললেন—ভুবনবাবুর সঙ্গেই আপনার আলাপ হয়নি যখন তখন এ শহরের কিছুই আপনার দেখা হয়নি। অমন সৎ লোক আর নেই পৃথিবীতে—

আরো একদিন একজন বললেন—ভুবনবাবুর মত শিক্ষিত লোক আমি তো মশাই আমার জীবনে আর দু'টি দেখলাম না।

ভুবনবাবুর সম্বন্ধে সকলের কাছে প্রশংসা শুনে শুনে লেখকের কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগলো। যা প্রশংসা শুনলেন তাতে বিশ্বাস না হবারই কথা। এতগুলো গুণ একাধারে তো থাকবার কথা নয়।

শেষকালে তিনি গোপনে খবর নিতে লাগলেন। একেবারে গুহ্য খবর। তখন একজন লোক এসে জানালে যে ভুবনবাবু সত্যিই নিখুঁত ভদ্রলোক। তবে একটি মাত্র খুঁত আছে। তিনি মদ খান।

তখন লেখক নিশ্চিন্ত হলেন। বুঝলেন যে ভুবনবাবু সত্যিই খাঁটি লোক। একটুখানি ভেজাল না থাকলে কোনও জিনিসকেই খাঁটি বলা যায় না।

আগেকার যুগে মহাত্মা গান্ধীকে অনেকেই গালাগালি দিত। এখনও যে দেয় না তা নয়। কিন্তু আগেকার মত নয়। নির্লোভ সত্যবাদী অহিংস মানুষটিকেও লোকে নিন্দে করতো বলে অনেকেরই আবার কষ্ট হতো। তারা বলতো—এমন সর্বত্যাগী মানুষকেও লোকে নিন্দে করে গো। ধিক—ধিক—

কিন্তু যেবার তিনি চৌরাচৌরির সহিংস ব্যাপারের জন্যে সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন যে—I have made a Himalayan blunder। আমি একটা মহা ভুল করে ফেলেছি, সেদিন মনে আছে তাঁর নিন্দুকেরাও বলেছিল—না, গান্ধীজী মহাত্মা পুরুষ।

আসলে মানুষ ভেজালটাই ভালবাসে। খাঁটি জিনিসের কদর করে না। সক্রেটিস একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন সে-বিষয়ে এখনকার কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক-কালে তাঁর স্ত্রীও তাঁকে সহ্য করতে পারেননি অত নিখুঁত মানুষ বলে। নিখুঁত কোনও জিনিসই সমাজ-রাষ্ট্র-জনতা সহ্য করতে পারে না। সহ্য করতে পারে না বলেই সক্রেটিসদের বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হয়।

আমার বয়েসী এক বন্ধুকে রথের মেলায় তেলেভাজা খেতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাকে সাত্ত্বিক মানুষ বলেই জানতাম। বাড়িতে ফল-দুধ-মিষ্টি ছাড়া বিশেষ কিছু সে খেত না।

বললাম—এ কী! তুমি এইগুলো খাচ্ছো? এ যে বিষ—। বাড়িতে খাঁটি সরষের-তেলে ভাজা আলুর চপ খেলেই পারো?

বন্ধু বললে—ভাই, খাঁটি তেলে ভাজা আলুর চপ এত মিষ্টি হয় না।

সত্যিই ভেজাল যে সত্যিই খাঁটির চেয়ে ভাল তার প্রমাণ জয়দেবের গীত-গোবিন্দ। জয়দেব গীত গোবিন্দ লিখতে লিখতে একটা জায়গায় এসে থেমে গেলেন। আর মেলাতে পারছেন না। অনেক মাথা ঘামিয়েও যখন আর মাথায় কিছু আসছে না, তখন তিনি নদীতে স্নান করতে চলে গেলেন। ভাবলেন ফিরে এসে ঠাণ্ডা মাথায় লিখবেন। কিন্তু স্নান করে ফিরে এসে দেখলেন কে তাঁর কাব্যের পঙ্‌ক্তি পূরণ করে দিয়েছেন। দেহি পদপল্লবমুদারম্‌। স্ত্রী পদ্মাবতীকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন—এ পঙ্‌ক্তিটা কে লিখেছে?

পদ্মাবতী বললেন—কেন প্রভু, আপনিই তো এই খানিক আগে স্নান করতে গিয়ে ফিরে এসে পঙ্‌ক্তিটা বসিয়ে দিলেন।

তখন জয়দেব বুঝলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই সশরীরে তাঁর ছদ্মবেশ ধরে এসে এই অলৌকিক ব্যাপার করে গেছেন।

তা এও তো এক রকমের ভেজাল। তফাতের মধ্যে শুধু এই যে এটা লৌকিক না হয়ে অলৌকিক ভেজাল।

রামায়ণের অহল্যাও ঠিক এমনি একটা ভেজালের ফলে অভিশাপ-গ্রস্তা হয়ে গিয়েছিলেন। স্বয়ং ইন্দ্রকে স্বামী বলে ভুল করাও তো ভেজালের শামিল। নৈতিক চরিত্রের ভুলের ভেজাল। কিন্তু ভাগ্যিস সেই ভেজালটি দিয়েছিলেন। ভেজাল না দিলে কি পাষাণ হতেন? আর পাষাণ না হলে কি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পেতেন? ভেজালের জন্যে শাস্তিভোগের এমন শুভ-পরিণতি বড় একটা দেখা যায় না। ভেজাল দেওয়ার ফলে যদি শ্রীরামচন্দ্রের

কৃপালাভ হতো তো আপনি আমি কেউই আর ভেজাল দিতে বাকি থাকতাম না। শ্রীরামচন্দ্ররাও পাথরে হোঁচট খেতে খেতে বনবাস যাওয়া বন্ধ করতেন। সারা দুনিয়াটাই পাথরে-পাথরে ভর্তি হয়ে থাকতো। এই সব ভেজাল-দাতাদের লক্ষ্য করেই হয়ত কবি লিখে গিয়েছিলেন—হায় রে রাজধানী, পাষাণ-কায়া! কে জানে!

কার্লাইল আর একটা উদাহরণ। পুরোপুরি খাঁটি লেখক হতে গেলেও যে পুরোপুরি খাঁটি লেখক হতে নেই, টমাস কার্লাইল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। যখন লিখতেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে যেতেন। যে-ঘরে বসে লিখতেন সেই ঘরের চারদিকে দু'টো করে দেওয়াল। লেখবার সময় সে-ঘরে কারো প্রবেশ করবার অধিকারও ছিল না। এমন কি তাঁর স্ত্রীরও না।

আবার তার ওপর সন্ধ্যেবেলা স্ত্রীকে সেই সমস্ত দিনের লেখাটা শুনতে হতো। শুনে মন্তব্য করতে হতো—ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে—

কিন্তু বছরের পর বছর এমনি করার পর একদিন স্ত্রী বেঁকে বসলেন।

বললেন—আর পারছি না। সারাদিন লেখার কথা শুনতে শুনতে আমার অসহ্য লেগে গেছে, এবার আমাকে মুক্তি দাও।

লেখা-পাগল কার্লাইল সাহেব তখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন। বললেন—আমি বুঝতে পারিনি যে নিজের লেখার নেশাই একদিন আমার গৃহ-শান্তি নষ্ট করে দেবে—

বলতে গেলে তখন থেকে সংসারী মানুষ হতে আরম্ভ করলেন। তখন লোকের সঙ্গে দেখা-শোনা করতে আরম্ভ করলেন। আগে দেবতা ছিলেন, পরে মানুষ হলেন।

এই সূত্রে আর একজনের কথা মনে পড়লো। রিচার্ড ভাগ্‌নার। রিচার্ড ভাগ্‌নারের পরিচয়—তিনি অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ। সঙ্গীতের জগতে পৃথিবী যে দু'একজন বিরল প্রতিভা সৃষ্টি করেছে, রিচার্ড

ভাগ্‌নার তাদেরই একজন।

ভাগ্‌নার জীবনে কখনও ভেজাল দেননি। নিজের সঙ্গীত নিয়ে তিনি এত বেশি মত্ত ছিলেন যে মানুষ হবার কথা ভাববারও সময় পাননি। তাঁর জীবনীকার তাঁর সম্বন্ধে যে জীবনী লিখেছেন তার নাম দিয়েছেন—"The Monster." একটু ভেজাল দিলেই তিনি হয়ত মানুষ হতে পারতেন, কিন্তু তাহলে আর মহৎ শিল্পী হতে পারতেন না।

আসলে ভেজাল না থাকলে জীবন মধুর হতো এ কথা যাঁরা ভাবেন তাঁদের একবার সক্রেটিসের জীবনী পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। শুধু সক্রেটিস কেন, যীশুখৃষ্টও তাই। আমাদের তথাগত বুদ্ধদেবও তাই। এঁদের কারোর জীবনই সুখের নয়। শুধু সুখ কেন, তথাকথিত শান্তির ছিটে-ফোঁটার স্পর্শও তাঁরা কখনও পাননি। কিন্তু আমরা কি অত মহৎ দুঃখের বোঝা বইতে পারি? আমরা, যারা সাধারণ মানুষ, যারা সাংসারিক সুখ-ভোগের জন্যে লোলুপ, তাদের পক্ষে ভেজালটাই কাম্য। একটু ভেজালের মিশেল দিয়ে আমরা জনপ্রিয়তা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। এমন ভাবে চলি যাতে কারোর সঙ্গে আমাদের বিরোধ না বাধে। আমরা কাদা বাঁচিয়ে চলি, ময়লা বাঁচিয়ে চলি, ধুলো-ধোঁয়া-গন্ধ এড়িয়ে বাঁচি। কিন্তু ধর্ম বাঁচিয়ে চলি না, সত্য বাঁচিয়ে চলি না, বোধ বাঁচিয়ে চলি না। কারণ তাতে অনেক ল্যাঠা। ধর্ম-সত্য-বোধ বাঁচিয়ে চলতে গেলে মহৎ দুঃখের ভারে আমরা নিশ্চল হয়ে যাই। মহৎ দুঃখ কি সবাই সহ্য করতে পারে?

একবার একটি ছোট মেয়ে আমার কাছে একটা অটোগ্রাফ-বই নিয়ে এসেছিল। অটোগ্রাফ-বইতে সই দেবার জন্যে অনেকে দেখেছি কিছু কিছু বাণী মুখস্থ করে রেখে দেন। যাতে সময় বিশেষে দরকার হলে সেগুলো অটোগ্রাফ-বইতে লিখে দিতে পারেন। এমনও দেখেছি গল্প-উপন্যাস লেখক দু'লাইন পদ্য লিখে দিলেন। আর তা এত তাড়াতাড়ি লিখে দিলেন যে দেখে মনে হলো পদ্য মেলাতে

তাঁর কষ্ট হয় না। প্রথম প্রথম দেখে অবাক হয়ে যেতাম। তারপরে এক লেখক-বন্ধু বিষয়টা পরিষ্কার করে দিলেন। বললেন—সময় পেলেই ধীরে সুস্থে কয়েক সেট পন্ত তৈরি করে রেখে দিই—

তা আমার ওই তৈরি করে রেখে দেওয়া জিনিসটা স্বভাবে নেই। তাই কেউ অটোগ্রাফ-বই এগিয়ে দিলে মুশকিলে পড়ি। সকলেরই অনুরোধ কিছু লিখে দিতে হবে। একপাল লোকের মধ্যে যেন কিছু লিখে দেওয়া সহজ। আর তা ছাড়া সবাই তো রবীন্দ্রনাথও নয়।

তাই কারো অটোগ্রাফ-বই পেলেই উল্টে-পাল্টে দেখি কে কী লিখেছে। দেখতে দেখতে ভাবি এতগুলো ভাল ভাল উপদেশ যদি অটোগ্রাফ-বইএর মধ্যে বন্দী না থেকে ছাপা হয়ে বেরোত তা হলে দেশের জনসাধারণের কী উপকারটাই না হতো!

তা সে যা'হোক, একবার এক অটোগ্রাফ-বইতে প্রমথনাথ বিশীর একটা বাণী দেখেছিলাম। তিনি লিখেছেন—'সদা সত্য কথা বলিবে না।' সদা সত্য কথা বলবার উপদেশ শুনতে শুনতে যখন প্রায় হতাশ্বাস হয়ে পড়বার আশঙ্কা হয়ে এসেছিল, ঠিক সেই সময় ওই বাণীটা দেখে হোঁচট খাবার অবস্থা হলো। বলতে গেলে প্রায় মৃত-সঞ্জীবনীর কাজ করলো। তখনই ভাবলাম এতদিনে সত্যিই একটা খাঁটি কথা শুনলাম। এও সেই ভেজাল। সত্যের সঙ্গে একটু মিথ্যের ভেজাল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এক সাধুর গল্প করেছিলেন। সাধু এক সাপকে অহিংস হ'তে উপদেশ দেওয়ায় সাপের দুর্দশা দেখে বলছিল—তোকে আমি কামড়াতে বারণ করেছিলুম, কিন্তু ফোঁস করতে তো বারণ করিনি—

মহাত্মাজী নোয়াখালির হিন্দুদের দুর্দশা দেখেও ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন—ওরা তোমাদের মারলে, আর তোমরা মাথা পেতে মার খেলে? উল্টে তোমরা ওদের মারতে পারলে না?

অর্থাৎ পুরোপুরি অহিংসা ভাল নয়, একটু হিংসার ভেজাল। তারই নাম খাঁটি অহিংসা।

এক প্রেমিকার গালে একটা ফোড়া হয়েছিল। প্রেমের ব্যাপারে গালটা এক বহু-ব্যবহার্য বস্তু। মহা মুশকিলে পড়লো প্রেমিকা। গালের ফোড়া নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ ফোড়া একটা দর্শন-কটু জিনিস। তার ওপর প্রেমের আতিশয্যে অসাবধানে কোনও ক্রমে যদি গালটা একবার ব্যবহৃত হয়ে যায় তো মৃত্যু-যন্ত্রণা। অথচ বেশিদিন অদর্শনও বিপজ্জনক। অদর্শনে প্রেমিকের ভাবান্তর ঘটতে পারে। আকর্ষণ স্থানভ্রষ্ট হতে পারে।

হলো কি, অনেক ভেবে-চিন্তে প্রেমিকা একদিন রুমালে গাল ঢেকে প্রেমিকের কাছে উপস্থিত হলো। কিন্তু প্রেমিক আগেকার মতই নিস্পৃহ।

প্রেমিকা অভিমানভরে বললে—তুমি কি আমাকে ভুলে গেলে?

প্রেমিক বললে—না—

প্রেমিকা বললে—তাহলে তুমি তো একবারো জিজ্ঞেস করছো না, কেন আমি এতদিন আসিনি—

প্রেমিক বললে—নিশ্চয়ই তোমার কোন কাজ পড়ে গিয়েছিল—জিজ্ঞেস করবো আবার কী!

প্রেমিকা বললে—তুমি নিশ্চয়ই আমাকে আর ভালোবাসো না—

প্রেমিক বললে—কে বললে? আমি তোমাকে খুব ভালবাসি—

প্রেমিকা বললে—কিন্তু কই, তুমি তো আমার দিকে একবার ফিরেও চাইছ না। আমি কি সুন্দরী নই?

প্রেমিক বললে—কতবার তো বলেছি তুমি খুব সুন্দরী!

প্রেমিকা বললে—শুধু মুখে বললে কি হয়, মানুষের ব্যবহারেই টের পাওয়া যায়—। আগে অনেকবার বলেছ, কিন্তু আজকাল তো আর বলো না। হাবভাবেও তো প্রকাশ করো না—

প্রেমিক বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল। বললে—বার বার একই কথা ভাল লাগে না, অন্য কথা বলো—

প্রেমিকার চোখে জল এসে গেল। অসাবধানে রুমালটা দিয়ে চোখের জল মুছতে গিয়েই অঘটনটা ঘটলো। হঠাৎ গালের ফোড়াটা প্রেমিকের নজরে পড়ে গেছে। নজরে পড়তেই চমকে উঠেছে।

বললে—ওটা কী? ফোড়া? তোমার গালে ফোড়া হয়েছে?

তখন আদরের বন্যা বয়ে গেল প্রেমিকের ব্যবহারে। প্রেমিকা যত ফোড়াটাকে ঢাকতে চায় প্রেমিক তত আপত্তি করে, তত মন দিয়ে ফোড়াটা দেখে। তত ফোড়াটার ওপর চুমু খায়। তত বলে—তোমাকে কী চমৎকার দেখাচ্ছে ডার্লিং—

আসলে মনে হয় এ-ক্ষেত্রে প্রেমিকার গালের ফোড়াটা বিউটি-স্পট্-এর কাজ করেছিল। 'বিউটি-স্পট' মানেই তো খুঁত। আর খুঁত মানেই তো ভেজাল।

স্বামী বিবেকানন্দকে কে না শ্রদ্ধা করে? রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব যদি "পরমপুরুষ" হন্ তো স্বামী বিবেকানন্দ হলেন আমার মতে চরমপুরুষ। যে-চরিত্রে পৌরুষের চরমোৎকর্ষ সাধন হয়েছে তাকেই বলছি চরম পুরুষ। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার কারণ আলাদা, যেদিন জানলাম তিনি ইয়োরোপে গিয়ে গো-মাংস খেতেন সেইদিন থেকে তিনি আমার অধিকতর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। আগে শ্রদ্ধা করতাম, পরে সেটা ভালবাসায় পরিণত হলো।

চার্লস ডারউইনও তাই। পৃথিবীর মুখের চেহারা যাঁরা বদলে দিয়েছেন, চার্লস ডারউইন সেই মুষ্টিমেয়দের একজন। মহাপুরুষদের জায়গা মাথায়, আর প্রিয়জনের জায়গা বুকে। মাথা থেকে চার্লস ডারউইন আমার বুকে এলেন যেদিন জানলাম তিনি লাজুক মানুষ ছিলেন, যেদিন জানলাম তিনি অচেনা লোকের সামনে আমার মতই আড়ষ্ট হয়ে পড়তেন আর ঘামতেন।

আসলে এও তো ভেজাল।

আমার এক বন্ধু বলেছিল সে তিন বস্তু থেকে শত হস্ত দূরে থাকে। স্ত্রীলোক, ঘোড়া আর ভি-আই-পি।

তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন?

সে উত্তর দিয়েছিল—ওই তিনটি বস্তুই বড় খাঁটি—

—খাঁটি মানে?

বন্ধু বলেছিল—ওই তিনটিই লাথি মারে। তা লাথি মারে মারুক, কিন্তু তিনটির একটিও লাথি মারার পর একটুও হাত বুলিয়ে দেয় না, সেইজন্যই ওদের সংশ্রবে যাই না।

জুতো মেরে গরু দান করার কথা প্রবাদে আছে। বন্ধুবর আমার মতই সেই প্রবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু যারা শুধু জুতো মারে, এবং শেষে গরু দান করে অনুতাপ প্রকাশ করে না, তারা ভেজাল দেয় না। আর তারা সেই ভেজাল দেয় না বলেই যীশুখৃষ্টের মতে স্বর্গে যেতেও পারে না।

সোপেনহাওয়ার যে কত বড় ভেজালদাতা তার প্রমাণ পেয়েছিলাম তাঁর জীবনী পড়বার সময়। অত বড় দার্শনিক পণ্ডিত। ভারি গম্ভীর, ভারি রাশভারি মানুষ। বিয়ে-থা করলেন না, মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা বাড়ি করে রইলেন। হোটেলে খান আর একটা কুকুর পুষে তাকে নিয়ে দিন কাটান। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু সোপেনহাওয়ারকে ভালবেসে ফেললাম যখন পড়লাম তিনি তাঁর কুকুরের নাম রেখেছিলেন—জিমি নয় পেগী নয়, কিছু নয়। বেছে বেছে নাম রেখেছিলেন—আত্মা।

সোপেনহাওয়ার ছাড়া আত্মাকে এমন করে সম্মান দিতে আর কে পেরেছে? কে পেরেছে আত্মাকে এমন করে ভালবাসতে? আত্মার সঙ্গে কুকুরের ভেজাল দিয়ে তিনি কেবল আত্মাকেই সম্মান দেননি, সম্মান দিয়েছেন তাঁর কুকুরকেও।

ফুলের তোড়ায় শুধু ফুল থাকবারই কথা।

যেমন পান। পান মানে শুধু পানের পাতাটাই নয়। তার সঙ্গে সুপুরি চুন খয়ের দিতে হয়। কিন্তু নাম ওই পানই। পান খেতে চাইলে কেউ শুধু পান দেয় না, সুপুরি চুন খয়েরও দেয়। ফুলের তোড়ায় যত ফুল থাকে তার চেয়ে বেশি থাকে দেবদারু পাতা।

গত বছরে একবার লালগোলার রাও রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর মার্লিন পার্কের বাড়িতে নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। ভূরিভোজে। সন্ধ্যেবেলা উৎসব-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম। অনেক লোকের খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। টেবিলে সার-সার খেতে বসেছি। গৃহকর্তা রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর পুত্রবধূকে নিয়ে এলেন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে।

আমাকে দেখিয়ে বললেন—ইনি হচ্ছেন আসল বিমল মিত্র—

আমি ভদ্রতাসূচক নমস্কার করলাম।

—আর ইনি হচ্ছেন ভেজাল বিমল মিত্র।

আমি চমকে উঠেছি মন্তব্যটা শুনে। আমার পাশেই এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, নির্দেশটা তাঁর দিকেই। আমিও ভদ্রলোকের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। বেশ হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক। একমনে গোগ্রাসে খেয়ে চলেছেন। সাত-আটটি রাধাবল্লভী, তার সঙ্গে ততোধিক পরিমাণ অন্যান্য ভোজ্যবস্তু। মন্তব্যটি শুনে তিনি কিন্তু অখুশী হলেন না। খেতে খেতেই হো-হো করে হেসে উঠলেন। ভেজাল শুনেও বেজার হবার নাম নেই।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—ভেজাল বিমল মিত্র, মানে?

রাজা সাহেব বুঝিয়ে বললেন—টেলিফোন গাইডে দেখলাম অনেকগুলো বিমল মিত্র। আমি একে একে সকলকেই টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম—আপনি লেখক বিমল মিত্র কিনা। সকলেই বললেন—না। এক বাড়িতে শুধু এক মহিলা বললেন—আমার শ্বশুরের নাম বিমল মিত্র, তিনি লেখক। তখনই আমার একবার সন্দেহ হয়েছিল—বিমলের কি এতই বয়েস হয়েছে যে সে ইতিমধ্যেই শ্বশুর হয়ে গেল! পরের দিন কী মনে হলো। আর একটা নম্বরে তোমাকে পেলাম। কিন্তু তখন আর ভুল শোধরাবার উপায় নেই। ভেজাল বিমল মিত্রের নামে নেমন্তন্নর চিঠি ছাড়া হয়ে গেছে—

শুনে উপস্থিত সবাই-ই হাসতে লাগলাম।

পরিচয় হলো ভেজাল বিমল মিত্রের সঙ্গে। ভদ্রলোক বহুদিন রেঙ্গুনে ছিলেন। ছোটবেলায় একটু একটু লেখার চর্চা করেছেন। এখন ওসব প্বাট চুকে গেছে। লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা নিয়ে মেতে আছেন। থাকেন শাঁখারিপাড়ায়। খেতে খেতে বললেন—সবাই-ই মশাই ওই একই ভুল করে—

বলে আবার হাসতে লাগলেন।

মনে আছে সেদিন রাজা সাহেব, ভেজাল বিমল মিত্র আর আমি—তিনজনেই কিন্তু ভেজালটা অত্যন্ত প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছিলাম।

যদি বলেন এ-সব তো রসিকতা, এ-সব তো ভুল। তারও উত্তর আছে। রসিকতা করতে গিয়ে ভুল করে ফেলার নজির যেমন আছে, ভুল করে ফেলে তারপরে সেটাকে রসিকতা বলে প্রমাণ করবার চেষ্টার অন্য নজিরও ভুরি ভুরি দিতে পারি। কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

আমার লেখার ভুল ধরিয়ে বাহবা নেবার জন্যে বহু অধ্যাপক-গবেষক বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। আমাকে আক্রমণ করে অনেক চিঠিও লিখেছেন। আমি তার উত্তর দিইনি। কী উত্তরই বা দেব? কোথায় কোন্ উপন্যাসে আমি সাল-তারিখের কী গোলমাল করেছি, কোথায় উদ্ধৃতিতে কী ভুল করেছি, শেরশাহ হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন কিনা, ভারতচন্দ্রের বাবার নাম রাজেন্দ্রনারায়ণ না নরেন্দ্রনারায়ণ, অমুক ব্যক্তি উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ না উচ্চরাঢ়ী কায়স্থ, এর উত্তর দিতে গেলে আমার 'বেগম মেরী বিশ্বাস' আর হয়ত লেখাই হতো না শেষ পর্যন্ত। 'সাহেব-বিবি-গোলামে'র বেলাতেও তেমনি আমি শিবনাথ শাস্ত্রীর বই থেকে গল্প চুরি করেছি কিনা, সোডা কবে আবিষ্কৃত হলো, বরফ এ-দেশে কোন্ সালে এল, এই সব নানান্ প্রশ্নে সারা-জীবন বাহাদুরি নেবার আশায় আমাকে বিব্রত করে তুলেছেন কলেজের মাস্টার-মশাইরা। অনেক দিন

মাস্টারি করলে বোধ হয় এই রকমই হয়। নিজের পিতাকেও অনেকে ছাত্র বলে ভুল করে ফেলে।

কিন্তু আমি বলি চার্লস্ ডিকেন্সের বেলাতে তো তোমরা আপত্তি করোনি? স্যার ওয়াল্টার স্কটের বেলাতেও তো কই তোমরা কিছু বলোনি? তাঁরা যে-যেমন খুশী এক-একটা যুদ্ধকে একশো বছর এগিয়ে-পেছিয়ে নিয়ে গেছেন গল্পের খাতিরে। আরে বাপু, আমি তো ইতিহাস লিখতে বসিনি।

শুধু তাই কেন? এই যে সেদিন শেক্স্পীয়রের চতুর্থ জন্ম-শত-বার্ষিক উৎসব হয়ে গেল, কই, সেই খোদ শেকস্পীয়রও যে কোথায় কোথায় ভেজাল দিয়েছেন কোনও পণ্ডিতও তো তার কথা উল্লেখ করলেন না। 'এ্যান্টনী এণ্ড্ ক্লিওপেট্রা' নাটকে তিনি 'বিলিয়ার্ড-টেবিলে'র কথা উল্লেখ করেছেন, তা তখন সেই ক্লিওপেট্রার আমলে কি বিলিয়ার্ড খেলা আবিষ্কার হয়েছিল? রাজা জন্-এর আমলে কামানের উল্লেখ আছে। কামান কি জন্-এর আমলে তৈরি হয়েছে?

আসলে ভেজালের ব্যাপারে শেক্স্পীয়রই সব চেয়ে বড় আসামী। শেক্স্পীয়র সম্বন্ধে এই নিচের লেখাটা পড়লেই বুঝতে পারবেন আপনার আমার কথার সত্যতা। পড়ুন:

"The very head and front of all offenders was Shakespeare himself. He speaks of Cannon in the reign of John, whereas cannon were unknown until a century and a half later; of printing in the time of Henry II, of clocks—and striking clocks at that—in the time of Julius Caesar; he makes Hector quote Aristotle and Cariolanus refer to Cato and Alexander; he introduces a billiard-table into Cleopetra's palace, he dowers Bohemia with a sea-coast, makes Delphos an island and holds Tunis and Naples to be at an immeasurable distance from each other."

Mistakes of Authors. Page 730

আমার এক-একবার মনে হয় সমালোচকরা যদি রসিক হতো

তাহলে বোধ হয় সাহিত্যের কিছু উন্নতি হতো। কিংবা কথাটা উল্টে বললে আরো ভালো হয়—রসিকরা যদি সমালোচক হতো তাহলেও সাহিত্যের কিছু উন্নতি হতো। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বেলায় তো তা হয় না। এখানে যেটা যার কাজ নয়, সে সেই কাজটাই করে। এখানে কবিরা কেরানী হয়, কেরানীরা কবি, ডাক্তাররা গল্প লেখে, গল্প-লেখকরা ডাক্তার। এখানে খবরের কাগজের সম্পাদক সাহিত্য-সভার সভাপতিত্ব করে, আর সাহিত্যিক সেই খবরের কাগজের অফিসে করে ইংরাজী খবরের অনুবাদ।

এ-ও ভেজাল! এই ভেজালটাই আমার ভালো লাগে। কারণ, এ ভেজাল উপাদেয়।

পরিশিষ্ট

॥ ১ ॥

ইতিপূর্বে বাংলা দেশের বাইরে ইংরেজী, মালয়ালাম, উর্দু ও হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিমল মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে "নাগপুর টাইমস্"—নাগপুর, "সারিকা"—বোম্বাই, "জনযুগম"—কেরালা, "মালয়ালারাজ্যম্"—কেরালা, "মুকুল"—লাহোর, "সার্চলাইট"—পাটনা, "সরিতা"—নিউ দিল্লী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সাক্ষাৎকারটি বাংলা দেশের একটি মফঃস্বল শহরের অধুনা-বিলুপ্ত মাসিক পত্রিকা "মোহানা"র শ্রীসিদ্ধার্থ ভৌমিক কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয় এবং ঐ পত্রিকার শারদীয়া, ১৩৫৩ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়। বিমল মিত্রের সম্পর্কে এবং বিরুদ্ধে পাঠক-পাঠিকাদের নানা কৌতূহল ও অভিযোগ আছে। সেই অভিযোগগুলির খণ্ডন ও কৌতূহলসমূহের নিরসন হওয়ার মত উপাদান থাকায় এই রচনাটি গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে সন্নিবিষ্ট করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছি।

* * * *

বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের গৌরবময় আসনটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার দুর্লভ সৌভাগ্য যে কজন স্বল্পসংখ্যক সাহিত্যিক অর্জন করেছেন বিমল মিত্র তাঁদের অন্যতম। শুধুমাত্র অন্যতম নয় বিশিষ্টও বটে। প্রায় সকল শ্রেণীর সাহিত্য-রসিকদের কাছেই বিমল মিত্র একটি প্রিয় নাম। ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান যে সামান্য নয় তা যে কোন পাঠকই স্বীকার করবেন। বলতে দ্বিধা নেই যে, বক্তব্যে এবং ভাবনায় মহৎ বলে চিহ্নিত হবার মত কিছু সাহিত্যকর্ম বিমলবাবু করেছেন। জনপ্রিয়তার বিচারেও তিনি অসামান্য সাফল্যঅর্জনে সমর্থ হয়েছেন। বিমলবাবুর এই সফলতা তাঁর সৃষ্টির পথ ধরেই তাঁর দরজায় এসে হাজির হয়েছে, এজন্যে তাঁকে হাত পাততে হয়নি।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক বিমল মিত্র সম্পর্কে তাই পরিচয়দান বাহুল্য মাত্র। যেহেতু খ্যাতির উজ্জ্বল আলোকে তাঁর নামটি উজ্জ্বলতর হয়েই পাঠকদের মনে গেঁথে আছে। সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য কি এই প্রশ্ন তাঁর সামনে রাখা হলে তিনি বলেন, গল্প লেখাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। যেহেতু গল্পই সাহিত্য। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন, জাতকের গল্প, জেসপ প্যারাবল-এর গল্প ইত্যাদি। তবে কথাটা এখানেই শেষ নয়। কারণ, গল্পের ওপরেও একটা বস্তু আছে যা আমি 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাস-এর ভূমিকায় লিখেছি। যে-গল্প জীবনকে নতুন জীবন দান করে, যা কাল থেকে কালান্তরে গিয়েও অমর হয়ে থাকে, তাকেই আমি যথার্থ গল্প বলি।

—আপনি কেন এবং কিসের তাগিদে লেখেন ?

বিমলবাবু উত্তর দিলেন, আমি আমার নিজের গরজে লিখি। অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের তাগিদে, নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজনে। ফুল যেমন নিজের তাগিদে ফোটে অনুরূপ সাহিত্যও শিল্পীর মনের তাগিদেই রচিত হয়।

—শিল্প-প্রেরণার উৎস কি বুদ্ধিজাত না হৃদয়জাত ?

—হৃদয় এবং বুদ্ধির সমন্বয়েই উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এর কোনটিকেই বাদ দেওয়া চলে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উভয়কে নিয়েই চলতে হয়। মানুষ হচ্ছে র‍্যাশনাল জীব, অতএব বুদ্ধি এবং হৃদয় তার থাকবেই। তবে সাহিত্যিক-এর ক্ষেত্রে হয়ত সমতার কিছু হেরফের হতে পারে কিন্তু বিচার ও বুদ্ধির ওপরেও একটা জগৎ আছে, মাটিতে পা রেখে যিনি তার লেখায় সেই ধ্রুবর ইঙ্গিত দিতে পারেন তিনিই মহৎ সাহিত্যের স্রষ্টা। যে সাহিত্য সেই স্তরে যেতে পারে সেই সাহিত্য মহৎ সাহিত্য।

—'যুগ-যন্ত্রণা' কথাটার ব্যাখ্যা কি ?

বিমলবাবুর উত্তর হল, যুগ-যন্ত্রণা কথাটাই আমি উচ্চারণ করি না এবং করবও না। কথাটা এখন স্লোগানে পর্যবসিত হয়েছে। কথা

যখন স্লোগান হয়ে দাঁড়ায় তখন আর তার মূল্য থাকে না।

—সাহিত্যে বাস্তবতা এবং জীবন-চৈতন্য বলতে আপনার কি মনে হয়?

উত্তরে বিমলবাবু বললেন, আমি এ প্রশ্নের উত্তরও দেব না। কারণ এগুলো আমার কাছে খুব ছেঁদো প্রশ্ন বলে মনে হয়। কলেজের মাস্টাররা এ নিয়ে মাথা ঘামাক। যেহেতু তাঁদের ছাত্র পড়াতে হয়। আমার ছাত্র নিয়ে কারবার নয়। আমি কাউকে উপদেশ বা জ্ঞান দেবার জন্যে বই লিখি না। সেটা কলেজের মাস্টারদের কাজ।

—সেন্টিমেণ্টাল সাহিত্য বলে কোন কথা কি আপনি স্বীকার করেন?

—সাহিত্যে দু'রকম জিনিসই আমি মানি। একটা সাহিত্য আর একটা অসাহিত্য। এ ছাড়া অন্য কোন বিভাগ আমি মানি না। অতএব, এই প্রশ্নের এর বেশি আর কোন উত্তর হয় না।

—জন-মনোরঞ্জনের দাবী আপনার সাহিত্য-ভাবনাকে প্রভাবান্বিত করে কি?

বিমলবাবুর উত্তর: নিজের মনোরঞ্জন হলেই জন-মনোরঞ্জন হয়। যেমন আত্মরূপ দর্শন করলেই বিশ্বরূপ দর্শন হয়। রামপ্রসাদ নিজের মনের ক্ষুধা মেটাবার জন্যেই গান লিখে গিয়েছিলেন। সেই জন্যেই সেই টেলিফোনহীন, রেডিওহীন ও সংবাদপত্রহীন যুগেও সেই গান হালিশহর থেকে হাইলাকান্দি পর্যন্ত সকলের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।

—আপনার 'গুলমোহর' উপন্যাসটি কি নিজের মনোরঞ্জনের তাগিদেই লেখা হয়েছিল?

—তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আমার 'গুলমোহর' উপন্যাসের ভূমিকাতেই লেখা আছে। সেখানে আমি বলেছি কেন এটা লেখা হয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে রবীন্দ্রনাথকেও পাঠ্যপুস্তক লিখতে হয়েছিল। সাহিত্যিকদেরও বন্ধুকৃত্যের তাগিদে বা একজনের

উপকার করার প্রয়োজনেও অনেক কিছু লিখতে হয়। এটাকে আমি একটা সামাজিক কর্তব্য বলেই মনে করি।

—'বেগম মেরী বিশ্বাস' 'সাহেব বিবি গোলাম' 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' এবং 'একক দশক শতক' এই বিশাল চারটি উপন্যাস লেখার প্রয়োজন আপনি কেন অনুভব করলেন ?

বিমলবাবু জবাব দিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পর থেকেই তাঁর লেখা উপন্যাসের ধারাটি বন্ধ হয়ে গেল। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমী-উপন্যাস রচনার বিশেষ একটি ধারা ছিল যাকে এপিকধর্মী বলে আখ্যায়িত করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পর সেই ধারাটি আর বেঁচে রইল না। এপিকধর্মী বাংলা উপন্যাস রচনা সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে যেন নীরবতা নেমে এল। অথচ ইংলণ্ডে বা রাশিয়ায় এপিকধর্মী সাহিত্য রচনা এখনো হয়। আমাদের সাহিত্যে এপিকধর্মী উপন্যাসের অভাববোধ থেকেই আমি ঐ চারটি উপন্যাস রচনা করেছি। এই চারটি উপন্যাসে আমি দুটো শতাব্দীকে তুলে ধরবার সবিনয় চেষ্টা করেছি মাত্র। ইংরেজীতে এ জাতীয় উপন্যাস লিখেছেন গলস্ওয়ার্দি, রাশিয়াতে শলোকফ। আমি ভাল করেছি কি মন্দ করেছি সে বিচার করবেন ১৯৫০ সালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যিনি লিখবেন তিনি।

—ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

বিমলবাবু উত্তর দিলেন, অতীত নিয়ে লিখলেই ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় না। ১৯৬৬ সাল নিয়েও প্রতিক্রিয়াশীল উপন্যাস লেখা যায়। আবার মহেঞ্জোদারোর ব্যাপার নিয়েও আধুনিক উপন্যাস লেখা সম্ভব। যেমন হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস' যার বিষয়বস্তু হচ্ছে সপ্তম সেঞ্চুরী বি. সি., টলস্টয়ের 'ওয়্যার এ্যাণ্ড পিস' যা লেখা হয়েছে নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময়কে নিয়ে, ফরাসী বিদ্রোহকে উপজীব্য করে লেখা হয়েছে ডিকেন্সের 'টেল অব টু সিটিজ,' বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' যার মধ্যে আছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা, এ সব কটিই আধুনিক উপন্যাস। এর কোনটিই

জনতোষণের জন্য লেখা হয়নি কিংবা লেখকরা পলায়নী মনোবৃত্তির দ্বারাও পরিচালিত হননি। অতীতটা একবার দেখা দরকার এই জন্যে যে, আমরা কত দূর এগুলাম বা পেছোলাম তার একটা ধারণা নেওয়া প্রয়োজন। আমার উপন্যাসগুলিকেও আমি কোনভাবে চিহ্নিত করি না। যেমন, মানুষটি বাইরে কালো কি ফর্সা সেটার যেমন কোন সংজ্ঞা দরকার হয় না, কারণ, উভয়ের দেহের রক্তই লাল এবং উভয়েই মানুষ এটাই বড় সত্য, তেমনি এ ক্ষেত্রেও এটা উপন্যাস এইটুকুই বড় সত্য। এর জন্য অন্য কোন সংজ্ঞা বা শ্রেণী ভাগ আমি অপ্রয়োজনীয় মনে করি।

—আপনার উপন্যাসে এই সমাজ ও সমাজের মানুষরা কেমন স্থান পায় এবং আপনার ধারণায় কোনটি আপনার শ্রেষ্ঠতম রচনা বলে মনে হয় ?

বিমলবাবুর উত্তর : চিরকালের সমাজ ও চিরকালের মানুষই আমার উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তবে ভালমন্দর প্রসঙ্গে বলব, মায়ের কাছে যেমন সব সন্তানই সমান তেমনি সবই আমার কাছে ভাল। কিন্তু আমার মৃত্যুর পরও যে কয়খানা উপন্যাস পাঠকদের ভালো লাগবে সেটাই বা সেগুলোই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস।

—'কড়ি দিয়ে কিনলাম' এবং 'একক দশক শতক' এই দুই উপন্যাসে চিত্রিত সমাজের চেহারা ভিন্ন রকম। এই ভিন্নতা কি যুগ বিবর্তনেরই ইঙ্গিতবহ ? এই বিবর্তনবাদ শিল্পীর মানস-দর্পণে কি ভাবে প্রতিবিম্বিত হবে বা হওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয় ?

বিমলবাবু এবার উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আমার চারটি উপন্যাস যথা 'বেগম মেরী বিশ্বাস' 'সাহেব বিবি গোলাম' 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' এবং 'একক দশক শতক'-এ এই যুগবিবর্তনের ইঙ্গিত আছে—খুব স্পষ্টভাবেই আছে। 'ইভলিউশন অব দি সোসাইটি'। সমাজ পালটাচ্ছে, মানুষের মন বদলাচ্ছে, এই পরিবর্তন আমার ঐ চারটি উপন্যাসে দেখাবার চেষ্টা করেছি। উপন্যাস হচ্ছে 'আর্ট অব সোস্যাল 'সাইন্স', ঔপন্যাসিক হল 'সোস্যাল হিস্টোরিয়ান'।

ব্যালজাক সম্পর্কে বলা হয় তিনি ছিলেন 'ওয়াচ-ডগ অফ প্যারিস।' প্রত্যেক দেশের সার্থক ঔপন্যাসিক মাত্রেই সেই দেশের পাহারাদার। অতএব, বলা যায়, যেমনভাবে ব্যালজাক দেখেছেন, যেমনভাবে ডিকেন্স দেখেছেন, টলস্টয় দেখেছেন, ঠিক তেমনভাবেই সমাজকে দেখা দরকার, নিজের মানস-দর্পণে প্রতিফলিত করা দরকার। ডিকেন্স এক-একটা বই লিখেছেন আর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইন বদলাতে হয়েছে। তাই কার্ল মার্কস আর চার্লস ডিকেন্সের মধ্যে আত্মিক কোন পার্থক্য নেই।

—সাহিত্যে অশ্লীলতা আপনি স্বীকার করেন?

বিমলবাবু বললেন, এই প্রশ্নটা অনেকটা সোনার পাথর বাটির মতন। অশ্লীলতা বলে সাহিত্যে কোন জিনিস নেই। কারণ, যেটা সাহিত্য সেটা কখনোই অশ্লীল হতে পারে না। অসাহিত্যই একমাত্র অশ্লীল।

—আজকের দিনে উৎকৃষ্ট বা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে কি? আজকের কথা অর্থাৎ এই ষাটের দশকের সমাজ আপনার মধ্যে কোন সত্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে কি?

বিমলবাবুর উত্তর: প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রোজ রোজ সৃষ্টি হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। যেমন রোজ রোজ ব্যাসদেব বা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, টলস্টয় অথবা ডিকেন্স জন্মায় না। আর আজকের দিনের কথা বা এই মুহূর্তের কথা আজকে লেখা সম্ভব নয়। বন্যা যখন আসে তখন ক্ষেতে ফসল ফলে না। বন্যা নেমে গেলে যখন ক্ষেতের ওপর পলিমাটি পড়ে তখন ভাল ফসল জন্মায়। তাই আজকের কথা লিখবে পঞ্চাশ বছর পরে আরেকজন সাহিত্যিক।

—'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসটির দীর্ঘতা নিয়ে পাঠকদের মধ্যে কিন্তু প্রশ্ন আছে, এটি কি আরো সংক্ষিপ্ত হতে পারত না?

বিমলবাবু জবাবে বললেন: ফয়েজ খাঁ বা আব্দুল করিম খাঁ কিংবা বড়ে গোলামআলী খাঁ সাহেবকে তিন মিনিটে গান গাইতে বললে যে দুর্ঘটনা ঘটে এপিক ঔপন্যাসিককে তাঁর এপিক রচনা

সংক্ষিপ্ত করতে বললে সেই একই দুর্ঘটনা ঘটে। রামায়ণ বা মহাভারত-কেও সংক্ষিপ্ত করা যায় কিন্তু তাহলে আর সেটা রামায়ণ মহাভারত থাকে না। যাঁরা ছোট উপন্যাস পড়তে চান তাঁদের জন্য অসংখ্য ছোট উপন্যাস আমি লিখেছি। গোলাপ গাছ ছোট কিন্তু সে ছোট বলে তাকে আমি কোনদিন হেয় মনে করিনি। আবার তেমনি বট গাছ বড় বলে তাকেও কোনদিন গোলাপ গাছ হতে বলি নি। যখন বড় বই লিখেছি তখন পাঠক পড়বে কি পড়বে না সে কথা ভেবে লিখিনি। অথচ বড় বই আরো বড় হল না কেন সেই অভিযোগ আমাকে বহু পত্রলেখক পত্রযোগে জানিয়েছেন। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় বহু পাঠক-পাঠিকা আমাকে অনুরোধ করেছেন যেন বই শেষ না হয়। তাহলে, তাঁরা সেই ধারাবাহিক আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন। আবার যখন উপন্যাসের শেষ কিস্তির আগের সংখ্যাতে 'আগামী সংখ্যায় সমাপ্য' বলে ঘোষণা করা হয়েছে তখন দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে পত্র লিখেছেন। সে সব পত্রই আমার কাছে রক্ষিত আছে। তবে আমি আমার নিজের মত ও পথেই চলেছি। যেখানে আরম্ভ করবার সেখানে আরম্ভ করেছি এবং যেখানে শেষ করার কথা সেখানেই শেষ করেছি, এক লাইনও বেশি লিখিনি। আমার নিজের আত্মপ্রকাশের তাগিদেই আমি সাধারণত লিখি, পাঠকদের যখন তা ভালো লাগে তখন সেটা তাঁদের মহানুভবতা ও আমার সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করি। তবে সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে মাসিক ও সাপ্তাহিক-এ যে 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' প্রকাশের হিড়িক চলেছে তার প্রকোপ থেকে আমি সব সময় আত্মরক্ষা করে চলতে পারিনি। তার একমাত্র কারণ এই, আমি কোলকাতাতেই বাস করি এবং আমারও একটা সামাজিক জীবন আছে।

—'সম্পূর্ণ উপন্যাস' প্রকাশের হিড়িক কেন এল ?

বিমলবাবু উত্তর দিলেন, ১৯৫৫ সালে শারদীয়া 'উল্টোরথ' পত্রিকায় প্রথম সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সেটা আমারই

লেখা। নাম 'মিথুন লগ্ন'। সেটা প্রকাশের পর কাগজটির এতই অভূতপূর্ব ব্যবসায়িক সাফল্য এল যে তারপর থেকেই শুরু হল সাতটা-আটটা উপন্যাস প্রকাশের হিড়িক। তার আগে একমাত্র শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকাতেই একটি করে 'উপন্যাস' ছাপা হোত। 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' কথাটির প্রচলন ঐ ১৯৫৫ সাল থেকে। এই প্রসঙ্গে বলা ভাল যে, 'মিথুন লগ্ন' উপন্যাসটি কুড়ি পৃষ্ঠার একটি ছোট গল্প লিখতে গিয়েছিলাম কিন্তু ঘটনাচক্রে সেটি দীর্ঘ হয়ে যাওয়াতে 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' আখ্যা পায়।

—এতে কি ছোট গল্পের ক্ষতি হচ্ছে না?

—ছোট গল্পের লেখকরা ফাঁকি দিচ্ছেন বলেই সম্পূর্ণ উপন্যাসের চাহিদা এত বেশি।

—এগুলো কি সত্যি ভাল কিছু সাহিত্য হচ্ছে?

বিমলবাবুর উত্তর ঃ না। এতে সাহিত্য এবং পাঠক, দুদলেরই ক্ষতি হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বহু লেখকের সম্ভাবনা এই উপলক্ষে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। অতি চাহিদার ফলে লেখকরা লেখায় যত্ন নিতে পাচ্ছেন না। লেখা হবার আগেই প্রকাশক অগ্রিম অর্থ দাদন দিচ্ছেন এবং পত্রিকায় ছাপা হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তক আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, গত উনিশ বছরে সরকার থেকে গ্রন্থাগার এবং সাহিত্যের জন্যে অর্থসাহায্য ও পুরস্কারের ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তাতেও সাহিত্যের যথাযথ উন্নতি হচ্ছে না। অথচ যখন এ সাহায্য ছিল না, তখন সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এ সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের আরো সচেতন হওয়া দরকার। তাঁদের ওপরেই সাহিত্যের উন্নতি অবনতি অনেকখানি নির্ভর করে।

—কার কার লেখা আপনাকে আকর্ষণ করে?

আলোচনা প্রসঙ্গে আমি আগেই তাদের নাম করেছি। তবে বিদেশী এবং স্বদেশী লেখকদের মধ্যে—সব চেয়ে ভাল লাগে চার্লস ডিকেন্স, ব্যালজাক, টলস্টয়, রোঁম্যা রোঁলা। এঁরা গল্প-সাহিত্যের গুরু। স্বদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে আমাকে সব চেয়ে বেশি

অনুপ্রাণিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই দুজনের প্রথম যুগের রচনাবলী।

—গত পাঁচ-দশ বছরে যেসব লেখকরা লিখেছেন তাঁদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন ?

বিমলবাবু উত্তর দিলেন, সকলেরই সম্ভাবনা আছে, সকলেই প্রতিশ্রুতিবান। তাঁদের মধ্যে যদি কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত হন, প্রার্থনা করি আমি যেন তা অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারি।

—'কড়ির চেয়ে দামী' উপন্যাসের লেখক কি আপনি ?

—দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে কোন একজন ব্যক্তি আমার নাম গ্রহণ করে একটার পর একটা বই প্রকাশ করে চলেছেন। আসলে ও নামে কোন লেখক নেই। এও আমার খ্যাতি পরিমাপের মাপকাঠি। তিনি পুস্তক বিক্রেতাদের বেশি কমিশন দিয়ে রাশি রাশি বই বাজারে ছাড়ছেন এবং কিছু পুস্তক বিক্রেতা অর্থের লোভে এই কাজে সহায়তা করছেন এবং বহু পুস্তক বিক্রেতা ও পাঠক এর ফলে প্রতারিত হচ্ছেন। পাঠক-পাঠিকারা প্রতারিত হবার পর পত্রযোগে আমার কাছে অভিযোগ করেন এবং কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন আমি অর্থের লোভে অন্য লোক দিয়ে বই লেখাচ্ছি। এই ভেজালের যুগে এ সম্পর্কে আমার কি করণীয় আমি জানি না।

॥ ২ ॥

১৯৫৬ সালের ১৬ই অক্টোবর রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রে পাটনার বিখ্যাত দৈনিক "সার্চলাইট" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকার বিমল মিত্রের উপন্যাস সম্পর্কে স্বনামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। সমসাময়িক কোন লেখকের সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্য সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। প্রবন্ধটি যে শুধু বিমলবাবুর উপন্যাস-কীর্তিরই মূল্যায়ন তা নয় তার চেয়ে কিছু বেশী। বাঙালী পাঠকদের অনেকেরই প্রবন্ধটি পাঠ করবার সুযোগ না ঘটায় বর্তমান সংস্করণে সন্নিবিষ্ট করা হলো।

*   *   *   *

Bimal Mitra, undoubtedly the most significant and most popular writer of contemporary Bengali fiction, is well-known all over India through translation of his works and film "Saheb Bibi Ghulam". The reasons behind his success and popularity are not far to seek. He is a master of the Bengali prose. There are few in Bengal now who can write such an easy but forceful prose. He possesses in a very great measure the ability of a story-teller—an ability that would not allow the reader any rest until he has come to the end of the book.

Admirable as these qualities are, they yet do not fully account for the high esteem in which Mr. Mitra is held by the discerning critics. To all these must be added another quality—the ability to choose a very worthwhile theme which helps his works transcend the boundary of the present and leave a lingering disturbance in the minds of the readers. His themes powerfully shake us and our complacence over the status quo. They force an introspection over our own conduct and role in society.

Let there be no mistake. Mr. Mitra is highly entertain-

ing ; indeed the large sale of his highly priced books is an evidence of their being in favour with a very wide reading public. No, certainly he is no mean entertainer ; but, as in the case of any other master entertainer, his characters continue to haunt our minds long after we have ceased reading the books. This ability to create an impact on the minds of people is undoubtedly the quality of a great writer. And Bimal Mitra is great by this standard.

SOCIAL HISTORIAN

In truth Mr. Mitra is a social historian and commentator. His study of history is as deep as any genuine scholar's. (Indeed even such a serious scholar as Dr. Sasadhar Sinha has deemed it proper to quote from one of Mr. Mitra's novels in his thought-provoking study called "Indian Independence in Perspective" to substantiate an argument). But undoubtedly his presentation is much more interesting than many historian's writings.

The prime concern of Mr. Mitra is the Bengalis and their history. In a series of four novels—'Begum Mary Biswas', 'Saheb Bibi Ghulam', 'Kadi Diye Kinlam' (I buy with cowries), 'Ekak Dashak Shatak' (one, ten, hundred) he has covered two hundred years of modern Bengali history from the Battle of Plassey to the modern times, i.e., from the time of the eclipse of freedom to its regain. In his works political and social histories are mingled with each other as they invariably do in actual life. Without allowing this concern for reality to protrude itself in any way on the flow of the main narrative in his novels, Mr. Mitra has exhibited creditable mastery of the art of delineating the inter-relationship of political, social and economic factors and the value of

organization in deciding the course of events. No wonder people find his work of absorbing interest.

SOCIAL-POLITICAL 'CRISIS

Having been born and lived in a crisis-laden society at the period of its greatest crisis (Mr. Mitra left university in 1938) when the spectre of unemployment and political abandonment looked starkly at the face of every Bengali Hindu youth, and was in an eminently suitable position to see and realize the great corrosion overtaking the Bengali society as a result of war, communal rule and the calculated hostility of the ruling classes belonging to the British and the Muslim League which ultimately led to the' greatest disaster in the history of the Bengali nation—Mr. Mitra is understandably concerned with crisis. All the time he is searching for a clue to the genesis of the crisis and the means to their solution. His four great novels—already mentioned—have as the central theme a crisis ; the first one deals with the defeat of Sirajuddoula, the second with the break up of the aristocracy, the third with the disintegration of the Bengali nation, and the fourth with the crisis confronting the Bengalis in the post-independence period which threatens to deprive them of their identity.

THE BOOK

'Begum Mary Biswas', a voluminous novel of more than nine hundred pages, deals with the British occupation of Bengal. Of the four novels of the serial it deals with the earliest period, but the last to appear. Originally serialized in the "Desh", the literary weekly of Calcutta, it has now come out in the form of a book.

The story centres upon the life of a none-too-affluent Hindu girl, Marali Biswas, who through a series of coincidences finds herself as a Begum in the harem of Nawab Sirajuddaula. A Biswas thus becomes a Begum. Eventually she also meets Robert Clive. Marali symbolises the confluence of three great cultures—Hindu, Muslim and Christian ; hence the name of the book 'Begum Mary Biswas'. It was no longer possible to survive in isolation ; one had to adjust to new men, new ideas.

As if to underline the basic irrationality and injustice of the existing social order, by an irony of fate, Marali was escorted to the Nawab's harem unknowingly by the very same man (Kanta) who was to have been her husband. Through an accidental delay in arriving at the marriage ceremony Kanta was deprived of his bride (Marali) who was following the custom of those days obliging a Hindu girl to be given out in marriage compulsorily to any bridegroom once the appointed day of the marriage had arrived even if the selected one failed to arrive, married to a vagabond poet (Uddhabdasa). Fate brings all the three together off and on, although all of them do not become aware of their mutual inter-relationship until much later.

Readers of Mr. Mitra's quartet cannot but be aware of the peculiar similarity in the relationship between the hero and the heroine in his great novels. In the first three novels as mentioned earlier, the hero is evidently in love with the heroine who also eventually reciprocates ; but the hero and the heroine never get an opportunity to come together. In "Begum Mary Biswas" the hero is the could-have-been-husband, in "Saheb Bibi Ghulam" the hero was the husband although the heroine having been married as a child and long

discarded the old life is blissfully unaware of it ; in the "Kadi Diye Kinlam" the hero Dipankar is no more than a platonic lover but a steadfast one.

This tragic dissociation of the central character, even when they are powerfully attracted to one another, in three successive novels, may not be without meaning. It reflects the basic irrationality of the situation which does not permit the desirable thing to take place. It underlines the author's abhorrence for, rejection of, and agonized protest against the status quo. Through his characters, and ever otherwise, the reader's attention is again and again drawn to the inadequacies of the existing order which inevitably lead to its downfall.

NO VILLAINS

Inasmuch as the characters in Mr. Mitra's novels are the agents of history there are no true villains in his stories. The author in his unquenchable drive for unravelling the truth cannot obviously afford the luxury of any delusion of villainy. Failure and destruction come bacause one is unwilling or unable to see truth and act accordingly. Disaster does not overtake a people because others are bad but because the former have lost the capacity or the will to resist the evil. This is the greatest lesson of history ; this is the lesson which Mr. Mitra's characters and novels want to convey.

Therefore, neither the Nawab of Bengal nor the British conqueror appears as a villain in the novel. The Nawab is a prisoner of his past from which he is unable to emerge ; he is unable to infuse a spirit of nationalism into his lieutenants ; the reason of the failure was again not difficult to discover. Without bringing about the crying reforms it was no longer possible to alter the psychology of the people. Therefore all

his well-meaning moves only brought him enemies both within the ranks of his own courtiers and, through the distorted application of those measures also among the people—leading to his most complete isolation. The Nawab woke up too late.

Robert Clive, on the other hand, was the reject of his society. Disgusted at his humiliation he even wanted to take his own life. It was just to avoid the hostile society he came to India as a mere clerk in the East India Company. He had to make good—to demonstrate before the society that had been so unkind to him that he was really good, nay much better than the others whom society recognised as good. Therefore he became the conqueror of India and the whole world marvelled at his extra-ordinary performance. What an extraordinary portrayal of the much maligned Clive and yet how much in keeping with the findings of modern psychology in this analysis !

It is this deep understanding of the human desires and motives that enables Mr. Mitra to create convincing characters who are so easily acceptable to us. Some have sought to deride Mr. Mitra's works by characterizing his work unhistorical. But what is history ? Is it the mere agglomeration of events and names ? Has it got nothing to do with the movement of human destiny ? Professor E. H. Carr, the eminent British historian, says that history is the interpretation of the past in the light of the present with a view to achieving a better understanding of the present. That is how the interpretation of events and periods of history has undergone changes with changing times.

During the period of British occupation we faced the paramount task of regaining our freedom. The history that was written during that period properly reflected that funda-

mental urge. Now that the constructions of a foreign rule are no longer present there should be no hesitation in widening our horizon to achieve a better understanding of the process of history. Some of Mr. Mitra's characters may not be technically historical but there is little doubt that they are truly representative of the period and are therefore completely authentic so far as the essence of history is concerned. A worthwhile literary work is much more than a chronology of events ; it is an introduction to the understanding of the spirit of the events. Mr. Mitra is one of the most effective historians of Bengal.

In every country the great literary minds seek to find out a way for the liberation of their peoples. We may refer to the Italian novels of the nineteen fifties which have become so popular. A leading critic writes, "The canvas of Italian reality in short has seldom been as vast as in the postwar period ; seldom before has the writer in Italy touched upon so many different aspects of life in these difficult times. A few themes, however remain too hot to handle for the cautious (and conformist) novelist In Italy. The surface of such questions as the corruption in the government of the dubious politics of the Church, or the slovenliness of the bureaucratic machinery of the State or the abuses of the ruling class has been scarcely scratched". (Sergio Pacific.: "Italian Novels of the Fifties", in Richard Kostalanetz. "On Contemporary Literature." An Avon Book. page 166). If it is recalled that Bimal Mitra's principal concern in his voluminous and highly successful novels is these very "hot" but crucial questions of corruption in the government, the slovenliness of the bureaucratic machinery of the state and the abuses of the ruling class his greatness as a writer can be better appreciated than has been the case so far.